আবদুন নূর

লোক-প্রশাসন

সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা

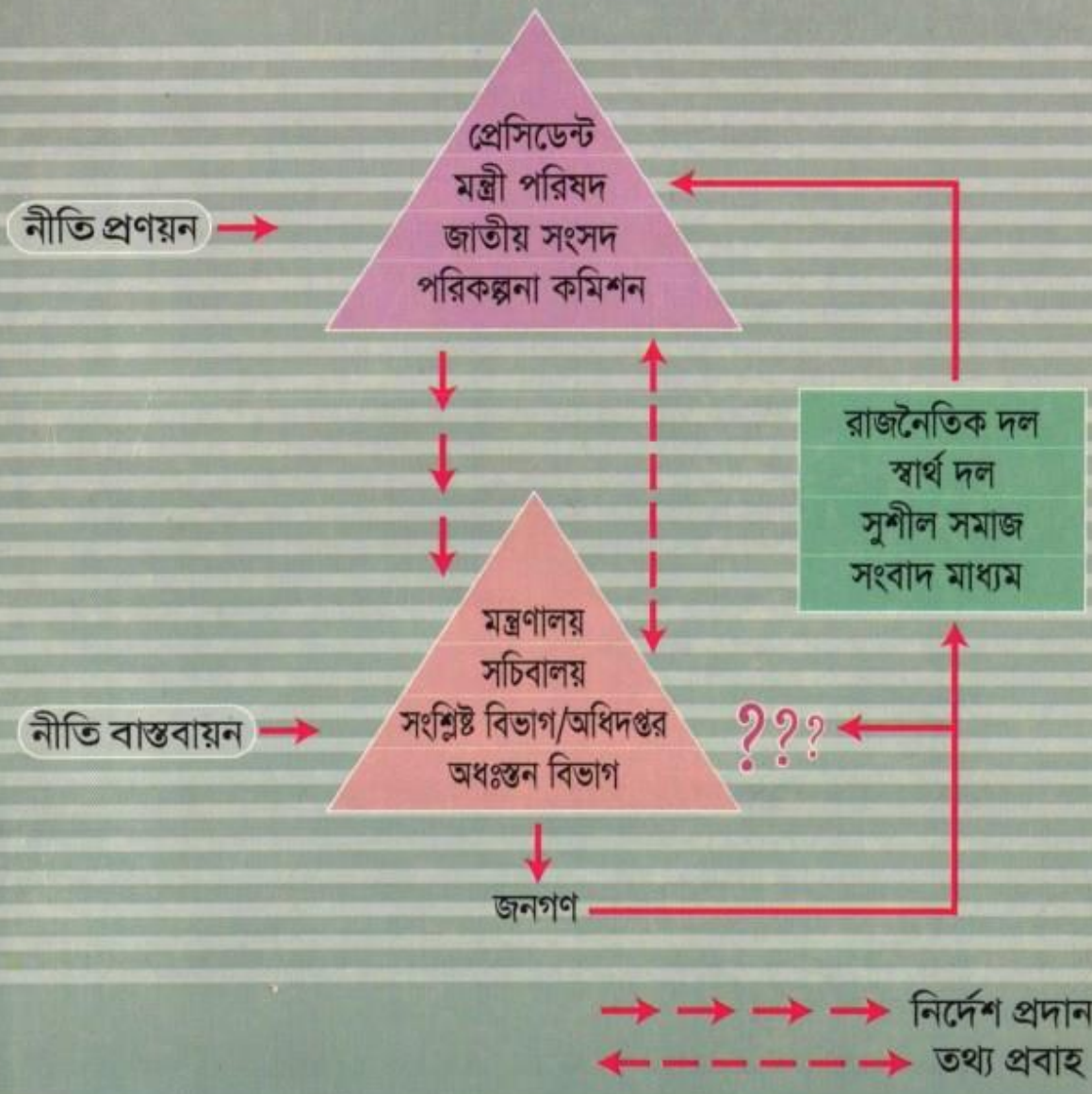

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

লোক-প্রশাসন

সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা

আবদুন নূর

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৯২৪২৫৬, ৮৯৫০২২৭, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail :biit_org@yahoo.com, Website : www.iiit.org

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪১৩
সেপ্টেম্বর ২০০৬
রমজান ১৪২৭

সংশোধিত সংস্করণ
অক্টোবর ২০০৯

ISBN
৯৮৪-৮২০৩-৪৫-৭

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১২১৭

মূল্য
২৬০.০০ (দুইশত ষাট টাকা)

Lok Proshashon : Shangatan, Procria abong Anuchintha (**Public Administration: Organization, Process and Retrospect**) by Professor Abdun Noor, published by the Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Revised Edition : October 2009. Phone : 8924256, 8950227 06662684755, Fax: 8950227, Email: biit.org@yahoo.com, Website : www.iiit.org, Price : Tk. 260.00, US $ 10.00

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

লোক-প্রশাসন সরকারি কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা ছাড়াও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একটি স্বতন্ত্র ও দ্রুত সম্প্রসারমান পাঠ্য শৃঙ্খলা। অপরদিকে, 'সুশাসন' ও 'উন্নয়ন' আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে প্রধান জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে ইদানিংকালের বহুল আলোচিত প্রত্যয়। এ সকল প্রত্যয় ও ধারণা উন্নয়শীল দেশের জন্য পাশ্চাত্য কারিগরি সাহায্য বিশেষত: আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলির জোরালো *প্রেস্ক্রিপ্সন*। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের চলমান সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা ও অনুসৃত উন্নয়ন উদ্যোগও মূলত: পাশ্চাত্য চিন্তা নির্ভর। দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ আমাদের জাতীয় প্রত্যাশা পূরণে সফল হয়নি। বিশেষত: লোক-প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। সরকারি আমলাদের ক্ষমতা প্রয়োগের জবাবদিহিতা পদ্ধতি কার্যকর নয়। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে" (অনুচ্ছেদ-১১)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জনগণ পড়ে আছে শুধু সেবা গ্রহীতা পর্যায়ে। প্রশাসনে তাদের কোন অংশগ্রহণ নেই। সরকারি প্রশাসনের সকল স্তরে জনগণের হয়রানি ও দুর্নীতি বহুলভাবে আলোচিত ও সমালোচিত। এই অভিজ্ঞতা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, কোন প্রশাসনিক বা উন্নয়ন মডেল সফলভাবে কার্যকর করতে হলে সেটাকে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা বাঞ্চণীয়। এটাই প্রশাসনিক সংস্কারের মূল চেতনা।

এই প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন সময়ে লোক-প্রশাসন বিষয়ে রচিত লেখকের সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধাবলীকে সংকলিত করে শিক্ষার্থী ও আগ্রহী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি। লোক-প্রশাসনের সংগঠন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা বিশেষত: ইসলামী ভাবধারার সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় লেখকের নিবন্ধাবলীতে। এটিকে আজ বিশ্বব্যাপী পরিচালিত 'জ্ঞানের ইসলামী রূপায়ন' কর্মসূচীর একটি সফল সংযোজন বলে মনে করছি। আশা করি এজাতীয় উদ্যোগ আমাদের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে দেশোপযোগী ও কার্যকর একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বি আই আই টি-এর উদ্যোগে ২০০৬ সালে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর দ্রুত-এর প্রায় সবগুলি কপি বিক্রী হয়ে যায়। আগ্রহী পাঠক ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনাসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক নির্ঘন্টসহ বইটির সংশোধিত সংস্করণ পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিয়ে পারার জন্য পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে 'প্রশাসন' ও 'উন্নয়ন' বিষয়ক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে উপকারী বই হিসাবে বিবেচিত হবে বলে বিশ্বাস।

ড. মো: লুৎফর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

অক্টোবর, ২০০৯

www.amarboi.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আধুনিক বিশ্বের দেশে দেশে লোক-প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক (সহযোগিতামূলক) প্রযুক্তি এবং একই সাথে, বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা, একটি স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দুই দশকেরও অধিককাল ধরে লোক-প্রশাসন বিষয়ে শিক্ষকতাকালে যে সকল তত্ত্ব ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়েছি, এবং তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে যেসকল অসঙ্গতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, বিভিন্ন সময়ে তা লিপিবদ্ধ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লোক-প্রশাসন চর্চায় যেসকল পাঠ্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তা বিগত একশত বৎসর ধরে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা। অপরদিকে, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চলমান প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি, উত্তরাধিকারসূত্রে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শাসন হতে প্রাপ্ত। এ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক চিন্তা স্বাধীন দেশের সরকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সফল হতে পারছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণটি যে পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান, এ কথাটা কিন্তু আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে না। অপরদিকে, আমাদের অনগ্রসরতা ও পাশ্চাত্য নির্ভরতার সুযোগে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কাংখিত সংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ে পশ্চিমা দেশ ও সাহায্য সংস্থাসমূহের অহর্নিহিস হেদায়েতও একটি বিরক্তিকর উপসর্গ। এই প্রেক্ষাপটে, লোক-প্রশাসন বিষয়ক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পাশাপাশি, প্রাচ্যের ঐতিহ্য বিশেষতঃ সমৃদ্ধ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রচেষ্টা রয়েছে বিভিন্ন নিবন্ধে। আশা করি এ জাতীয় আলোচনা পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

এই গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন নিবন্ধসমূহ বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রথম শ্রেণীর জার্ণালসমূহে বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধসমূহকে সংকলিত করে লোক-প্রশাসন বিষয়ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক হিসাবে পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বি আই আই টি-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সময়ের ব্যবধানের কথা বিবেচনা করে কিছু কিছু নিবন্ধকে সময়োপযোগী করার প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি রয়ে গেছে বিভিন্ন রচনায়। নিবন্ধের অঙ্গহানির কথা বিবেচনা করে পুনরাবৃত্তিসমূহ বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি।

আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি যে, এই গ্রন্থে লোক-প্রশাসন বিষয়ে আমার নিজস্ব কোন অবদান নেই। নিবন্ধসমূহে আমি বিদ্বজনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করেছি মাত্র এবং চেষ্টা করেছি লোক-প্রশাসন চর্চার পরিসীমাকে কিছুটা সম্প্রসারিত করে এর পরিধির আওতায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করতে। তবে নিবন্ধসমূহকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি এর বহুবিধ সীমাবদ্ধতার কথা। ইদানিংকালের বহুল আলোচিত 'সুশাসন' বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ 'ক' অংশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও "সংগঠন তত্ত্ব" বিষয়ে আলোচনাও শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসত। বইটির পরবর্তী সংস্করণে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশা করছি।

বহুজনের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে এই গ্রন্থ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.সি.টি সেন্টারের কম্পিউটার সহকারী যথাক্রমে জনাব সালাউদ্দিন ও জনাব নাসির উদ্দিন সিকদার পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে নিবন্ধগুলি কম্পোজ করেছেন। আমার সহকর্মী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিষ্টার জনাব এম রহুল আমিন বাংলা শব্দের ভুল সংশোধন করেছেন। ভুল সংশোধনে আরো সহযোগিতা করেছেন লোক-প্রশাসন বিভাগের ৪র্থ বর্ষ অনার্স শ্রেণীর ছাত্র জনাব মোরশেদুল হক ও জনাব নুরুল ইসলাম। বইটির প্রচ্ছদ একেঁছে আমার স্নেহাস্পদ ভ্রাতুসপুত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের শিল্প বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। সবাইর প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও দোয়া। এর পরও থেকে যাওয়া ভুলের জন্য আমিই সর্বোতভাবে দায়ী। বইটি লোক-প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বিকাশে সহায়ক হলে নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করব।

আবদুন নূর
প্রফেসর
লোক-প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০০৬

www.amarboi.org

উৎসর্গ

জ্ঞানের 'ইসলামী রূপায়ন' আন্দোলনের উদ্যোক্তা শহীদ ড. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী ও তাঁর স্ত্রী শহীদ ড. লুই লেমিয়া আল ফারুকী;

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত একক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপকার

ড. সৈয়দ আলী আশরাফ;

আধুনিক বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের বৈজ্ঞানিক উপস্থাপক

আল্লামা ইকবাল, সৈয়দ আমীর আলী, মুহাম্মদ আসাদ (পূর্বনাম লিউপোল্ড উইল্‌স), মুরাদ্ হফ্‌ম্যান ও ড. ইউসুফ আল-কারযাভী;

এবং

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সফল অনুবাদক অধ্যাপক শাহেদ আলী ও মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ আখুঞ্জিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

www.amarboi.org

সূচি

ক. প্রশাসনিক চিন্তাধারা

১. লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা ৯
২. লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিবর্তন ২৩
৩. উন্নয়ন প্রশাসন : তত্ত্ব, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা ৩৭
৪. প্রশাসনিক সংস্কারে 'নব লোক-ব্যবস্থাপনা' নীতি ৪৫

খ. লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধ

৫. আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন ৬১
৬. নব লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৭১
৭. লোক প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৭৯
৮. মহানবী (সা:)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা (৬২৩-৬৩২ খ্রি.) ৯৭
৯. সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইসলামী প্রশাসনের রীতি ১১৭

গ. লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতা

১০. লোক-প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা : আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি ১৩১
১১. প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা দমনে *অম্বুড্‌জম্যান* (ন্যায়পাল) ১৪৫
১২. লোক-প্রশাসনে নৈতিকতা ১৬৫

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন

১৩. শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৫
১৪. আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতি ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৯৯

ঙ. পুস্তক পর্যালোচনা

ক) বাংলা ভাষায় লোক-প্রশাসন চর্চা ২১৩
খ) প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী ও পাশ্চাত্যের সমাধান : এশিয়ায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ব্যর্থতা ২১৭

পরিশিষ্ট

সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুস্থ সমাজ গঠনের মৌল নীতিমালা ২২৩

নির্ঘণ্ট

২২৫

www.amarboi.org

ক. প্রশাসনিক চিন্তাধারা

১. লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা ৯-২১
২. লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিবর্তন ২২-৩৩
৩. উন্নয়ন প্রশাসন ঃ তত্ত্ব, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা ৩৪-৪১
৪. প্রশাসনিক সংস্কারে 'নব লোক-ব্যবস্থাপনা' নীতি ৪২-৫৪

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনিক সভ্যতা বিনির্মাণে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে আজকের দিনে এই চমকপ্রদ সাফল্যের পেছনে মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে 'মানবিক প্রযুক্তি', অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সাংগঠনিক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির ব্যাপকতা মহাকাশ গবেষণা হতে শুরু করে, কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অপর অর্থ হচ্ছে 'লোক- প্রশাসন' যা সরকার নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদক্রমভিত্তিক সংগঠন ও নিয়ম-নীতির কাঠামোয় পরিচালিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম প্রক্রিয়া।

যুগে যুগে, লোক-প্রশাসনকে সাংগঠনিকভাবে সুসংহতকরণ ও এর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মনীষীদের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও বাস্তব প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কালক্রমে যে জ্ঞান ভান্ডার গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণীকক্ষে অধ্যয়নের জন্য 'লোক-প্রশাসন' নামে এক পৃথক পাঠ্য শৃঙ্খলা। ঢাকা ও চট্টগ্রামের পর, রাজশাহী, সিলেট, কুষ্টিয়া এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন বিষয়ে পৃথক বিভাগ গড়ে উঠেছে, এবং সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা পর্যায়ে বিষয়টি প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লোক-প্রশাসন বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে যে সকল কোর্স পড়ানো হয়ে থাকে, সে সম্পর্কিত পাঠ্য উপকরণসমূহ গড়ে উঠেছে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে, এবং তাও পাশ্চাত্য দুনিয়ায় (বিশেষতঃ আমেরিকায়)। প্রশ্ন উঠেছে, পাশ্চাত্য পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হওয়া এ সকল পাঠ্য উপকরণ বাংলাদেশের মত প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশের ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে কতটুকু প্রয়োগ উপযোগী ? আরবের খেজুরগাছ যেমন বাংলাদেশের মাটিতে ফলবে না, তেমনি পাশ্চাত্যের সফল উন্নয়ন মডেল প্রাচ্যের দেশসমূহে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন না করাটাই স্বাভাবিক। অতএব, বিশেষজ্ঞগণও আজ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোন দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার প্রয়োজনে সে সবকে সংশ্লিষ্ট দেশের পরিবেশ, মানুষের জীবনাচরণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন। লোক-প্রশাসনের উপর পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কিত Fred W. Riggs -এর *The Ecology of Public Administration* (১৯৭৫) এবং Farrel Heady কর্তৃক তুলনামূলক লোক-প্রশাসন বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে রচিত, Public Administration : *A Comparative Perspective* (1984) ইত্যাদি গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে যে, "No Model can be sound and effective unless it is grounded in the culture and ideology for the people which it is constructed to serve" (Al-Buraey, 1978: 297)। আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণা, সংগঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া

www.amarboi.org

আল ইদরিসি অংকিত পৃথিবীর মানচিত্র ॥ উলুগ বেগের সময়ে একটি ভূগোলক

আল হাইসান অংকিত চোখের গঠন ও রোগ বর্ণনা ॥ আল রাজির অংকিত মানব দেহের অভ্যন্তরীণ চিত্র

অক্ষিগোলক ॥ মাথা এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিত্র

www.amarboi.org

চাঁদের গতিচিত্রের মাধ্যমেই ত্রিকোণমিত্রির উদ্ভব

উলুগ বেগের এ্যাস্ট্রোল্যাব

মুসলিম মনীষীদের জটিল গাণিতিক সূত্র

আল খাওয়ারিজমী অংকিত বর্গক্ষেত্রের পরিমাপ

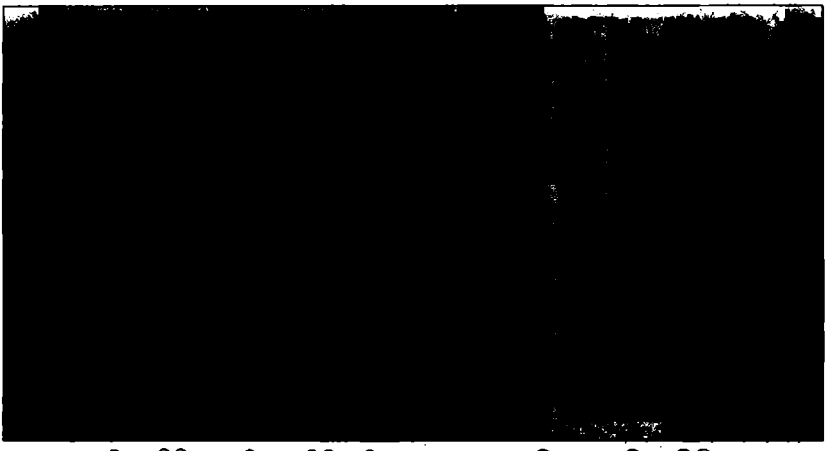

মুসলিম মনীষীদের জটিল জ্যামিতিক চিত্র

চিত্রে একটি গাণিতিক সূত্র

www.amarboi.org

বা নিয়ম-নীতির সবকিছুই পাশ্চাত্য হতে ধার করা। এ জাতীয় প্রশাসন ব্যবস্থা দেশবাসীকে কাংখিত সেবা প্রদানে শুধু ব্যর্থই নয়, জনগণের স্বাভাবিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তার উপর রয়েছে চরম অদক্ষতা ও দুর্নীতির ভয়াবহ অভিশাপ। বিশ্বব্যাংক ও *ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের* বার্ষিক রিপোর্টে একথাই উল্লেখিত হয়ে আসছে বার বার। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা দাঁড়কাকের মত, ময়ূরের সুন্দর পুচ্ছ বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গীকে অনুসরণ করতে গিয়ে ময়ূরও হতে পারছি না, আবার অতি অনুকরণ প্রচেষ্টায় নিজদের মৌলিকত্বও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। ফলে আমরা পরিণত হয়েছি অনেকটা ময়ূর ও কাকের মাঝামাঝি - দাঁড়কাকে! এসকল বিষয় পরিমিত তথ্য ও উপাত্তসহকারে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে Dr. Doh Joon-Chien রচিত, *Eastern Intellectuals and Western Solutions: Follower Syndrom in Asia* (1980); Dr Anisur Rahman -এর People's Self- Development (1994); এবং Dr. Mohammad Al-Buraey-এর *Administrative Development: An Islamic Perspective* (1985) শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে। এরা সবাই পাশ্চাত্যের সর্বোন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উন্নয়নকর্মে প্রাচ্যের অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী।

আমরা পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ উন্নয়নে বিমোহিত হলেও আমাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। পশ্চিম গোলার্ধে বসবাসকারী উন্নত বিশ্বের জনগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়রা চিরদিনই আমাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। তাদের দৃষ্টিতে আমরা হচ্ছি সমুদ্রের এপারে বা তাদের ভাষায় *অরিয়েন্ট* বা প্রাচ্যে বসবাসকারী কতিপয় পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী। সাগরের পূর্বাঞ্চলের এই *আনসিভিলাইজড* জনপদকে সভ্য করার ব্রত নিয়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক অধিপতি আলেকজান্ডার মিশর ও পারস্য হয়ে ভারত অবধি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। একাডেমিক পরিভাষায় আমরা হচ্ছি অরিয়েন্ট বা প্রাচ্য। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে যা পশ্চিমা নয়, তাই অরিয়েন্ট বা প্রাচ্য। পশ্চিমারা মনে করে, প্রাচ্য মানেই অবাস্তব, *আনসিভিলাইজড*, বর্বর ও অনুন্নত। বাস্তব জীবন আছে কেবল পশ্চিমাদের কেননা, তাদের আছে ক্ষমতা, রাজনীতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। *অরিয়েন্টদের* ভেতর পশ্চিম খুঁজে পায় কেবল দুর্বলতা, অবাস্তবতা, কুসংস্কার, মালিন্য ও রোমান্টিকতা। *অরিয়েন্টের* ভাষা নাকি অনান্দনিক এবং শিক্ষায় আছে বোধশূন্যতা ও যান্ত্রিকতা, কেননা অরিয়েন্টরা আদার বা ভিন্ন, পশ্চাদ্‌পদ ও হীনমন্য জনগোষ্ঠী। আমাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এসকল দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Edward W. Said ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত, *Orientalism* (প্রাচ্যতত্ত্ব) শীর্ষক গ্রন্থে। সাইদের ভাষায়, "প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভাবনার ভিত্তি হল পৃথিবীকে কল্পনায় অসম দুই ভাগে বিভক্তকারী তীব্র দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ভূগোল। 'ভিন্ন' ধরণের বড় অংশটার নাম 'প্রাচ্য'; 'আমাদের' বলে অন্য

www.amarboi.org

অংশটিকে বলা হয় 'পাশ্চাত্য' বা পশ্চিম (Said, 1978:49-73)। *অরিয়েন্টালিজম* মূলতঃ পশ্চিমের একটি বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভাষ্য (Discourse)। এই গ্রন্থে সাঈদ তদন্ত করেছেন কিভাবে পশ্চিমাদের জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতা, পান্ডিত্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদ্যার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা সংযুক্ত হয়েছিল। প্রাচ্যকে উপনিবেশ বানাতে হলে প্রাচ্যকে জানতে হবে একেবারে নিজের মত করে। পশ্চিমের প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা এভাবে প্রাচ্যকে জেনেছেন খ্রিস্টান মিশনারী *(ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি)* পাঠিয়ে, ইউরোপীয় পরিব্রাজকের ভ্রমন কাহিনী (পর্তুগীজ নাবিক টম পিয়ার্সের *সুমা অরিয়েন্টেল* ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন স্টাডি সর্কেলের (*এশিয়াটিক সোসাইটি* ইত্যাদি) সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান কর্তৃক মিশর দখলের পরিকল্পনাকে কার্যকর করার লক্ষে প্রথমে একদল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিত প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীতে আরেকটি নতুন ও দীর্ঘ অধ্যায়ের শুরু হয় যখন French Institute of Oriental Studies -এর Silvestre de Sacy-এর তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স হয়ে উঠে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশ্বগুরু। এই অধ্যায়ের চরম পরিণতি পায় কিছুদিন পর ১৮৩০ সালে ফরাসি সেনাবাহিনী কর্তৃক আলজিরিয়া দখলের ঘটনায়। অনুরূপভাবে, ইতালী দখল করে নেয় লিবিয়া, হল্যান্ডের উপনিবেশে পরিনত হয় ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ এবং মালয়েশিয়া ও বার্মা হতে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবধি বিস্তীর্ণ এলাকার উপর শাসন কায়েম করে ইংল্যান্ড। উল্লেখ্য যে, বাংলায় সামরিক আগ্রাসন চালানোর পূর্বে বৃটিশরা Charles Grant নামক এক প্রাচ্যতাত্ত্বিককে নিয়োগ করেছিল বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের আচার-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য। পরবর্তীকালে পুরা উপমহাদেশ দখলের পর, ইংল্যান্ড প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সুকৌশলে এতদ্অঞ্চলের উপর দীর্ঘমেয়াদী ঔপনিবেসিক শাসনের প্রাতিষ্ঠানিকরণ সম্পন্ন করে। উল্লেখ্য যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এখনও পরিচালিত হচ্ছে প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান SOAS (School of Oriental and African Studies) গবেষণা কেন্দ্র। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, *অরিয়েন্টালিজম* একটি বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকল্প মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন উদাহরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাঈদ দেখান যে, অরিয়েন্টালিজম বিদ্যা চর্চার অন্তরালে এক বিচিত্র ও নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির প্ররোচনা ও সহিংস সাম্রাজ্যবাদ অসামান্য চাতুর্যে বিষ্ফারিত। কিন্তু পশ্চিমারা যাই ভাবুক না কেন, আমাদের *অরিয়েন্ট* তো একটা বাস্তব ভৌগলিক সত্য যার রয়েছে নিজস্ব আখ্যান, জনপদ, সংস্কার, ঐতিহ্য ও ইতিহাস; আছে নিজস্ব ভাষা, ভাবনা ও জীবনধারা। অরিয়েন্ট তো নিজেই নিজের ঐতিহাসিকতা তৈরী করেছে। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি বলপ্রয়োগ ও কর্তৃত্ব বিস্তারের মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিকতাকে কিছুটা বদলে দিয়েছে মাত্র।

কিন্তু যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জোরে পাশ্চাত্য আজ উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে, আমরা অনেকেই জানি না যে, মানবজাতির এই অভিন্ন সম্পদ গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রাচ্যের মুসলমানদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আজ হতে প্রায় বার শত বৎসর

www.amarboi.org

পূর্বে, রাজধানী হিসাবে বাগদাদের প্রতিষ্ঠালগ্নকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য খলিফা আল্-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রিঃ) আহবান করেছিলেন এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন (৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে)। ওই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল পৃথিবীর পরিধির নিখুঁত মাপ নির্ধারণ করা। আল্-মনসূরের উদ্যোগে ওই সময়ে বিশ্বের যেখানে যত নামকরা পন্ডিত ছিলেন তাঁদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে ভারতীয় ব্রাহ্মণ পন্ডিত কংকা দশমিকের অংক উপস্থাপন করেছিলেন। এই দশমিকই আজ অংকশাস্ত্র, হিসাব বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান তথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তি। আরব বিজ্ঞানী আল্-খাওয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রিঃ) মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বন্টন ও জাকাতের সঠিক পরিমান নির্ধারনে শূন্য ও সংখ্যার ব্যবহারিক মান নির্ধারণ করে বিজ্ঞানচর্চাকে উল্লম্ফন প্রদান করেছিলেন। তাঁকে বলা হয়ে থাকে বীজগণিত ও আধুনিক কম্পিউটারের আদি পিতা। কম্পিউটারের সাহায্যে জটিল অংকের সমাধানে বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত algoritham শব্দটি তাঁর নামেরই ইংরেজি সংস্করণ। এই বীজগণিত ও আলগরিথামই পরবর্তীতে জার্মান বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীদেরকে কম্পিউটার উদ্ভাবনের পথ করে দিয়েছিল। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, *হিসাব-আল-জবর ওয়াল মুকাবালা* নামক গ্রন্থটি তাকে অমরত্ব প্রদান করেছে। ইব্নে হাইতাম (Ibn Haytham) নামক অপর মুসলিম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'পরীক্ষণ বিজ্ঞানের' (Experimental Science) প্রতিষ্ঠাতা যিনি আলোক বিজ্ঞানী হিসাবেও পরিগণিত। সে সময়কার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইরানের আল্-বেরুনী তাঁর রচিত কিতাব-উল-হিন্দে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জ্ঞানের অন্বেষায় সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করে বার বৎসর ধরে ভারতের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের পায়ের কাছে বসে পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মত জ্ঞানচর্চা করেছেন। আল্-বেরুনী সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানী আবদুস সালামের অভিমত হচ্ছে, তিনিই মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলির বিশ্বজনীনতা তুলে ধরেছিলেন। ইউরোপীয় *রেনেসাঁর* (গণজাগরণ) মূলেও ছিল মুসলিম পন্ডিতদের গবেষণা বিশেষতঃ শত শত বৎসর ধরে ইউরোপে নিষিদ্ধ ঘোষিত গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের (বিশেষতঃ এরিষ্টোটলের পলিটিক্স ইত্যাদি গ্রন্থ) অনুবাদ ও প্রচার। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "শত শত বৎসর ধরে ইসলামের সৃজনশীল প্রতিভা মধ্যযুগীয় বিশ্বকে বিজ্ঞান, দর্শন এবং শিল্পকলায় এগিয়ে নিয়েছে। এমনকি এর রাজনৈতিক পতন শুরু হওয়ার পরও" (Lichtenstadtler, 1958:22)। উপরিউক্ত বক্তব্যের ধারায় বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ W. Montgomery Watt তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন, "বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় মুসলমানদের (তিনি 'আরবী' শব্দ ব্যবহার করেছেন) অবদান ব্যতিরেকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন আজ এভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারত না" (Watt, 1972; এবং Schacht and Bosworth, 1974)।

বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারিত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যদি হয় আইনের শাসন, তার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল পাশ্চাত্যে নয়, দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রাচীনতম ভূমি ব্যবিলনে, আজ যেখানে ইরাক নামের দেশটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ইঙ্গ-

www.amarboi.org

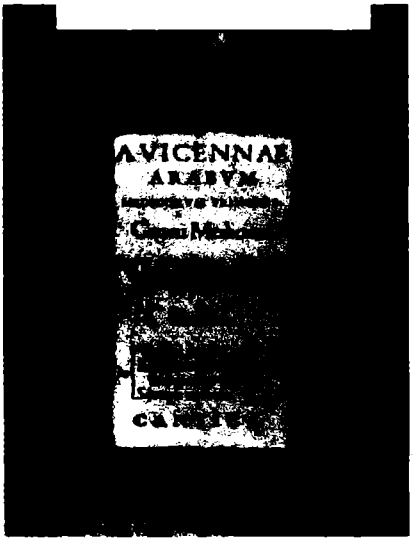

ইবনে সিনার কানুনগ্রন্থের ইউরোপীয় সংস্করণ

মার্কিন আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত। পাশ্চাত্যের মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় পশুর ন্যায় জীবন যাপন করছিল, তখন মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম আইন গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ব্যবিলনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সূতিকাগার বলে বিবেচিত প্রাচীন গ্রীসেরও বহু আগে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে ব্যবিলনের প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ শাসক হাম্মুরাবি (১৭০২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রণয়ন করেছিলেন এক শাসনবিধি যেটি ইতিহাসে *Code of Hammurabi* বা *হাম্মুরাবির দন্ডবিধি* নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক (মূল্য নির্ধারণ, শুল্ক ও বাণিজ্য), পারিবারিক (বিয়ে ও তালাক), ফৌজদারি (হামলা ও চুরি) ও দেওয়ানি (দাসত্ব ও ঋণ) ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ২৮২টি বিষয়ে আইনের সমাহার হাম্মুরাবির ওই দন্ডবিধি ছিল এক বিশদ আইন। অপরদিকে, প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমার্ত্য সেন বলেছেন, "গণতন্ত্র কেবল পশ্চিমা কিংবা কোন ইউরোপীয় ধারণা ভাবাটা ভুল হবে ...একই সময়ে ইরান ও ভারতীয় সমাজও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির চর্চা করেছে"। তাঁর মতে, "দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র ব্যাপকতম অর্থে জনগণের বিচারবুদ্ধির অনুশীলন... ভারতে যুক্তিসহকারে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠানের এক সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী ঐতিহ্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে প্রকাশ্যে জনসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সম্রাট আশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজধানী পাটনায়। এছাড়াও মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৯০-এর দশকে আগ্রায় বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বের প্রথম সুপরিকল্পিত প্রকাশ্য আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেটা এমন এক সময়ে করা হয় যখন

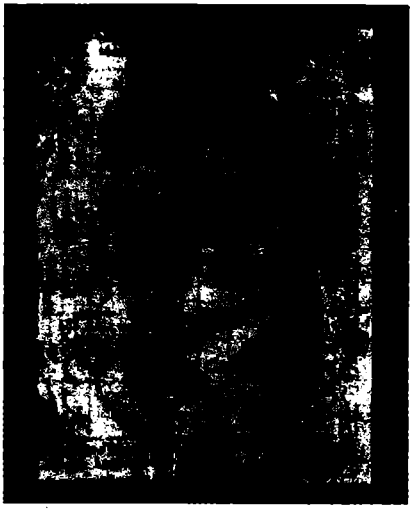

ইবনে সিনার পুস্তকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সচিত্র বর্ণনা

www.amarboi.org

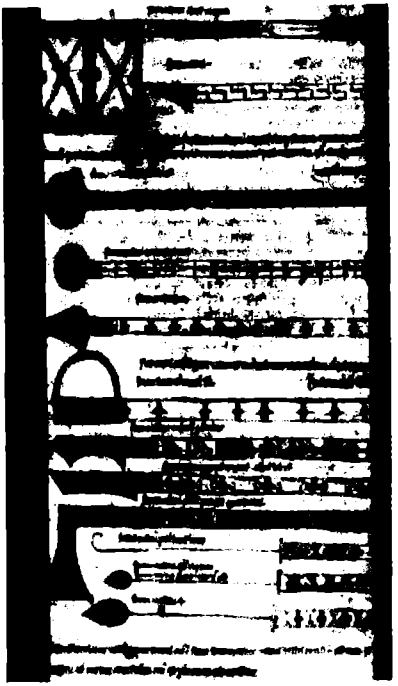

মুসলিম চিকিৎসাবিদ্‌দের ব্যবহৃত অস্ত্রপচারের বিভিন্ন যন্ত্র

ইউরোপে ধর্মীয় অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক জাজকদের বিচার সভা চলছিল" (বিস্তারিত দেখুন Amartya Sen, "Contrary India" The Economists, December 3, 2005)। 'গণতন্ত্র' চর্চার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠায় যে 'সুশীল সমাজের' ভূমিকার কথা ইদানিংকালের বহুল আলোচিত বিষয়, এর উৎপত্তি কিন্তু মধ্যযুগের মুসলিম দেশগুলির কফি হাউসগুলিতে, যেখানে বসে সচেতন নাগরিকরা শাসক ও শাসন ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন। Wickens তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, আজকের উন্নত পাশ্চাত্য প্রশাসনিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য হতে বহু সামরিক ও বেসামরিক শব্দ ও ধারণা গ্রহণ করেছে যেমন, Diwan হতে ফ্রেন্স Douane; ইংরেজি Tariff, Custom-house, *Tare, Admiral, Arsenal* এবং Barbican ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে আরব (Savory, 1976)।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও শাসকেরা যখন বহু লোকের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে ধারণ করার সহিষ্ণুতায় স্বীকৃতি প্রদান তথা উৎসাহিত করছিলেন, তার পাশাপাশি সেসময়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে ইউরোপে Galilleo Galilei (১৫৬৪-১৬৪২খ্রিঃ)-এর ক্ষেত্রে আমরা যে ধর্মবিচার সভা প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনটির নজির ইসলামের তথা প্রাচ্যের ইতিহাসে নেই। গ্যালিলিও কিন্তু যথাযথই দিক্ নির্দেশ করেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। অথচ গ্যালিলিওকে এই সত্য প্রচারের জন্য চার্চের সামনে নতজানু হয়ে অনুশোচনা করে বলতে হয়েছিল যে, তিনি যা বলেছেন তা ঠিক নয়! কিন্তু মানবজাতি আজও জানে যে, গ্যালিলিওই ছিলেন সঠিক। গ্যালিলিওর পূর্বে এ জাতীয় মতামত প্রকাশের জন্য চার্চের নির্দেশে ইতালীর জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ Leonardo

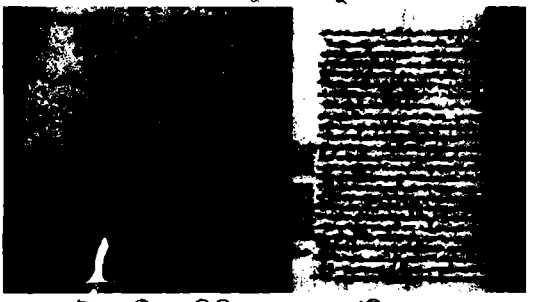

ইবনে সিনার লিখিত পুস্তকের দু'টি পাতা

www.amarboi.org

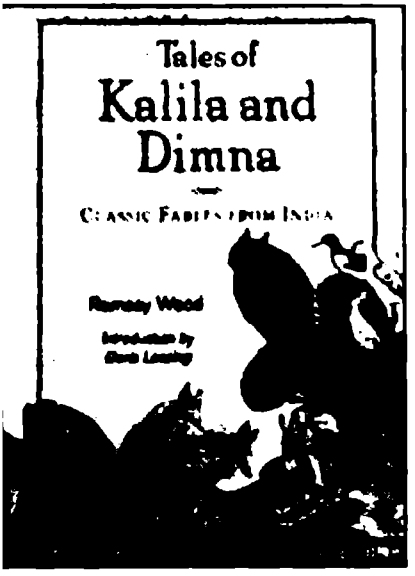

বিদ্‌পাই রচিত কালিমা ও দিম্‌না

Bruno (১৫৪৮-১৬০০খ্রিঃ) -কে জ্বালিয়ে মারা হয়েছিল। খলিফা আল-মামুনের সময় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য বাগদাদে *"বায়তুল হিক্‌মা"* নামে জ্ঞানের যে আবাস গড়ে উঠেছিল, এর গ্রন্থাগারে ছয় লক্ষ মূল্যবান গ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল। সে তুলনায় সমগ্র ইউরোপের দেশগুলির গ্রন্থাগারসমূহে সেসময়ে সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র বার হাজার! তাও আবার এসবের অধিকাংশই ছিল আরবি গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ। *অরিয়েন্টালিস্টদের* দৃষ্টিতে প্রাচ্য সাহিত্য শুধু রোমান্টিকতায় ভরা! কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিদ্‌পাই নামক জনৈক ভারতীয় দার্শনিক কর্তৃক স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন দু'টি পশুচরিত্র (শৃগাল) অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পঞ্চতন্ত্র (*যা কালীলা ওয়া দিম্‌না* নামে প্রথমে পাহ্লভী ভাষায় রূপান্তরিত এবং পরবর্তীতে আরও ৪০টি ভাষায় অনূদিত) ধ্রুপদী রাজনৈতিক সাহিত্য হিসাবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একই ভূখন্ডে বসবাসকারী বহু সম্প্রদায় ভিত্তিক 'জাতিগঠন' ও 'সাংবিধানিক সরকার' ব্যবস্থা হচ্ছে মূখ্য উপজীব্য বিষয়। পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়া আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে অরাজক পরিস্থিতি হতে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় মানুষের মাঝে 'সামাজিক চুক্তির' (Social Contract) মাধ্যমে সরকার গঠন তথা রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা পড়ানো হয়। এই তত্ত্বের উদ্যোক্তা হলেন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনৈতিক দার্শনিক Thomas Hobbes (১৫৮৮-১৬৭৯), John Locke (১৬৩২-১৭০৪) এবং Jean Jacque Rousseau (১৭১২-১৭৭৮)। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জাতিগঠন ও সাংবিধানিক সরকার গঠনের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৩ খ্রিঃ) মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত *মদিনা সনদ*। এই সনদের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সাংবিধানিক সরকার তথা ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। সাংবিধানিক সরকার গঠন ও মদিনায় বসবাসকারী বহু ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিয়ে একই *উম্মা* যা সহিষ্ণু জাতি গঠনের অনুপম উদাহরণ হচ্ছে এই মদিনা সনদ।

আমাদের লোক-প্রশাসন চর্চা সম্পর্কিত অপর যে প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে, বিগত একশত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে লোক-প্রশাসন সম্পর্কিত

www.amarboi.org

মহামতি অশোক
জন্ম : খ্রিস্টপূর্ব ২৯৪ সন। মৃত্যু : খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ সন
মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা

জ্ঞান ভান্ডার সৃষ্টির পূর্বে, আমাদের জনপদে সরকার বা প্রশাসন বলে কি কিছু ছিল না? লোক-প্রশাসনের উন্নয়নে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কি কোন অবদান বা ঐতিহ্য নেই? যদি থেকে থাকে, তাহলে বর্তমান প্রজন্ম অবশ্যই সেটা জানার অধিকার রাখে। অবশ্যই আমাদের ঐতিহ্যে বর্তমান প্রজন্ম গৌরবান্বিত বোধ করার মত বহু উপকরণ ছড়িয়ে আছে। আমরা কি জানি যে, আজ হতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোক? অশোকের রাষ্ট্রীয় দর্শন ছিল ধর্মমঙ্গল (অর্থাৎ জনগণের কল্যাণের মাধ্যমে মানুষের মন জয়, এবং যুদ্ধ নয়, এই মনজয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো)।

মনুষ্য চিকিৎসালয়ের পাশাপাশি পশু চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ, প্রাণী বৈচিত্র রক্ষার্থে পশু-পক্ষী নিধন নিষিদ্ধকরণ, জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ, বন্দিদের সাথে সদাচরণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি ছিল অশোক প্রতিষ্ঠিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইদানিংকালে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারী সমাজের উন্নতির জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠনের কথা শুনি, কিন্তু ভারতে তথা বিশ্বের ইতিহাসে *স্ত্রীমহাধ্যক্ষ* বা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী প্রথম নিয়োগ করেছিলেন মহামতি অশোক। আমরা বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে প্রবীণ ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান কর্মসূচী প্রবর্তনের কথা শুনি। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে জনজরিপের মাধ্যমে প্রসূতি মা'সহ সমাজের প্রবীণ ও অসহায়দের চিহ্নিতকরণ ও তাদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা:) (Al-Bureay, 1985:254)। আমরা যে আজ জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে দেশব্যাপী খাবার ও ঔষধ ইত্যাদিতে ভেজাল বিরোধী মোবাইল কোর্টের অভিযানের কথা শুনি, এটি এসেছে ইসলামী খিলাফতের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান *হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) হতে। আমাদের সংবিধানের ৭৭নং ধারায় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরক্ষা হিসাবে *অম্বুড্‌সম্যানের* কথা বলা হয়েছে। এটি হচ্ছে ইসলামী প্রশাসনের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান *দিওয়ান-ই-মাজালীম* –এর উত্তরসূরী (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের, *প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা* প্রতিরোধে অম্বুড্‌সম্যান, ২০০১)।

www.amarboi.org

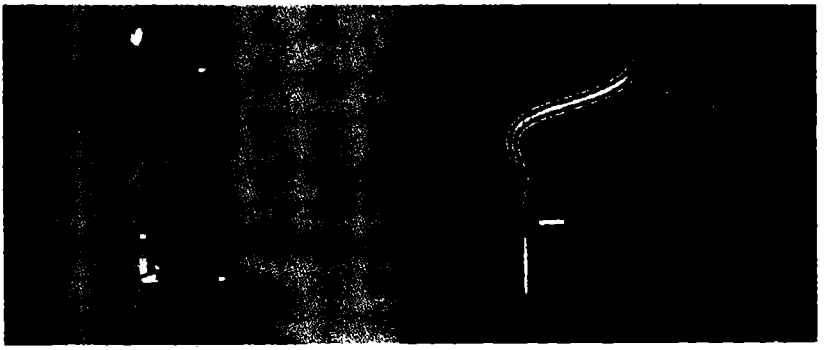

আল জাযারীর পানি ঘড়ি

আল জাযারীর পানি উত্তোলক যন্ত্র

আল জাযারীর পাম্প

মুসলিম রসায়নবিদদের তৈরী করা কাগজ

কনফুসিয়াস
জন্ম ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১ সন। মৃত্যু ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ সন
মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'সুশাসন' দর্শনের প্রবর্তক

কৌটিল্য
জন্ম ও মৃত্যু ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ বছর আনুমানিক
রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কিত
ধ্রুপদী সাহিত্য অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা

www.amarboi.org

পাশ্চাত্য সাহায্য সংস্থাসমূহের মুখে আজ আমরা সুশাসন (Good governance) প্রতিষ্ঠার হেদায়েত শুনি। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, *জিন* বা মানব কল্যাণমুখী সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রশাসকদের আত্মিক উন্নয়নে সুসংহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন চৈনিক শিক্ষাগুরু Confucious।

আবার রাজ প্রভাবমুক্ত মেধাভিত্তিক লোক-প্রশাসকদের বাছাই ও নিয়োগ এবং, শৌচ-অশৌচ পরীক্ষার মাধ্যমে সততা নিশ্চিতকরণের সুসংহত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উজীর কৌটিল্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (খ্রি:পূর্ব ৩২১-৩০০ সময়ের মধ্যে লিখা) আজও লোক-প্রশাসন বিষয়ে একটি ধ্রুপদী সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত। এছাড়াও একটি ন্যায় ভিত্তিক ও কল্যাণকর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মিশরের গভর্নরের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা সম্পর্কিত খলিফা আলীর (রা:) *প্রশাসনিক চিঠিতে* (৬৫৮-খিস্টাব্দে লিখা) প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামের সুমহান ও সুসংহত প্রশাসনিক নীতিমালা। এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিককালে একটি মুসলিম দেশের প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে নিয়োজিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন সমসমায়িককালের পাশ্চাত্য লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞ Luther Gulick এবং James Pollock কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে, "Islamic culture is one of the best bases for a strong and successful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times" *(The organization of Government Administration of the United Arab Republic, 1962)*। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের North Carolina বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রণীত Mohammad Al-Buraey-এর Administrative Development: *An Islamic Perspective* শীর্ষক পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি Kegan Paul International কর্তৃক London, Sydney এবং New York হতে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৫)। এতে পাশ্চাত্য প্রশাসনিক মডেল সমূহের সাথে তুলনামূলক আলোচনায় ইসলামী প্রশাসনের উন্নততর অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়াও সুষ্ঠু প্রশাসন সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে সুচিন্তিত পরামর্শ রয়েছে ইমাম আল্ গাজ্জালী (ইয়াহ্ইয়া-আল্-উলুম্ আল্-দ্বীন), ইব্নে খাল্দুন *(আল্-মুকাদ্দিমা)*, আল্-ফারাবী *(সিয়াসত আল্-মদনী)*, আল্-মাওয়ার্দী *(আল্-আহ্কাম আল্-সুলতানিয়া)*, নিযাম-উল্ মুল্ক (সিয়াসাতনামা) এবং আবুল ফজলের (আইন-ই-আক্বরী) গ্রন্থাবলীতে।

এই যে কৌটিলের *অর্থশাস্ত্র*, এই যে কন্ফুসিয়াস দর্শন বা অশোকের ধর্মমঙ্গল কর্মসূচী এবং মহানবী (সা:) ও *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* প্রশাসন– এগুলিই হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব। এগুলোই মিশে আছে আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ও *বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে লোক-প্রশাসন চর্চার* উপর পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনেও "পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি, প্রতীচ্যের দর্শন সম্পর্কেও আমাদের সম্যক ধারণা থাকা উচিত" বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে [আনিসুজ্জামান, আহমেদ ও জিন্নাহ

www.amarboi.org

(সম্পাদিত), বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন চর্চা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২]। এক্ষেত্রে UNESCO-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক Rena Meheu এর বহুল ব্যবহৃত উক্তি হচ্ছে, "Ce qui est le divelopment c'st lorsque la seience devient la culture", অর্থাৎ একটি জাতি উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছবে যখন এর প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রের বিজ্ঞানসমূহ এর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দেশজ পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবে। এর অন্তর্নিহিত বাণী হচ্ছে, আমরা অবশ্যই আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করব, তবে তা হবে অনুঘটক হিসাবে, দেশজ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে নয়।

অতএব, লোক-প্রশাসনে "প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা" অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা এবং আমাদের ঐতিহ্যে লুকিয়ে থাকা উপকরণসমূহ সংগ্রহপূর্বক, তা পাশ্চাত্যের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণপূর্বক, বর্তমান সময়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে দেশোপযোগী এক অর্থবহ প্রশাসন গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। সেটাই হবে দেশকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ও জাতীয় উন্নয়নে আমাদের সৃজনশীল অবদান। লোক-প্রশাসন অধ্যয়নের সার্থকতা সেখানেই।

তথ্যসূত্র

1. Al-Buraey, Mohammad, *Administrative Development: An Islamic Perspective* (London:KPI. Ltd.,1985).
2. Chien, Doh-Joon, *Eastern Intellctuals and Western Solutions : Follower Syndrome in Asia* (New Delhi:Vikas Publishing House Ltd ; 1980).
3. Heady, Farrel, *Public Adminstration: A Comparative Perspective,* Third Edition (New York : Marcel Dekker Inc.,1984).
4. Lichtenstadtler, I., *Islam and the Modern Age* (New York: Bookman Associates, 1958).
5. Rahman, Anisur, *People's Self-Development* (Dhaka : University Press Ltd, 1994).
6. Riggs, Fred W., *The Ecology of Public Administration* (London:Asia Publishing House, 1975).
7. Said, Edward W., Orientalism (New York: Panthcon Books, 1978).
8. Savory, R.M. (ed.), *Intruduction to Islamic Civilization* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).
9. Schacht, J. and Bosworth, C.E. (eds.), *The Legacy of Islam* (Oxford: Clarendon Press, 1974).
10. Watt, W. Montgomery, *The Influence of Islam on Mediaval Europe* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972).
১১. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (সম্পাদিত), *বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন চর্চা,* সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০২

www.amarboi.org

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিবর্তন*

ভূমিকা

পাঠ্যবিষয় হিসাবে লোক-প্রশাসনের আবির্ভাব সাম্প্রতিককালে [১] হলেও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসাবে লোক-প্রশাসন সমাজ ও সরকারের মতই প্রাচীন [২]। পরম্পরাগতভাবে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের ইচ্ছা বা নীতিসমূহ কার্যকর করার কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা। সংক্ষেপে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের 'কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া'। এখানে 'কাঠামো' অর্থ সংগঠন যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ ১) যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারীদের নিয়োগ; ২) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের সংগঠন; ৩) কর্মপরিচালনায় নির্ধারিত বিধি-বিধানের প্রয়োগ; এবং ৪) সংগঠনকর্মে নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা (Blau and Meyer 1971: 8-9)। আর 'কর্মপ্রক্রিয়ার' মধ্যে রয়েছে ঃ ১) প্রশাসনকর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন; ২) কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ; ৩) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান; এবং ৪) মূল্যায়ন বা জবাবদিহিতা (Robbins 1978 : 15-20)।

সরকারের উদ্দেশ্য বা নীতিসমূহের সঠিক প্রণয়ন ও সফল বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারি কর্মচারীদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে যুগে যুগে লোক-প্রশানবিদ্‌দের চিন্তা ও গবেষণা লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে লোক-প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের চিন্তাধারায় বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লোক-প্রশাসন সম্পর্কিত ধারণা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত লোক-প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা করা হত যে, এটি একটি 'মূল্য নিরপেক্ষ' বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল "দক্ষতার" সাথে এবং যতদুর সম্ভব "স্বল্পতম ব্যয়ে" কার্য সম্পাদন করা। সরকারের আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কিভাবে সরকারি কর্মচারীদের কার্যকারিতা বা দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়? কিভাবে সময় ও সম্পদের স্বল্পতম ব্যয়ে কার্য সম্পাদন সম্ভব? সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিভাবে সম্ভাব্য সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়? মূলতঃ এসকল বিষয়ই ছিল লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (Corson and Harris 1963: 10; Waldo 1968 : 153-89)।

---

* *সৌজন্যেঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ* (সমাজ বিজ্ঞান), চতুর্দশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ ১১৫-১২৬।

www.amarboi.org

তিরিশের দশকে লোক-প্রশাসন বিষয়ে একজন বিশিষ্ট মার্কিন পন্ডিত লিখেছেন : "সরকারি হউক আর বে-সরকারি হউক, প্রশাসন বিজ্ঞানের মূল ভাল দিকটি হচ্ছে 'দক্ষতা'। প্রশাসন বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব সম্পদ ও বস্তুর 'স্বল্পতম ব্যয়'। সুতরাং 'দক্ষতা' হচ্ছে প্রশাসনিক মূল্য পরিমাপের ব্যাপারে এক নম্বরের স্বতঃসিদ্ধ সত্য"[৩]। প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রায় সর্বত্রই সরকারি প্রশাসনে অর্থনৈতিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও সরকারি প্রশাসনে অর্থনৈতিক দক্ষতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যয় সংকোচন, অপচয় রোধ এবং সম্পদের যুক্তিভিত্তিক বন্টন (Speight 1970 :1)।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, লোক-প্রশাসনে 'দক্ষতা' হচ্ছে স্বল্পতম ব্যয় এবং অধিকতর উৎপাদনের হার বা অনুপাত। উদাহরণস্বরূপঃ

ক =খ > গ

অথবা

গ < খ

এখানে ক = দক্ষতা/কার্যকারিতা

খ = উৎপাদন (সম্পদ, সেবা ও সরবরাহ)

গ = ব্যয় (মানুষ, সম্পদ ও সময়)

অর্থাৎ উৎপাদন নির্দিষ্ট থাকলে ব্যয় কমে যাবে (খ > গ); অথবা

ব্যয় নির্দিষ্ট থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে (গ < খ) [৪]।

এজাতীয় চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল শতাব্দীর প্রথমদিকে মার্কিন প্রকৌশলী F.W.Taylor-এর নেতৃত্বে শিল্প সংগঠনসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" আন্দোলন। এটা ছিল বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্পতম ব্যয় ও সর্বাধিক দক্ষতার সাথে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটি সফল প্রচেষ্টা। "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে, প্রতিটি কার্য সম্পাদনের জন্য 'একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি' রয়েছে এবং প্রশাসনের উচিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা খুঁজে বের করা এবং সেব্যাপারে কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা [৫]। এরই সাথে সংযুক্ত হয়েছিল প্রশাসনে ব্যবহারতব্য Fayol *(General and Industrial Management,* 1966); Willoughby (*Principles of Public Administration,* 1927) এবং James D. Mooney and Allen C. Reily *(Principles of Organization,* 1939) প্রমুখদের সুপারিশকৃত কতিপয় প্রশাসনিক নীতিমালা। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, এসকল প্রশাসনিক নীতিমালা ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছাড়িয়ে সর্বত্র পথনির্দেশিকা হিসাবে লোক-প্রশাসনের কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। L.D. White - এর মতে ঃ "একটি প্রশাসনিক নীতি রাশিয়ার লোক-প্রশাসন কর্মের জন্য যেমন উপকারী পথনির্দেশিকা, তেমনি গ্রেট ব্রিটেনের জন্য ; যেমন ইরাকের জন্য তেমনি মার্কিন

www.amarboi.org

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য" [৬]। লোক-প্রশাসনের এই সনাতনী চিন্তাধারাকে পরবর্তীতে আরও সমৃদ্ধ করেছে জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ Max Weber প্রবর্তিত "আমলাতন্ত্র" তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, লোক-প্রশাসনের যৌক্তিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হলে: ১. সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের ভিত্তি হবে মেধা; ২. কর্তৃত্ব (বৈধভাবে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা) সংগঠিত হবে পদসোপানের ভিত্তিতে; ৩. কর্মচারীদের কার্য পরিচালিত হবে নির্ধারিত নিয়ম-নীতির কাঠামোতে; এবং ৪) মক্কেলদের সাথে আচরণে আমলারা হবেন নৈর্ব্যক্তিক (Weber 1964 : 329-41; Hill 1972 : 16)। সংক্ষেপে, এগুলোই হচ্ছে আমলাতন্ত্র তথা যে কোন প্রশাসনিক সংগঠনের মূল উপাদান বা বৈশিষ্ট্য।

এ সকল সনাতনী চিন্তাধারায় লোক-প্রশাসনকে মোটামুটিভাবে একটি যান্ত্রিক কৌশল বা প্রক্রিয়া হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক সংগঠনের কর্মচারীদেরকে মনে করা হত যান্ত্রিক উপাদান হিসাবে। সেসময়ে মানুষ সম্পর্কে ধারণা করা হত যে, তারা শুধু দৈহিক ও আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। তখন লোক-প্রশাসনে কোন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিকতা বা মূল্যবোধের প্রশ্ন ছিল অনুপস্থিত। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসাবে প্রশাসন কর্মে সরকারি কর্মচারীদের "মূল্য নিরপেক্ষ" (Value neutral) দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত বেশী (যা তাদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনে সহায়ক হবে)। Harbert A. Simon (১৯৪৭ : ২৫৩) -এর মতে, লোক-প্রশাসনকে বিজ্ঞানসম্মত হতে হলে মূল্যবোধের বিবেচনা অর্থাৎ Should বা উচিতসুলভ প্রশ্নটি পরিহার করে অবশ্যই Fact বা বাস্তব ঘটনার প্রতি মনোযোগী হতে হবে [৭]। মূল্যবোধের বিষয়টি কেবলমাত্র রাজনীতিবিদ বা জনপ্রতিনিধিদের এখতিয়ারভূক্ত। এটাই ছিল লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে Simon কর্তৃক উত্থাপিত "যৌক্তিক দৃষ্টবাদ" (Logical Positivism) তত্ত্বের মূল কথা।

রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক সংস্কার উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সরকারের ব্যয় সংকোচন ও লোক-প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি। সে সময় এটা বহুলভাবে বিশ্বাস করা হত যে, লোক-প্রশাসনের প্রধান এবং একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত সরকারি নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন। এ জাতীয় চিন্তাধারার প্রথম সূত্রপাত ঘটান ওয়েসলিয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক Woodroow Wilson (পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট)। উইলসন ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি সাড়া জাগানো নিবন্ধে বলেনঃ "লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারি আইনের বিস্তারিত এবং রীতিবদ্ধ বাস্তবায়ন" (1887: 197-222)। উইলসন এবং তাঁর সমসাময়িক পন্ডিতবর্গ যেমন Henry Goodnow *(Politics and Administration,* 1900) প্রমুখদের রচনায়ও একথাই প্রকাশ পেয়েছে যে, সরকারের কর্মকান্ড মূলত ঃ দু'টি পৃথক অংশে বিভক্ত ঃ ১) রাজনীতি; ও ২) প্রশাসন। রাজনীতি

www.amarboi.org

হচ্ছে রাষ্ট্র বা সরকারের ইচ্ছা প্রতিফলিত করার মাধ্যম, এবং ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় নীতির প্রণয়নের (Policy formulation) মাধ্যমে। অতএব, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিবেচনা রাজনীতিরই প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রশাসনের নয়। এ ব্যাপারে রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আইন সভা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত ও নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। অপরদিকে, রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত সরকারি নীতিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দায়িত্ব হচ্ছে শাসন বিভাগ বা লোক-প্রশাসনের। অতএব, প্রশাসনে মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। এ ব্যাপারে "দক্ষতা" ও "ব্যয় সংকোচন"-ই হচ্ছে কেন্দ্রীয় নির্ণায়ক এবং মূল্য নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হচ্ছে নির্ণায়ক নির্ধারণের যথার্থ মাধ্যম (Waldo 1968 : 153-89)।

লোক-প্রশাসন শিক্ষার সূচনা

উইলসন-এর নিবন্ধটি অপর যে বিষয়টির প্রতি দিক নির্দেশ করে সেটি হচ্ছে, লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। তাঁর মতে, একটি শাসনতন্ত্র রচনা করার চাইতেও শাসনতন্ত্রটি কার্যকর করা অধিকতর কঠিন কাজ [৮]। তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক সরকারের কাজের পরিধি যতই বিস্তৃতি লাভ করছে, প্রশাসন প্রক্রিয়া ততই জটিল আকার ধারণ করছে। ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন মেধা ও দক্ষতার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। অতএব, প্রশাসন কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকার বিষয়ে অধ্যয়নের মূল প্রতিপাদ্য ছিল রাজনৈতিক দর্শন, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন। উইলসন ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে সে সময়ে প্রচলিত সিভিল সার্ভেন্টসদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠের সাথে সংগতি রেখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করার সুপারিশ করেন [৯]।

তারই ফলশ্রুতিতে, সরকারী জনসেবা কর্মে লোক-প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়মূহে পৃথক পাঠ্য বিষয় হিসাবে লোক-প্রশাসনের পদচারণা শুরু হয়। L. D.White রচিত লোক-প্রশাসন বিষয়ের প্রথম পূর্ণাংগ পাঠ্যপুস্তক *Introduction to the Study of Public Administration* প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। পরবর্তী বৎসর প্রকাশিত হয় W.F.Willoughby বিরচিত দ্বিতীয় পূর্ণাংগ পাঠ্যপুস্তক, *Principles of Public Administration* (1927)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লোক-প্রশাসন সম্পর্কে পরিবর্তিত ধারণা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে নতুন চিন্তাধারার সংযোগ ঘটে এবং পূর্ববর্তী ধারণাসমূহ অনেকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

www.amarboi.org

রাজনীতি-প্রশাসন বিতর্কের অবসান

পঞ্চাশের দশক থেকে এটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করে যে, লোক-প্রশাসন শুধু সরকারের নীতি বাস্তবায়ন কর্মেই সীমাবদ্ধ নয়, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি আমলাগণ তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা ও প্রশাসন কর্মে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে, সরকারি নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা ও পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, আইন সভায় যে বিলটি আলোচনা ও অনুমোদন লাভের জন্য উত্থাপিত হয়, সেটির খসড়া তৈরী করে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর পর্যায়ের আমলাগণ। অনুরূপভাবে, সরকারি আমলাগণ শুধু বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পণা প্রণয়নই করেন না, খাত ভিত্তিক সম্পদ বন্টনের অগ্রাধিকারও নির্দিষ্ট করে দেন। এতে তাদের অগ্রাভিরুচির প্রতিফলন ঘটে। সরকার প্রধান বা মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রধান (মন্ত্রী) কোন বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত দেবেন, সে ব্যাপারে ফাইলে পদসোপন ভিত্তিক নোটিং বা আইনগত ব্যাখার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্র কাঠামো তৈরী করে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আমলাগণ। এমন কি, রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রণালয়ের প্রধান তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় কি বলবেন, সেটিও লিখে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চস্তরের কর্মকর্তাগণ। এছাড়াও বৃহত্তর নীতি কাঠামোর আওতায় স্থানীয় পরিস্থিতি, পরিবেশের ভিন্নতা, সমস্যার জটিলতা ও সময়ের প্রয়োজনে, পদসোপানভিত্তিক বহু ছোটখাট সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা ন্যস্ত (Delegate) করা থাকে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের উপর। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি নীতি যদি হয় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণার্থে প্রতি বৎসর ১০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, তাহলে এই নীতি কার্যকর করার জন্য স্কুল সমূহের স্থান নির্ধারণ, স্কুলের ডিজাইন প্রণয়ন, স্কুল ঘর নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ, স্কুলের শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বহু ধরণের সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব পড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের উপর। এছাড়াও রয়েছে বহু ব্যাপারে প্রশাসকদের স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত (Administrative Discretion) প্রদানের ক্ষমতা [১০]।

উপরিউক্ত উদাহরণসমূহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি কর্ম প্রক্রিয়ায় নীতি প্রণয়ন হতে নীতি বাস্তবায়ন পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, বরং এ-দুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত বা সমন্বিত কর্মকাণ্ড। এজন্য চল্লিশের দশকের শেষের দিকে P. H. Appleby (১৯৪৯) রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদকে সমালোচনা করতে গিয়ে উপসংহার টেনে বলেন, "লোক-প্রশাসন হচ্ছে নীতি প্রণয়ন" [১১]। অতএব, 'আধুনিক অর্থে লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য বা নীতি নির্ধারণ, প্রণীত নীতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান এবং দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন'।

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার সামাজিক দিক

রাজনীতি-প্রশাসন বিতর্কের অবসানের সাথে সাথে, একটি নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসাবে (যার সনাতনী বিবেচনা "দক্ষতা" ও "ব্যয়সংকোচন") লোক-প্রশাসন সম্পর্কিত সনাতনী ধারণাটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে থাকে এই বলে যে, এজাতীয় দৃষ্টিভংগী অনেকটা সংকীর্ণ এবং অতিমাত্রায় যান্ত্রিক। পক্ষান্তরে, লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় বিশেষত ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভংগী প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে সংগঠন কাঠামো এবং আনুষ্ঠানিক পদসোপানভিত্তিক কর্তৃত্বের উপর পূর্বের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায়, এবং তদস্থলে আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে "প্রশাসনিক সংগঠন একটি সজীব সামাজিক প্রক্রিয়া" জাতীয় বক্তব্য (Nigro and Nigro 1980 : 16 : Hill 1972 :121)। এ জাতীয় চিন্তার সূত্রপাত ঘটেছিল মূলত : তিরিশের দশকে Elton Mayo এবং তাঁর সহযোগীদের দ্বারা শিকাগোর Western Electrical Company-এর কর্মচারীদের উপর পরিচালিত Hawthorne experiment বলে খ্যাত গবেষণা কার্যক্রম যা পরবর্তীকালে মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনের (Human Relations Movement) রূপ লাভ করে। উক্ত মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে, সংগঠন কর্মীদের মনোবল (Morale) এবং উৎপাদনশীলতা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তির মন-মানসিকতা এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের দলগত ও সামাজিক সম্পর্কের (কর্মচারীদের মধ্যকার এবং কর্মচারীদের সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের) উপর [১২]। অতএব, লোক-প্রশাসনে যান্ত্রিক দক্ষতার চাইতেও গুরুত্ব আরোপ করা উচিত বৃহত্তর সামাজিক দক্ষতার উপর (Waldo 1965 : 39-47)।

প্রশাসনিক নীতিমালার পরস্পর বিরোধীতা

এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গৃহীত বহু প্রশাসনিক নীতিমালা পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। Dwight Waldo এবং Robert A. Dahl (1948; 1947 : 1-11) - এর মতে, পরিবেশগত ব্যবধান ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে প্রশাসনিক নীতিমালাসমূহ সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। এসব কারণে বিশ্বের এক অংশের লোক-প্রশাসন ব্যবস্থা অপর অংশ হতে ভিন্নতর হতে বাধ্য। এরই ফলশ্রুতিতে, চল্লিশের দশকের শেষের দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে তুলনামূলক লোক-প্রশাসন বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়াও, ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে F.W.Riggs-এর নেতৃত্বে "তুলনামূলক প্রশাসন গ্রুপ" (CAG) নামে একটি গবেষকদলও আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে, ষাটের দশকে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে তুলনামূলক লোক-প্রশাসনের উপ-শাখা হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়শীল দেশসমূহের উপযোগী "উন্নয়ন প্রশাসন" (Development Administration) নামে একটি নতুন ধারণাও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে [১৩]।

উপরন্তু, চল্লিশের দশকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রশাসনিক নীতিমালাসমূহ ব্যক্তির ধারণা মাত্র, কোন পরীক্ষিত সত্য নয় এবং এগুলির মধ্যে কোন কোনটি আবার পরস্পর

www.amarboi.org

বিরোধী। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বজনীন নীতিমালার প্রবক্তারা একদিকে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, সংগঠনে 'পদসোপান' (Hierarchy) ছোট হলে প্রশাসনিক যোগাযোগ দ্রুত হয়, এবং সাথে সাথে এও দাবি করেছেন যে, 'নিয়ন্ত্রণ পরিধি' (Span of Control) সীমিত হলে তত্ত্বাবধান কার্যকর হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পদসোপান ছোট হলে অর্থাৎ চ্যাপ্টা পদক্রমবিশিষ্ট সংগঠনে নিয়ন্ত্রণ পরিধি বড় হতে বাধ্য (চিত্র নং –১)।

চিত্র নং–১

সংকীর্ণ পদসোপান বা চ্যাপ্টা নিয়ন্ত্রণ পরিধিবিশিষ্ট সংগঠ

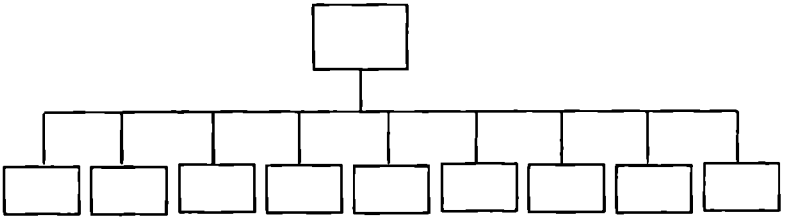

আবার নিয়ন্ত্রণ পরিধি ছোট করতে গেলে, পদসোপানের স্তর বেড়ে যাবে (চিত্র নং–২)। এতে যোগাযোগ বিলম্বিত হবে এবং সংবাদও বিকৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

চিত্র নং-২

সংকীর্ণ নিয়ন্ত্রণ পরিধি

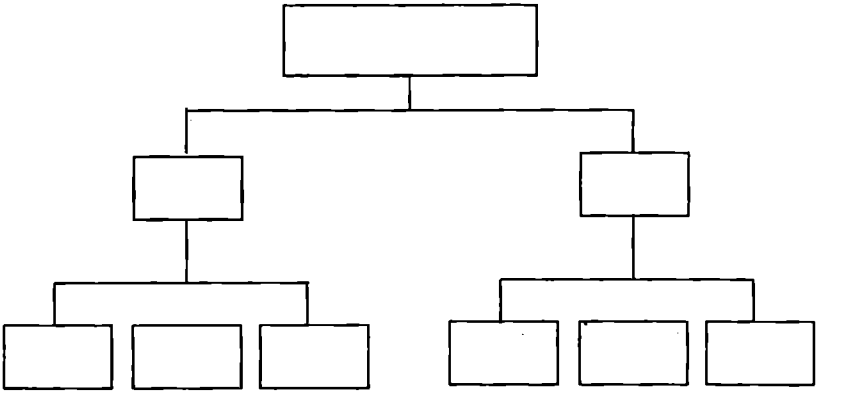

www.amarboi.org

Herbert A. Simon এই প্রশাসনিক নীতিমালাসমূহকে প্রবাদ (Proverbs) বলে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে, Max Weber বর্ণিত আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহও পরস্পর বিরোধী বলে সমালোচিত হতে থাকে। A.W.Goodner (Hill 1972 : 18) -এর মতে, এটা আপাত বিরোধী যে যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্রে নীতি হিসাবে পদসোপান (Hierarchy) শৃঙ্খলাকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং একই সাথে, বিশেষজ্ঞতার (Specialization) উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অতএব, আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে বিশেষজ্ঞ নির্ভর প্রশাসন আর পদক্রম নির্ভর কর্তৃত্বের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে (Thomposon 1961 : 485-521)।

লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধের গুরুত্ব

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, লোক-প্রশাসন নীতি প্রণয়নের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর যেহেতু নীতি প্রণয়নের সাথে জড়িত, সেহেতু লোক-প্রশাসন মূল্য নিরপেক্ষ হতে পারে না। অতএব, লোক-প্রশাসকদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের দৃষ্টিভংগী ও আচরণে মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিকালে লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধের উপাদান অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচীতে "সরকারী নীতি" ও "নৈতিকতা" কোর্সের অন্তর্ভূক্তিকরণ (Waldo 1965: 47)।

"মূল্যবোধ" হচ্ছে উচিতসূলভ চিন্তা বা ধারণা [১৪]। প্রশ্ন হচ্ছে, কি সেই মূল্যবোধ যেটা লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় প্রশাসকদেরকে পথ নির্দেশনা দেবে? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হচ্ছে, লোক-প্রশাসন যেহেতু জাতীয় সম্পদ ও জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করে, সেহেতু "জনস্বার্থ সংরক্ষণ" বা জনসেবাই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য [১৫]। মার্কিন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞ Nicholas Henry-এর মতে, "লোক" ধারণাটিকে অবশ্যই নৈতিক বা উচিতসূলভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত (১৯৮০ : ৪৭)। তিনি অভিমত প্রকাশ করে বলেন, "সেটাই হবে লোক যেটা লোক বা জনগণের স্বার্থকে প্রভাবিত করবে"। সরকারী আমলা বা লোক-প্রশাসকদেরকে তাই বলা হয় "সিভিল সার্ভেন্টস", সাম্প্রতিকালে কেউ কেউ এর বাংলা অনুবাদ করেছেন "সুশীল সেবক" [১৬]। অপর এক লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞের মতে, "একটি দেশের সরকারের মূল্যায়ন হয় সে দেশের লোক-প্রশাসন কতদূর জনস্বার্থে কাজ করছে তার উপর ভিত্তি করে" (Dwivedi 1978 : 10)। অতএব, লোক-প্রশাসনের সনাতনী গুরুত্ব অর্থাৎ "দক্ষতা", "ব্যয় সংকোচন" ও "প্রশাসনিক নীতিমালা" ইত্যাদি ততদূর পর্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে, যতদূর পর্যন্ত এগুলি "জনস্বার্থের" জন্য সহায়ক (Henry 1980 : 131-133)। এ জাতীয় বক্তব্যই হচ্ছে ষাটের দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনের" মূল কথা [১৭]। "নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনের" উদ্যোক্তারা জনগণের মধ্যে সরকারি সেবা ও সরবরাহ বিতরণের ক্ষেত্রে "সামাজিক ন্যায়বিচার" নিশ্চিত করার লক্ষে মক্কেল বা জনগণের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল দৃষ্টিভংগী গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

www.amarboi.org

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বির্তক দেখা দিয়েছে "জনস্বার্থের" ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে। জনস্বার্থের কর্ম কাঠামো কি হবে? জনস্বার্থ সম্পর্কিত নীতি প্রণয়নের পথনির্দেশিকা বা দার্শনিক ভিত্তি কি হবে; এবং সর্বোপরি, জনস্বার্থ পরিমাপের মাপকাঠি কি হবে? অবশ্য আবহমান কাল ধরে দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্রের কার্যকর সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন "সামাজিক ন্যায়বিচারের" তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। সাম্প্রতিকালে লোক-প্রশাসন পণ্ডিতগণও লোকসেবা বা জনস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোক-প্রশাসন কর্মের ভিত্তি হিসাবে John Rawls প্রবর্তিত দু'নীতিবিশিষ্ট "সামাজিক ন্যায়বিচারের" ধারণাকে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন [১৮]। জন রল্‌স ন্যায়বিচারকে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সাধারণ সুবিধার্থে অবদান ভিত্তিক বিনিময় প্রদানের ব্যাপারে একটি জটিল মিশ্রন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ সম্পর্কিত দু'টি নীতিমালায় এমন এক সামাজিক পরিবেশের কল্পনা উপস্থাপন করেছেন, যেখানে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে সবার জন্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধাদি উন্মুক্ত করার পাশাপাশি, বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাকে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক কল্যাণার্থে নিয়ন্ত্রিত করা হবে[১৯]। এই "সামাজিক ন্যায়বিচারই" হচ্ছে আজ বিশ্বব্যাপী একটি রাজনৈতিক শ্লোগান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির নিশ্চয়তা [২০]। বাংলাদেশেরও "স্বাধীনতা ঘোষণা" [২১], সাংবিধানিক আদর্শ [২২] এবং সরকারী কর্মের লক্ষ্য [২৩] হিসাবে "সামাজিক ন্যায়বিচার" [২৪] প্রতিষ্ঠার অংগীকার ঘোষিত হয়েছে।

উপসংহার

লোক-প্রশাসন একটি সনাতনী প্রক্রিয়া হলেও বক্ষ্যমান নিবন্ধে একথাই পরিস্ফূটিত হয়েছে যে, কালের বিবর্তনের সাথে সাথে, এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে বুদ্ধিভিত্তিক চিন্ত াধারায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত লোক-প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা করা হতো যে, এটি একটি "মূল্য নিরপেক্ষ" বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক নির্ধারিত সরকারী নীতিসমূহকে "দক্ষতার" সাথে এবং যতদূর সম্ভব, "স্বল্পতম ব্যয়ে" বাস্তবায়ন করাটাই ছিল লোক-প্রশাসনের চিরয়ত লক্ষ। এজাতীয় চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মার্কিন প্রকৌশলী এফ. ডব্লিউ টেলরের নেতৃত্বে শিল্প সংগঠনসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে পরিচালিত "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" আন্দোলন, এবং হেনরী ফেয়ল ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবিত কতিপয় প্রশাসনিক নীতিমালা। লোক-প্রশাসনের এই সনাতনী চিন্তাধারাকে পরবর্তীতে আরও শক্তিশালী করেছে জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্স ওয়েবার বর্ণিত "আমলাতন্ত্রের" তত্ত্ব। এ সকল সনাতনী চিন্তাধারায় লোক-প্রশাসনকে মোটামুটিভাবে একটি যান্ত্রিক কৌশল বা প্রক্রিয়া হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। সে সময়ে প্রশাসন কর্মে সরকারি কর্মচারীদের মূল্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত বেশী।

www.amarboi.org

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে নতুন চিন্তাধারার সংযোগ ঘটে এবং পূর্ববর্তী ধারণাসমূহ অনেকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকে। পঞ্চাশের দশক থেকে এটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করে যে, লোক-প্রশাসন শুধু সরকারের নীতি বাস্তবায়ন কর্মেই সীমাবদ্ধ নয়, নীতি প্রণয়নের সাথেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেহেতু নীতি প্রণয়নের সাথে জড়িত, সেহেতু লোক-প্রশাসন মূল্য নিরপেক্ষ হতে পারে না। অতএব, লোক-প্রশাসকদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে মূল্যবোধের প্রতিফলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। লোক-প্রশাসন সম্পর্কে একটি সার্বজনীন বক্তব্য হচ্ছে, এটি যেহেতু জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করে, সেহেতু জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা জনগণের কল্যাণ সাধনই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব, লোক-প্রশাসনের সনাতনী গুরুত্ব অর্থাৎ "দক্ষতা", "ব্যয় সংকোচন" ও "প্রশাসনিক নীতিমালা" ইত্যাদি ততদূর পর্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে যতদূর পর্যন্ত এগুলি "জনস্বার্থের" জন্য সহায়ক। এ জাতীয় বক্তব্য বেশী মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলনকারীদের বক্তব্যে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বির্তক দেখা দিয়েছে "জনস্বার্থের" কার্যকর সংজ্ঞা নিরূপণ এবং এর সঠিক কর্ম কাঠামো নির্ধারণ নিয়ে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে, লোক-প্রশাসন পন্ডিতগণ জনস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোক-প্রশাসন কর্মের ভিত্তি হিসাবে জন রল্‌স প্রবর্তিত "সামাজিক ন্যায়বিচারের" নীতিমালা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এই "সামাজিক ন্যায়বিচারই" হচ্ছে আজ বিশ্বব্যাপী একটি রাজনৈতিক শ্লোগান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির নিশ্চয়তা। বাংলাদেশেরও স্বাধীনতার ঘোষণা, শাসনতান্ত্রিক আদর্শ এবং সরকারি কর্মকান্ডের লক্ষ্য হিসাবে "সামাজিক ন্যায়বিচারের" অংগীকার ঘোষিত হয়েছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়ার উপর। জনস্বার্থে "সামাজিক ন্যায়বিচারের" প্রয়োগ যত বেশী হবে, ততই লোক-প্রশাসন কর্মের সফলতার পরিচয় মিলবে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন হবে "সামাজিক ন্যায়বিচার" বাস্তবায়নের যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়ন, এবং এ ব্যাপারে লোক-প্রশাসকদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীলতা সৃষ্টি করা। আর এই প্রতিশ্রুতিশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মে ব্যাপকভাবে "সামাজিক ন্যায়বিচার" বিষয়ের চর্চা সন্নিবেশিত করা।

তথ্যসূত্র

১. কেউ কেউ (বিশেষতঃ ইউরোপীয়ান লেখকগণ) মনে করেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সে প্রচারিত যথাক্রমে *Merchantilism, Cameralism I Colbertism* মতবাদই হচ্ছে আধুনিক লোক-প্রশাসনের পূর্বসুরী। আবার কোন কোন গবেষকের মতে, ১৮৮৭ সালে *Political Science Quarterly* -তে প্রকাশিত Woodrow Wilson তাঁর *"The Study of Administration"* শীর্ষক নিবন্ধে সর্বপ্রথম লোক-প্রশাসনকে পৃথক পাঠ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত করার গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। অতএব, তাঁদের মতে, *Woodrow Wilson* -ই হচ্ছেন আধুনিক লোক-প্রশাসন শিক্ষার পথিকৃত।

www.amarboi.org

২. প্রফেসর *Dwight Waldo* লোক-প্রশাসনকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত দু'টি অর্থে ব্যবহার করেছেনঃ প্রথমত, লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারী বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া; এবং দ্বিতীয়ত, লোক-প্রশাসন একটি বুদ্ধিভিত্তিক অনুসন্ধান, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বা শিক্ষণীয় বিষয়। দেখুন, Dwight Waldo, *The Study of Public Administration (New York : Random House, 1963)*, পৃঃ ৩।

৩. Luther Gulick, "Some Values in Public Administration", in Luther Gulick and L. Urwick (eds.), *Papers on the Sciences of Administration* (New York : Institute of Public Administration, 1937), পৃঃ ১৯২।

৪. উদ্ধৃত হয়েছে M. J. Balogum, "Efficiency in Public Sector : A Framework for Analysis", in M.J.Balogum, *Management Efficiency in the Public Sector*, পৃষ্ঠ ৭১।

৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Frederick Winslow Taylor, *Scientific Management* (New York: Harper and Row Inc., ১৯৪৭).

৬. Leonard D. White,``The Meaning of Principles of PublicAdministration", in John M. Gaus, Leonard D. White and Marshall E. Dimock (eds.), *The Frontiers of Public Administration* (Chicago : University of Chicago Press, 1939), p. 22.

৭. Herbert Simon, *Administrative Behavior* (New York : McMillan Company, 1947), p. 253. লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে ঘটনা (Facts) এবং মূল্যবোধের (Value) সমস্যার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Vernon Van Dyke, Political Science : *A Philosphical Analysis* (California : Stamford University Press, 1960), p. 8-13; এবং Dwight Waldo, *The Study of Public Administration* (New York : Random House, 1956), pp. 60-65.

৮. Woodrow Wilson, "The Study of Administration" in *Political Science Quarterly*, Vol. 2, (June 1887) : 197-222.

৯. – ঐ –

১০. লোক-প্রশাসকদের স্ববিবেচনার (Administrative discretion) ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের, "লোক-প্রশাসনে নৈতিকতা", প্রশাসন সমীক্ষা, বিপিএটিসি, ঢাকা ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯১।

১১. আধুনিক লোক-প্রশাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে James W. Feslerও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে "নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়ন", দেখুন, James W. Fesler, Public Administration : *Theory and Practice* (New Jersey : Prentice-Hall, 1980), pp. 2-5.

১২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Elton Mayo, *The Human Problems of an Industrial Civilization* (New York : Mcmillan, 1933); F.J. Roethlisberger and William J. Dickson, Management and the Worker (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1943); এবং George S. Claude, Jr., *The History of Management Thought* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hill, 1968).

১৩. "উন্নয়ন প্রশাসন" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জন্য দেখুন লেখকের, "উন্নয়ন প্রশাসন ঃ তত্ত্ব, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন", *Development Review* (Dhaka), Vol. 2. No. I (July 1989).

১৪. লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে "মূল্যবোধের" ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Dwight Waldo, *op. cit., pp. 60-66;* Veron Van Dyke, op. cit., pp. 8-13. 15।

www.amarboi.org

১৫. দেখুন, Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs, Second Edition (Enlgewood Cliffs, J. : Prentice-Hall Inc., 1980), p. 131; এবং United Nations, Department of Economic and Social Affairs, A Handbook of Public Administration : Current Concepts and Practices with Special Reference to Develping Countries,* বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান, লোক-প্রশাসন সার (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃঃ ১৬, ১৮, ২৪ ।

১৬. দেখুন, লোক-প্রশাসন বার্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাক্ষিক মুখপত্র, ঢাকা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, পৃঃ ৬ ।

১৭. "নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনের" ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, H. George Frederickson, "Toward A New Public Administration", in Frank Marini (ed.), *Toward A New Public Administration : A Minnowbrook Perspective* (Seranton : Chandler Publishing Company, 1972),pp. 311- 13 । Minnowbrook Conference Volumes -এর উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন *Public Administration Review,* July- August, 1973, pp. 373-378.

১৮. ১৯৭৪ সালে *Public Administration Review* -তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে D.K. Hart এ জাতীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন । বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, D.K. Hart, "Social Equituy, Justice, and the Equitable Administration". in *Public Administration Review,* 34 (1974) : 3-10.

১৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, John Ralws, "Justice as Fairness", *in The Journal of Philosophy,* Vol. 54 (October 1957), pp. 653-662; and John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford : Oxford University Press, 1972), p. 60.

২০. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, *North-South: A Programme for Survival—The Report of the Independent Commission on International Development Issues Under The Chairmanship of Willy Brandt* (London : Pen Books, 1980), pp. 24, 41-42, 36 । জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গঠনতন্ত্র এবং ফিলাডেলফিয়া ঘোষণায়ও (১৯১৯) বলা হয়, "বিশ্বজনীন এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজে"-১৯৮৯ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৭৬ তম সম্মেলনে প্রদত্ত আই. এল.ও. এর মহাপরিচালক Mr. Michael Hansenne-এর বক্তৃতা, উদ্ধৃত হয়েছে *The Bangladesh Observer,* Dhaka, November 21, 1989.

২১. সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, সত্তর -এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল "সামাজিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার অংঙ্গীকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, তৃতীয় খন্ড (ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃঃ ৫ ।

২২. দেখুন, Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law and Justice, *The Constitution of The People's Republic of Bangladesh* (As Modified upto 31st December, 1986), "Proclamation (Amendment) Order" No. 1 of 1977 (23rd April, 1977).

২৩. বিগত ১২ জুন ১৯৯১ জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট বক্তৃতায় (অনুচ্ছেদ ৬, ৫৫) বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান "ন্যায়বিচার"

www.amarboi.org

ভিত্তিক সমাজ গঠনকে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য দেখুন, *The Banglaesh Observer,* Dhaka, June 12-13, 1991। অপরদিকে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিগত ১ জুলাই ১৯৯১ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে "সামাজিক ন্যায়বিচারের" ভিত্তিতে একটি সমৃদ্ধশালী শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে বি.এন.পি. সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনরুল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার জন্য দেখুন দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২ জুলাই, ১৯৯১।

২৪. "সামাজিক ন্যায়বিচার"-কে সংজ্ঞায়িত করা এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের *Social Justice in Bangladesh (1991);* স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ (১৯৯০); এবং সদ্য প্রকাশিত, *Social Justice and Human Development* (Dhaka : Adorn Publications, 2007).

তথ্য নির্দেশ

Appleby, Paul H., 1949, *Policy and Administration,* Alabama : The University of Alabama Press.

Blau, Peter M. and Meyer, Marshall W., 1971, *Bureaucracy in Modern Society,* New York : Random House.

Curson, John J. and Harris, Joseph P., 1963, *Public Administration in Modern Society,* New York : Mc Graw-Hill Book Company Inc.

Dahl, Robert A., 1947, "The Science of Public Administration : Three Problems", in *Public Administration Review,* Vol. 7 (Winter) : 1-11.

Gouldner, A. W., *Patterns of Industrial Bureaucracy.*

Henry Nicholas, 1980, Public Administration and *Public Affairs,* Second Edition, Englewood Cliffs : 1981 Prentice-Hall Inc.

Hill, Michael J., 1972, *The Socioloy of Public Administration.* New York : Crane Russak and Company, Inc.

Irish. Marian D (ed.) 1968, *Political Science:Advance of the Discipline,* Englewood Cliffs. N.J.: Prentice- Hall Inc.

Robbins, Stephen P., 1978, The Administrative Process, New Delhi: Prentice-Hall of India Pvt Ltd.

Speight, H., 1970, Economic and Industrial Efficiency, London : Macmillan.

Thomson, V.A.,1961, "Hierarchy, Specialization and Organization Conflict" in Administrative Science Quarterly 5 (1961)

Waldo, Dwight, *The Administrative State,* New York : Ronald, 1965 and *The Study of Public Administration,* New York : Random House, 1948

1968 "Public Administration", in Irish, Marian D. (ed.), *Political Science: Advance of the* Discipline, Englewood Cliffs. N.J. : Prentice-Hall.

Weber, Max, 1964, *The Theory of Social and Economic Organizations,* translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons, New York : The Free Press.

Wilson, Woodrow, 1887, "The Study of Administration", in *Political Science Quarterly,* 2 (June).

www.amarboi.org

www.amarboi.org

উন্নয়ন প্রশাসনঃ তত্ত্ব, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা*

ক. ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে লোক-প্রশাসনের উপ-শাখা হিসাবে "উন্নয়ন প্রশাসন" (Development Administration) নামে একটি নতুন ধারণা (Concept) বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে । এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ও কারিগরী সাহায্য (বিশেষ করে, মার্কিন লোক-প্রশাসন সমিতি এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থ সাহায্য) বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে(পুঁজিবাদী ধারায় বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে) ত্বরান্বিত করার লক্ষে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কর্মক্ষমতা (Administrative capability) বৃদ্ধিই হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসন আন্দোলনের মূল কথা। এই আন্দোলন সরকারী আমলাতন্ত্রকে উন্নয়ন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অধিষ্ঠিত করে। এই আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব F.W.Riggs-এর মতে, নতুন রাষ্ট্রগুলির প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা অপর্যাপ্ত এবং তা উন্নয়নকে প্রতিহত করছে। সুতরাং উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রশাসনিক উন্নয়ন [১]। কেউ কেউ মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সাহায্য এবং 'তুলনামূলক প্রশাসন দলের' (Comparative Administration Group) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিচালিত উন্নয়ন প্রশাসন আন্দোলনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল এসকল দেশে কম্যুনিজমের অগ্রগতিকে প্রতিহত করা [২]। আলোচ্য প্রবন্ধে "উন্নয়ন প্রশাসনের" তত্ত্ব ও প্রকৃতি আলোচনাপূর্বক উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এর উপযোগিতা যাঁচাই করার প্রচেষ্টা থাকবে।

খ.উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে, প্রশাসনে উন্নয়ন বলতে প্রশাসকদের বা প্রশাসনিক সংগঠনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকে বুঝায় [৩]। কিন্তু এতে ধারণাটির পূর্ণ অর্থ প্রতিফলিত হয় না। দৃষ্টির জ্যোতিকেন্দ্র (Focus of attention) শুধু প্রশাসনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিই নয়, উন্নয়ন কর্মের প্রশাসনকেও বুঝায়। সুতরাং গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে ধারণাটির দু'টি অর্থ প্রতিফলিত হয়। প্রথমতঃ প্রশাসনের উন্নয়ন (Development of Administration)

---

*বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ। ১৩ ও ১৪ই জুলাই, ১৯৮৮,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয় Planning and Development Academy, Dhaka হতে প্রকাশিত *Development Review* তে, Vol.2, No.1.July 1989

www.amarboi.org

এবং দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নের প্রশাসন (Administration of Development)। এ যেন একই মুদ্রার দু'টি পিঠ পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। প্রথমটির অর্থে, যারা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত তাদের কর্মক্ষমতার উন্নয়ন; আর দ্বিতীয়টির অর্থে, উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারের বিভাগসমূহ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সমবায় ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালনা।

আমেরিকান বিশেষজ্ঞ George Gant ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর, *Development Administration: Concepts, Goals and Methods* শীর্ষক গ্রন্থে সর্বপ্রথম উন্নয়ন প্রশাসনের ধারাণাটিকে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন পন্ডিতবর্গ বিশেষ করে F.W.Riggs, John D. Montgomery, William Siffin, Martin London, I. Swerdlow, Milton J. Esman এবং E. W. Weidner প্রমুখ পন্ডিতবর্গ ষাটের দশকের এটিকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে ব্যাপক অবদান রাখেন। বিভিন্ন লেখক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন Edward W. Weidner. Weidner এর মতে, "উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত উন্নয়নমূলক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষসমূহের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংগঠনকে পরিচালিত করার প্রক্রিয়া" [৪]। অন্যান্য পন্ডিতবর্গের [৫] বক্তব্যেও মোটামুটি একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ সকল পন্ডিতবর্গের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে একটি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আর তা হচ্ছে, সকল বিশেষজ্ঞই উন্নয়ন প্রশাসন বলতে একটি লক্ষ্য ভিত্তিক (Goal oriented) এবং কর্মসূচীভিত্তিক (Programme oriented) প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন উন্নয়ন প্রশাসন আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা Donald C. Stones। Stones এর মতে, উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ নির্ধারনে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা এবং তা অর্জনে নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। তিনি উন্নয়ন প্রশাসনের সমন্বিত কর্মকান্ডকে চারটি 'পি' (4Ps) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এই 4Ps হচ্ছেঃ P= Policy (নীতি), P= Plan (পরিকল্পনা), P= Programme (কর্মসূচী) এবং P= Project (প্রকল্প) [৬]।

'উন্নয়ন প্রশাসন' শব্দগুচ্ছের মধ্যে উন্নয়ন শব্দটি পরিবর্তনের সাথে জড়িত। পরিবর্তন বলতে এখানে সমাজের পরিকল্পিত (কাংখিত) পরিবর্তনের কথাই বুঝানো হয়েছে। এর সাথে প্রশাসন শব্দটি যুক্ত হওয়ায় এর মূল অর্থ দাঁড়িয়েছে পরিবর্তনের প্রশাসন।

সুতরাং ঃ

উন্নয়ন + প্রশাসন=পরিবর্তন+ প্রশাসন=

পরিবর্তন প্রশাসন=পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রশাসন।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, উন্নয়ন প্রশাসন রুটিন বা ধারাগোছের তেমন

www.amarboi.org

কোন কার্যক্রম নয়। এর ভিত্তি স্বতন্ত্র, আর তা হচ্ছে, পরিবর্তনের লক্ষ অর্জন। আর এ লক্ষ অর্জনের জন্য প্রয়োজন এর কার্যদক্ষতা বা কর্মক্ষমতার উন্নয়ন। এটাই উন্নয়ন প্রশাসনের মূল সুর। জাতিসংঘের মতে, প্রশাসনিক সংগঠনের কর্মক্ষমতার উপরই সরকারী কর্মসূচীর সফলতা বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে [৭]। অতএব, উন্নয়ন প্রশাসন সনাতনী বা গতানুগতিক লোক-প্রশাসন থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। আর এই স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর কাঠামো, কার্যাবলী এবং দৃষ্টিভংগীতে। সুতরাং উন্নয়ন প্রশাসন বলতে বুঝায় একটা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো, সংগঠন এবং সাংগঠনিক ব্যবহার।

গ. উন্নয়ন প্রশাসনের প্রকৃতি : নির্বাহমূলক প্রশাসন বনাব সংগঠনমুখী প্রশাসন

উন্নয়ন প্রশাসনের উপরোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায়, সরকারের দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ইত্যাদি পর্যায় থেকে উন্নয়নমূলক অর্থাৎ পরিবর্তনকামী অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। এর অর্থ দাঁড়ায়, "নির্বাহী" (Executive) ভূমিকা থেকে "সাংগঠনিক" (Organizational) ভূমিকায় লোক-প্রশাসনের রূপান্তর [৮]। এ দু'টি অবস্থা দু'টি পৃথক আদর্শের (Model) প্রতিনিধিত্ব করে। একটি সনাতনের (Traditional) অনুসারী এবং অপরটি নতুন প্রশাসন দর্শনের (New Administrative Philosophy) অনুসারী।

নির্বাহীমূলক প্রশাসন মূলতঃ সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী নির্দেশাবলী কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত। এতে সরকারী কর্মচারী বা *সিভিল সার্ভেন্টসরা* নির্দিষ্ট লক্ষ বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নের চাইতে বরং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অধিক সচেষ্ট থাকেন। দায়িত্বগুলি সংসদীয় আইন বা নির্বাহী নির্দেশ অথবা উভয়ই হতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসকবৃন্দ কখনও কখনও পরোক্ষভাবে নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত হলেও নির্বাহীমুখী প্রশাসনের ঝোঁক হচ্ছে মূলতঃ নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের দিকে- সমাজ পরিবর্তন নয় বরং পরিবর্তন প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই এটি সংগঠিত। এর প্রধান লক্ষ হচ্ছে সামাজিক স্থায়িত্ব (Social stability) বজায় রাখা এবং সামাজিক সংকটের (Social crisis) মোকাবেলা করা। এই অবস্থায় প্রশাসকদের দৃষ্টিভংগি হচ্ছে জনগণকে শাসন করা বা জনগণের উপর প্রভুত্ব করা, জনগণকে সেবা প্রদান করা নয়। নিয়োগ পদ্ধতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে একদল ক্ষুদ্র শাসক গোষ্ঠী (Ruling elite) গড়ে তোলা হয় যাদের দৃষ্টিভংগি ও আচার-আচরণ হবে সাধারণ জনজীবন হতে ভিন্ন ধরণের। এ জাতীয় প্রশাসন মূলতঃ আইন প্রয়োগ ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজস্ব আদায় ও বিচার ব্যবস্থার মত জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কার্যাবলীতে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রশাসনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জণজীবনকে বিকশিত করা নয় বরং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে জনগণকে শাসন ও শোষণ করাই -এর উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে সারা দেশে গড়ে

www.amarboi.org

তোলা হয় একজাতীয় কর্তৃপক্ষীয় সংস্কৃতি (Almond এবং Verba -এর ভাষায়, "Subjective culture")। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শাসনে প্রধানতঃ এ ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বৃটিশ ভারতের (১৭৫৭-১৯৪৭) শাসন ব্যবস্থাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপরদিকে, সংগঠনমুখী প্রশাসন হচ্ছে কর্মসূচী ভিত্তিক। এর কার্যাবলী শুধু সরকারের আদেশ ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং উন্নয়নমূলক অর্থাৎ পরিবর্তনকামী কর্মসূচীর সংগঠন এবং এগুলির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যও তৎপর হয়। সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত কর্ম বাজেট (Performance budgeting) ও কর্ম পরিমাণ (Work measurement) এবং উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব (Cost accounting) ইত্যাদি পদ্ধতির অগ্রগতির ফলে, প্রচুর অভ্যন্তরীণ উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভবপর হচ্ছে। আর এসবের মাধ্যমে কর্মের মূল্যায়ন (Performance Evaluation) ও উৎপাদনের পরিমাণ (Production Measurement) করাও অনেকটা সহজতর হয়েছে [৯]।

উন্নয়ন প্রশাসনের এই প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও কর আদায় ইত্যাদি শুধু ততদূর পর্যন্ত গুরুত্ব বহন করে যতদূর পর্যন্ত এ সব কার্যাবলী উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সহায়ক। এখানে প্রশাসন দর্শনের পরিবর্তনে যে বিষয়টা লক্ষনীয় সেটি হচ্ছে, শুধুমাত্র সরকারী নির্দেশাবলী কার্যকর করার প্রধান ভূমিকার চাইতেও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে উন্নয়নের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার উপর। বৈশিষ্ট্যগতভাবে, উন্নয়ন প্রশাসনের এই মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে। যেহেতু এসকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন পরিকল্পিত উপায়ে অর্জন করতে হয়, সেহেতু এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদানের জন্য রাষ্ট্রকে পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। আর পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রকে তার ভূমিকা সফলভাবে পালন করতে হলে যে প্রশ্নটি এর সাথে বিশেষভাবে জড়িত সেটি হচ্ছে, কার্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কর্মক্ষমতার বিষয়টি। জাতিসংঘের দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকে সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টের মতে, "উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক কর্মদক্ষতার সুষ্ঠু মুল্যায়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করা" [১০]। সুতরাং এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির প্রধান করণীয় হচ্ছে, উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে সংগতিপূর্ণ করে জাতীয় প্রশাসনকে পূণর্গঠিত করা, প্রশাসকদের দৃষ্টিভংগি ও আচরণে পরির্বতন আনয়ন (নির্বাহী ভূমিকা থেকে সংগঠকের ভূমিকায়) এবং প্রশাসনিক কার্যসম্পাদন পদ্ধতিতে নতুন দক্ষতার সংযোজন ঘটানো।

ঘ. উন্নয়ন প্রশাসনের সমালোচনা

উপরোক্ত আলোচনায় উন্নয়ন প্রশাসনের একটি পরিবর্তনকামী কিন্তু মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) ধারণা প্রকাশ পায়। সমস্যা হচ্ছে, পরিবেশগত ব্যবধানের কারণে এই মডেল বা আদর্শ পৃথিবীর সকল দেশে সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। পুঁজির স্বল্পতা, জনসংখ্যার আধিক্য, জনগণের দারিদ্র্যতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনগ্রসরতা

www.amarboi.org

ইত্যাদির কারণে, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনের ধারণা ও গুরুত্ব পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে ভিন্নতর হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ সরকারই পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উক্ত সময়ে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমার্থক মনে করা হত। মোট জাতীয় উৎপাদনের (G.N.P.) প্রবৃদ্ধি অথবা মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রামান্যসূচক হিসেবে ধরা হত। এই প্রবৃদ্ধি মডেলের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে, চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হলেই তা স্বাভাবিকভাবে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন তথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান সূচীত করবে। এ ধরনের চিন্তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল পাশ্চাত্য পন্ডিতবর্গ এবং আন্তর্জাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য কর্মসূচীতে। এই সাহায্য কর্মসূচীগুলির বিশ্বাস ছিল যে, ধনী দেশগুলি থেকে প্রাপ্ত কারিগরি সাহায্যের সুষ্ঠ ব্যবহার ও জাতীয় উন্নয়নে লোক-প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়ক শক্তি হিসাবে, "উন্নয়ন প্রশাসন" নামে কর্মমূখী ও লক্ষভিত্তিক লোক-প্রশাসনের একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উম্মোচন করা হয়। এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে স্থানীয় এলিট ও সরকারী আমলাদের সমন্বয়ে ক্রমান্বয়ে একটি শক্তিশালী শাসক গোষ্ঠী (Ruling elite) গড়ে উঠে।

উন্নয়নের ব্যাপারে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও বিতরণের ক্ষেত্রে এর নিস্পৃহতার কারণে, ষাটের দশকের শেষে এসে সমালোচনার সম্মুখীন হতে থাকে। যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে তা হল, উন্নয়নের সুফল কিভাবে বিতরণ করা হচ্ছে? উন্নয়নের ফলে কারা লাভবান হচ্ছে? সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী গরীব। তারা কি তাদের সংখ্যার অনুপাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারছে? এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের পারিবারিক আয়ের উপর গৃহীত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে, উপরের স্তরের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের হাতে দেশের অধিকাংশ আয় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে [১১]। অপরদিকে, নীচের স্তরের শতকরা ৪০ভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের যে অংশ লাভ করছে, তা তাদের শতকরা সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। উপরন্তু, এসকল দেশের পারিবারিক আয়ের শতকরা হার পরিবর্তনের গতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, উপরের স্তরের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের আয় বৃদ্ধি হয়েছে নীচের স্তরের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবারকে শোষণের বিনিময়ে [১২]। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ বছর আগে এই দরিদ্র শ্রেণীর ভাগ্যে যা জুটত, এখন তারা পাচ্ছে তার চাইতেও কম [১৩]! অবাক হবার বিষয় হচ্ছে, এ সব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক অদক্ষতা বা উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য নয়, বরং তার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাহলে গলদটা কোথায়? এর প্রধান কারণ হচ্ছে, উন্নয়নের ধারণার পাশ্চাত্যমুখীতা। প্রাচ্যের দেশসমূহে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই হচেছ গরিব। এখানে গরীবের অর্থাৎ অধিকাংশ

www.amarboi.org

জনগোষ্ঠীর কল্যাণ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ বলে বিবেচিত হয়নি। জনগণ এখানে উপেক্ষিত। উন্নয়ন সিদ্ধান্তেও তারা অনুপস্থিত। সকল কর্মসূচীগুলি আমলাতান্ত্রিকভাবে ধারণাকৃত, আমলাতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়িত এবং আমলাতান্ত্রিকভাবে মূল্যায়িত। জনগণ পড়ে আছে শুধু সুফলের প্রাপ্ত বিন্দুতে (Receiving end)। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী করে উন্নয়ন ও প্রশাসনের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। নিম্নের অনুচ্ছেদে উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে এ দু'টি ধারণার যথাযথ (Appropriate) ও কার্যকর (Operational) সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

ঙ. উন্নয়ন প্রশাসন ঃ উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে

উন্নয়নের বহুবিধ সংজ্ঞা আছে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্যও রয়েছে। কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। অন্যদের মতে, এটা বস্তুর প্রবৃদ্ধি। আবার কেউ কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে একই সাথে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন হচ্ছে "সমাজ ব্যবস্থায় অনুন্নত অবস্থা সৃষ্টিকারী বহু সংখ্যক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ" [১৪]। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু সংখ্যক দেশে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অংশ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও রোগে জর্জরিত। এগুলি হচ্ছে সেসব দেশের জন্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যা থেকে তারা পরিত্রাণ লাভে সদা সচেষ্টা। তাই উন্নয়ন বলতে শুধু বস্তুর প্রবৃদ্ধি অথবা মুষ্টিমেয় লোকের উপকার বুঝায় না, বরং এটা হচ্ছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে একটা বহনীয় প্রক্রিয়া [১৫]। জনগণই এখানে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল জ্যোতিকেন্দ্র (Focus)। প্রশাসন বলতে আলোচ্য প্রবন্ধে লোক-প্রশাসনকেই বুঝান হয়েছে। আধুনিক ব্যবহারে ইংরেজীতে পাবলিক বা বাংলায় লোক শব্দকে সরকার অর্থে ব্যবহার করা হয় যেমন, সরকারী কর্ম কমিশন (Public Service Commission)। সুতরাং লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সংগঠন, কাঠামো, কার্যাবলী ও নিয়ম-নীতির সমন্বিত রূপ [১৬]। এই কাঠামোতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন, সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য মানুষ ও সম্পদের সংগঠন ও নেতৃত্বদান এবং মূল্যায়ন কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত [১৭]। কিন্তু এখানে মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কর্মকান্ড কাদের জন্য নিবেদিত ?

উপরের আলোচনায় উন্নয়নের লক্ষ বলে ধরা হয়েছে জনগণ অর্থাৎ সাধারণ লোকের জীবনের মান উন্নয়ন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা অর্থবহ হবে তখনই যখন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই অর্থে লোক-প্রশাসন হচ্ছে লোকের জন্য লোকের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা হচ্ছে, 'জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া'।

www.amarboi.org

চ. উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে পাশ্চাত্য পন্ডিতবর্গ ও কারিগরি সাহায্য কর্মসূচীর সহায়তায় লোক-প্রশাসনের উপ-শাখা হিসাবে উন্নয়ন প্রশাসন নামে একটি নতুন ধারণা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীনতার পর এ সব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিই হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসন আন্দোলনের মূল কথা। কিন্তু উন্নয়নের ধারণার পাশ্চাত্যমুখীতা এবং লোক-প্রশাসনে লোকের অংশগ্রহনের অভাবের কারণে, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়নের সুফল অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর দুয়ারে পৌঁছছেনা । এসব দেশে অব্যাহতভাবে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে-- গরীব আরও গরীব হচ্ছে এবং ধনী ও গরীবের ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরিণতিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন প্রশাসনের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উন্নয়ন বলতে জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অথবা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ হতে শুরু করে, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সর্বত্র জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ [১৮]। এই প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া।

তথ্যসূত্র

১. Brian Loveman, "The Comparative Administration Group, Development Administration and Anti-Development", in *Public Administration Review* 36 (November-December 1976), p.617; F.W.Riggs, "The Context of Development Administration", in Riggs (ed.), *Frontiers of Development Administration* (Durham, N.C : Duke University Press, 1971), p.75.

২. দেখুন, Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs,* Second Edition(Englewood Cliffs,New Jersy: Prentice-Hall Inc.,1980),p.41-42;Prabhat Datta, "Development Administration: New Agenda", in *Administrative Change*, Vol. XX 111, No.2, January-December, 2001.

৩. Radha Krishnan Sapru, "Development Administration : An Approach to Administrative Capability for Development", in *Administrative Science, Review 9* (September 1979), p. 43.

৪. Edward W. Weidner, "Development Administration : A New Focus for Research", in Farrel Heady and Sybil Stokes (eds.), *Papers in Comparative Public Administration* (n.a: University of Michigan Press, 1962),p.98; Edward W. Weidner, "The Elements of Development Administration", in weidnen (ed), *Development Adminstration in Asia* (Durham, N. C. ; Duke University Press, 1970), p.24.

www.amarboi.org

৫. George Gant, Merle Fainsod, Fred W. Riggs, William Siffin, John D. Montgomery, Martin London, Ralph Smucklers, John Kotlen and Donald Stone, Jose V. Abueve, Hahen Been Lee, J.N. Khusla, B.S. Khanna, Nguyen-Duy and Shon-Sheng Hsuch, I . Swerdlow, J. Lapalambara and Milton J.Esman প্রমুখ ।

৬. Donald C. Stones, *Introduction to Education of Development Administration* (Brussell: n.a.:1966).

৭. United Nations, "Development Administration : Current Approaches and Trends", in *Public Administration for National Development*, Sales N.OE. 76.II,H.1,p.32,

৮. V. A. Pai Panandiker, "Development Adminaistration : An Approach", in *Indian Journal of Public Administration* 10 (January-March 1964), p.36.

৯. সরকারী ব্যবস্থায় উৎপাদন পরিমাপের ব্যাপারে ভাল আলোচনার জন্য দেখুন, John W. Kendrick, "Exploring Productivity Measurement in Government", in *Public Administration Review*, Vol.23, No.2.pp.59-66 ; Norman Uphoff, "An Analytical Mode of Process and Performance for Developing Indicators of Administrative Capability", in *Philippine Journal of Public Administration* 17 (June 1973), pp. 372-379.

১০. United Nations, *Public Administration in the Second United Nations Development Decade : Report of the Second Meeting of Experts, Sale*, No.F.71,11 H.3, January 1971, pp. 16-26.

১১. Doh Joon-Chien, *Eastern Intellectuals and Western Solution : Follower Syndrome in Asia* (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1980), Table 4, p.26.

১২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুন নূর "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১৬ মে ১৯৮৫, ছক নং-২, পৃঃ ১১১ ।

১৩. Mahbub-ul-Hoq, "The Crisis in Development Strategies", in Charles K. Wilber (ed.), *Political Economy of Development and Underdevelopment* (New York : Random House, 1993), p.367.

১৪. Gunner Myrdal, *Asian Drama : An Inquiry into the Poverty of Nations*, Abridged (London : Allen Lane Penguine Press, 1972), p.50.

১৫. Ann Mattis (ed.), *A Society for International Development : Perspectives 1984* (Durham : Duke University Press, 1983), P. xiii.

১৬. এখানে লোক-প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন উভয় শব্দগুচ্ছকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ।

১৭. Robbins প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে প্রধানতঃ চারটি কর্মকান্ডের মধ্যে বর্ণনা করেছেন । এই চারটি হচ্ছে ঃ (১) পরিকল্পনা প্রণয়ন; (২) সংগঠিতকরণ (৩) নেতৃত্বদান; ও (৪) নিয়ন্ত্রন বা মূল্যায়ন; দেখুন, Stephen P. Robbins, *The Administrative Process* (New Delhi : Prentice Hall of India Pvt. Ltd., 1978), pp.15-20.

১৮. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুন নূর, "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ১৬ মে ১৯৮৫, পৃঃ ১২০-১২৩ ।

www.amarboi.org

প্রশাসনিক সংস্কারে 'নব লোক-ব্যবস্থাপনা' নীতি*

ভূমিকা

অধ্যয়ন শাস্ত্র হিসাবে লোক-প্রশাসন আজ নতুন কোন পাঠ্য বিষয় নয় । যদিও এর প্রায়োগিক দিকটা অনেক পুরোনো দিনের, তবে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের চাইতে লোক-প্রশাসন নতুন হলেও সময়ের বিবর্তনে আজ তা অনেক পরিপক্ক ও সমৃদ্ধ। এই পূর্ণতা এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের সৃষ্টি এবং প্রয়োগের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, ষাটের দশকে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতা নিরসনে গতানুগতিক লোক-প্রশাসনের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে উদ্ভাবিত "নব লোক-প্রশাসন" (New Public Administration) আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এভাবে একের পর এক সৃষ্ট মতবাদ লোক-প্রশাসনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে। অনুরূপভাবে, নব্বইয়ের দশকে সৃষ্ট লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে নতুন মতবাদ "নব লোক-ব্যবস্থাপনা" (New Public Management or NPM) নিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। বিশেষ করে প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী হিসাবে এই মতবাদ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে কিছুটা কার্যকর হলেও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ উপযোগীতা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও মতদ্বৈততা রয়েছে। সে যাই হোক, লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে "নব লোক-ব্যবস্থাপনা" এক নতুন চিন্তাধারা সংযোজন ঘটিয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে নব লোক-ব্যবস্থাপনা কি এবং এর মৌলিক বৈশিষ্টাবলী চিহ্নিতকরণপূর্বক উন্নয়নশীল দেশের প্রশাসনিক সংস্কারে এর প্রয়োগ উপযোগিতা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা রয়েছে।

নব লোক-ব্যবস্থাপনা কি?

নব লোক-ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি, সারা বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এটি একটি সার্বজনীন প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী। কিন্তু বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে এটির ধরণ বিভিন্ন রকমের। এমনকি লোক-প্রশাসন গবেষক সমাজেও মতৈক্য নেই যে, নব লোক-ব্যবস্থাপনা আসলে কি ধরনের *প্যারাডাইম* বা অভ্যাগম। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ কর্মসূচীর উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ নতুন নয়। এজন্য অনেকে একে "পুরোনো বোতলে নতুন মদ" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন [১]। নব লোক-ব্যবস্থাপনাকে একেকজন প্রশাসন বিজ্ঞানী

---

* সৌজন্যে : নিবন্ধটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লোক-প্রশাসন বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোহম্মদ শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে যৌথভাবে লিখিত।

www.amarboi.org

একেকনামে অভিহিত করেছেন যেমন, *Managerialism* (Christopher Pollit, ১৯৯০) ; *New Public Management* (Christopher Hood, ১৯৯১) ; *Market Based Public Administration* (Lan Rosenbloom, ১৯৯২) এবং *Enterpreneurial Government* (David Osborne and Ted Gaeblar, ১৯৯২) ইত্যাদি । প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে সরকারের সকল পর্যায়ে "3Es" অর্থাৎ Economy (ব্যয় সংকোচ), Efficiency (দক্ষতা) ও Effectiveness (কার্যকারিতা) নিশ্চিতকরণের জন্য এক দৃঢ় উদ্যোগ। এমনকি, জাতিসংঘ সচিবালয়ে 'প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা' বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'ব্যবস্থাপনা বিভাগ' রাখা হয়েছে এবং 'কর্মচারী ব্যবস্থাপনা' অফিস হয়েছে 'মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা' অফিস। নব লোক-ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আমরা পরিচিত ছিলাম নব লোক-প্রশাসনের সাথে। দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে। সহজ কথায় বলতে গেলে, নব লোক-ব্যবস্থাপনা হচ্ছে লোক-প্রশাসনে গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও কার্যবিধিতে পরিবর্তন এনে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের আদলে ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করা। তবে এর সাথে আরো বেশ কয়েকটি উপাদান জড়িত। মূলত: সরকারী সেবার বাজারজাতকরণে বেসরকারী সেবা দাতাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য লোক- প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্ববিবেচনা ক্ষমতার প্রয়োগ এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত একটি প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচীর নাম হচ্ছে, "নব লোক-ব্যবস্থাপনা"। গতানুগতিক লোক-প্রশাসনে কিন্তু উপরিউক্ত কৌশলগুলো অনুপস্থিত। বেসরকারী প্রশাসন তথা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র থেকে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে। মোট কথা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাসমূহ বাজারজাতকরণের কৌশলগুলো লোক-প্রশাসনে প্রয়োগ করা হচ্ছে নব লোক-ব্যবস্থাপনা।

আবার নব লোক-ব্যবস্থাপনা-কে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, 'নব লোক-ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে কতগুলো ধারণা ও পদ্ধতির সমষ্টি যাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে লোক-প্রশাসনে দক্ষতা ও জবাবদিহিতাকে একীভূত করা'। মূলত: এক্ষেত্রে দক্ষতা নিশ্চিত করা হয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রযুক্তিগত স্তরে বিকেন্দ্রীভূত করে । এতে করে ব্যাপকহারে সমাজের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, "ধারণা" ও "পদ্ধতি" সমূহের কোন একীভূত সংজ্ঞা নেই। তবে ধারণা করা হয় যে, NPM ব্যাপকহারে জনগণের কাছে সেবা এবং সমাজের কাছে জবাবদিহিতা --এই দুই কাজের প্রতিনিধিত্ব করে [২]।

Osborne & Gaebler-এর *Reinventing Government* বইটি ছাড়া নব লোক-ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। তারা নব লোক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "a revolt against values of traditional bureaucracy and a belief

www.amarboi.org

that the public sector can be transformed by the power of leadership, the introduction of market mechanisms, a focus on results and decentralizing power" [৩]।

Guy Peters নব লোক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেন, "an admonition to replace traditional forms of hierarchical management, and traditional civil service pay and grading systems, with a significantly greater use of personal contracts of managing public employees. Rather than being components of a collective civil service, public employees increasingly are characterized, and treated, as individual contractors with the terms and conditions of their employment negotiated on a person by person basis [৪]। ১৯৯৬ সালে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত "New Public Management: Lean State, Lean Government" শীর্ষক সম্মেলনে বক্তারা নব লোক-ব্যবস্থাপনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "a management culture that emphasises the centrality of customer as well as accountability for results".

উপরিউক্ত সংজ্ঞা সমূহের আলোকে বলা যায়, নব লোক-ব্যবস্থাপনা হচ্ছে মূলতঃ এক ধরণের প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী যার কোন সার্বজনীনতা নেই এবং বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রূপ নিয়ে পরিচালিত হলেও এটি সরকারী প্রশাসনে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রয়োগ, সরকারী সেবার মান উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ, জবাবদিহিতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি ইত্যাদি সাধারণ সংস্কার কর্মসূচীর প্রতিনিধিত্ব করে।

নব লোক -ব্যবস্থাপনার উপাদান

নব লোক-ব্যবস্থাপনায় কোন নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে নির্দিষ্ট কোন উপাদান নেই। এটির সার্বজনীন কোন রূপও নেই। বিভিন্ন প্রশাসনিক চিন্তাবিদ্ কতগুলো মৌলিক সংস্কার কর্মসূচীকে সামনে রেখে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নব লোক-ব্যবস্থাপনাকে চিত্রায়িত করেছেন। যে সকল প্রশাসন চিন্তাবিদ্ এক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন তাদের মধ্যে Christoper Hood (1996), Klaus Konig (1996), Kes Metcafle and Sue Richards(1990), David Osborne and Ted Gaebler (1992) I. Christopher Pollitt (1993)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Pollitt ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত, *Managerialism and Public Services* নামক বইতে নব লোক- ব্যবস্থাপনার উপাদান হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বর্ণনা করেছে [৫]:

= Marketizing of Public Services;
= Corporatization of public organizations;
= Privatization of public services;
= Managerization of internal control systems of administrative

www.amarboi.org

apparatus through decentralization and transition from the follow-up of input to the follow–up of output;

= Manageriazation of public personnel policy through decentralization and transition to personal responsibility for results;

= Manageriazation of public service system through decentralization of responsibility to service units specialized in service systems;

= Commercializing the services and putting emphasis on service thinking;

= Managerization of Public Management.

Pollitt পুনর্বার ১৯৯৫ সালে নব লোক-ব্যবস্থাপনার উপাদান হিসাবে নিচের বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছেন [৬] :

= Cost cutting, capping budgets and seeking greater transparency in resource allocation;

= Disaggregating traditional bureaucratic organizations into separate agencies;

= Separating purchaser and provider i.e. the functions of producing public services from those of purchasing them;

= Introducing market and quasi-market type mechanisms;

= Decentralization of management authority within public agencies (flatter hierarchies);

= Introducing performance management staff required to work to performance targets, indicators and output objectives;

= New personnel policies which shift the basis of public management from permanency and standard national pay conditions towards term contracts, performance related pay(PRP) and local determination of pay and conditions ; and

= Increasing emphasis on service quality through standard setting and new focus on "customer responsiveness".

অপরদিকে Christopher Hood ১৯৯১ সালে প্রকাশিত, "A Public Management for all seasons" নামক প্রবন্ধে নব লোক-ব্যবস্থাপনার উপাদান হিসাবে যে সাতটি বিষয়কে তুলে ধরেছিলেন তা হল [৭] : -

= 'Hands-on professional management' in the public sector;

www.amarboi.org

= Explicit standards and measures of performance;
= Greater emphasis on output controls;
= Shift to disaggregation of units in the public sector;
= Shift to greater competition in public sector;
= Stress on private sector styles of management practice;
= Stress on greater discipline and parsimony in resource use.

বিভিন্ন প্রশাসনিক চিন্তাবিদ্‌দের আলোচনা থেকে নব লোক-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উঠে আসলেও যে সকল মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করে নব লোক-ব্যবস্থাপনা আন্দোলন পরিচালিত, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নিম্নে দেওয়া হল :

ক) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেসরকারী পর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া : প্রথম কথা হচ্ছে, সরকারী সেবাদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে একদিকে খরচ যেমন কমবে, তেমনি সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা ফিরে আসবে। উপরন্তু, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে সরকারী সেবার মানও বৃদ্ধি পাবে।

খ) কেন্দ্রীভূত প্রশাসন হতে বের হয়ে আসতে হবে : নব লোক-ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূল বক্তব্য হচ্ছে, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সরকারী প্রশাসনকে যথাসম্ভব জনগণের দোর গোঁড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এতে জনগণ সহজে সেবা পাবে। যে প্রশাসন অধিক কেন্দ্রীভূত, তা অদক্ষ ও দুর্নীতিযুক্ত। সুতরাং গতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের জন্য লোক-প্রশাসনকে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

গ) দক্ষতাই হবে মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাটি : নব লোক-ব্যবস্থাপনায় কর্মীরা দক্ষতা ও কার্যকারিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত হবে। প্রশাসনের লক্ষ নির্ধারিত থাকবে। সংশ্লিষ্ট লক্ষ অর্জনে সক্ষম কর্মীরাই পুরস্কৃত হবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মী সেবা প্রদানে কি ভূমিকা রাখছেন তাই হবে বিবেচ্য বিষয়।

ঘ) অতিরিক্ত জনবল হ্রাস ও স্থায়ী আমলাতন্ত্রের অবসান : নব লোক-ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের সংস্কার কর্মসূচী প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকে উৎসাহিত করে। এটি প্রশাসনের জনবলকে যথাসম্ভব ছোট রাখার উপদেশ দেয়।

ঙ) গ্রাহক সন্তুষ্টি : সরকারী সেবা বিতরনের ক্ষেত্রে এর গ্রাহক তথা সাধারণ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের উপর জোর দেয় নব লোক-ব্যবস্থাপনা।

চ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ : নব লোক-ব্যবস্থাপনা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে।

ছ) ইনপুটের চাইতে আউটপুটের উপর গুরুত্বারোপ : নব লোক-ব্যবস্থাপনায় ইনপুট ও সাংগঠনিক নিয়ম-কানুনের চাইতে আউটপুট তথা ফলাফলের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়।

www.amarboi.org

জ) খরচ নিয়ন্ত্রণ ও বাজার পরীক্ষা : নব লোক-ব্যবস্থাপনায় সরকারী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব খরচ কমানো এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো হয়। সরকারী সেবাকে সবসময় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যাচাই করতে হবে।

নব লোক-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্ব নয়। Osamu Koike -এর মতে, এটি একটি "সালাদের বাটির" মতো যেখানে প্রশাসনিক সংস্কারের বিভিন্ন উপাদান একীভূত হয়েছে [৮]। নব লোক-ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলোকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দু'ধরনের সংস্কার কর্মসূচীর নব লোক-ব্যবস্থাপনায় একীভূত হওয়াকে Christopher Hood, "A marriage of opposites" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে, নব লোক-ব্যবস্হাপনা চেষ্টা করে সরকারী কাঠামোকে পরিবর্তন করতে। বিশেষ করে কেন্দ্রীভূত এবং পদসোপানভিত্তিক আমলাতন্ত্রকে বিকেন্দ্রীভূত করে বিভিন্ন ছোট ছোট এককে পরিণত করা, যেগুলো হবে গ্রাহক কেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে যে সকল কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেগুলো হচ্ছে, বাজার পরীক্ষা, চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ, নীতি নির্ধারণী এককে ছোট ছোট এককে পরিণত করা, সংস্থা সমূহের কার্য মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। Koike এর মতে, এধরনের কৌশলগুলি আনা হয়েছে মূলতঃ "Neo classical economics" ও "New institutional economics" এর কাছ হতে ।

পরবর্তীভাগের সংস্কার কর্মসূচীসমূহ সরকারী খাতের সাংগঠনিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো সনাতনী ওয়েবারীয়ান আমলাতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এধরনের কর্মসূচীগুলো এসেছে আশির দশক থেকে ব্যবসা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো থেকে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে *টিকিউএমটোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজম্যান্ট*, সরল রৈখিক সংগঠন, কার্যসূচী মূল্যায়ন, কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পুরস্কারের ব্যবস্থা এবং এমবিও বা *ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেকটিভস্* ইত্যাদি।

নব লোক-ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি

লোক-প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগমালার উপর দাঁড়িয়ে আছে নব লোক-ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। সনাতনী আমলাতন্ত্রের জটিল পদসোপান, নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো এবং উপর-নিচ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি ক্রমশ আমলাতন্ত্রকে সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়।

আশির দশক থেকে বিগত দুই দশক ধরে সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, কর্মী এবং লোক-প্রশাসন চিন্তাবিদ্দের মধ্যে একটি উপলব্ধি হচ্ছিল যে, সরকারী আমলাতন্ত্রের দূর্বলতা অনেক। শিল্পোন্নত ইউরোপ ও আমেরিকা হতে শুরু করে পরবর্তীতে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে দেখা যায় যে, আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য সবসময় লোক প্রশাসনের সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারে না বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার উৎস হিসাবে প্রতীয়মাণ হয়। এছাড়াও জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের বিকাশের সাথে সাথে, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের কার্যপরিধিও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমলাতন্ত্রের 'আত্ম কেন্দ্রিকতা' ও বাজেট সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সৃষ্টির কারণে, সরকারী প্রশাসনে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও কার্যকারিতা আনয়নের লক্ষে

www.amarboi.org

আশির দশকে বিভিন্ন কমনওয়েলথ ও OECD রাষ্ট্রসমূহে নব লোক-ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটে [৯]। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নব লোক-ব্যবস্থাপনার বিশ্লেষণী ভিত্তি ও যৌক্তিক কাঠামোর উৎপত্তি আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু এটির বাস্তবিক প্রয়োগ তার চেয়েও বেশী দেখা গিয়েছে যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে।

মূলত: সনাতনী লোক-প্রশাসনের কতগুলি সমস্যা থেকেই নব লোক-ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি। এ ধরণের কতগুলো সমস্যার কথা উঠে এসেছে, "New Public Management: Lean state, lean Government" শিরোনামে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে আসা ১৭ টি দেশের ২২ জন অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য থেকে। তাদের বক্তব্য থেকে সনাতনী লোক-প্রশাসনের যে সকল সমস্যাবলী বেরিয়ে এসেছে তা হলো [১০]:

ক. লোক-প্রশাসনের সেবা খুবই ধীর গতির এবং ব্যয়বহুল;

খ. সরকারী সেবার মান খুবই নিম্নমানের;

গ. জনগণের পছন্দ বা ইচ্ছা অনুযায়ী সেবাসমূহকে শ্রেণীবিভাগ করতে লোক-প্রশাসন অক্ষম;

ঘ. সরকারী প্রশাসন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত; এবং

ঙ. সরকারী প্রশাসন অদক্ষ ও অকার্যকর এবং এটি অর্থ ও মানব সম্পদের অপচয় করছে।

উপরিউক্ত সমস্যাবলীর সমাধানে নব লোক-ব্যবস্থাপনার উদ্ভব উন্নত দেশসমূহে। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যে মার্গারেট থ্যাচার সরকারের আমলে বেশ কিছু প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয় যা "ব্যবস্থাপনাবাদ" নামে পরিচিত ছিল। পরে যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মত দেশসমূহে বেসরকারীকরণ, সরকারী সেবার বাজার যাঁচাই, প্রশাসনে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ, বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রাহক কেন্দ্রীক মনোনিবেশ ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করা হয় সনাতনী লোক প্রশাসনের সমস্যাবলী দূর করার জন্য। পরবর্তীতে এসব কৌশলগুলো "নব লোক-ব্যবস্থাপনা" নামে ব্যাপকভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

উন্নত দেশসমূহে নব লোক-ব্যবস্থাপনা

নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী মূলত: উৎপত্তি ঘটেছে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশসমূহে। আশির দশকের শেষের দিকে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনার আদলে প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৭৯ সালে গ্রেট বৃটেনে মার্গারেট থ্যাচার সরকার প্রশাসনে জনবল হ্রাস ও স্বল্প খরচে সরকারী সেবা জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য বেশ কয়েকটি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এগুলো সম্মিলিতভাবে "ব্যবস্থাপনাবাদ" নামে পরিচিত ছিল। ব্যবস্থাপনাবাদ হচ্ছে নব লোক-ব্যবস্থাপনার আরেকটি নাম। ১৯৯০ সালে ক্লিনটন প্রশাসনও আমেরিকায় নব লোক-ব্যবস্থাপনার আদলে প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন উন্নত দেশের নব লোক-ব্যবস্থাপনা ধরনের সংস্কার কর্মসূচীর একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

www.amarboi.org

বিভিন্ন দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও প্রভাব বিস্তারকারী তত্ত্বসমূহ

উন্নয়নশীল দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনা

দেশ	নব লোক -ব্যবস্থাপনা সংস্কার-এর ধরন এবং বছর	প্রভাব বিস্তারকারী তত্ত্বসমূহ
যুক্তরাজ্য	Rayner Scrutinies (1979); Financial Management Improvement (1982 CMND 9058, 1983); Improving Management in Government: the Next Steps (Efficiency Unit 1988); Modernizing Government (1998)	Managerialism (Pollitt, Kemp, Hood)
অস্ট্রেলিয়া	Royal Commission on Australian Government Administration (1976); The Reid Report (1983); Reforming the Australian Public Service (1983); FMIP(1984); Budget Reform(1984); The Australian Public Sector Reformed (1992); Beyond Bean-Counting: Effective Financial Management in the APS 1998 & Beyond (1997); Clarifying the Exchange: A Review of Purchaser/Provider Arrangements: National Commission of Audit (1996)	Managerialism (Keating, Hood, Corbett) New Institutional Economics- Contractualism, Contestability
নিউজিল্যান্ড	Economic Management (1984); Statement of Government Expenditure Review (1986); Government Management: Brief to the Incoming Government (1987)	New Institutional Economics- esp. Public Choice Theory
যুক্তরাষ্ট্র	President's Private Sector Survey on Cost Control (Grace Committee 1982); Reinventing Government (1992): National Performance Review (1993)	Managerialism (Pollitt, Thompson, Fredrickson)
কানাডা	Auditor General's Report on Financial Management (1978); Royal Commission on Financial Management and Accountability –The Lambert Report (1979); Increased Ministerial Authority & Accountability (1988); Public Service 2000 (1992); Getting Government Right (1995); Toward Better Governance: Public Service Reform in New Zealand (1984-94) and its Relevance to Canada(Auditor General 1995)	Managerialism (Aucoin, Peter and Savoie) New Institutional Economics

উৎস: Joanna Kelly and John Wanna, "New Public Management and Politics of Government Budgeting," in *International Public Management*, 2000:39.

www.amarboi.org

উন্নয়নশীল দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনা

উন্নয়নশীল দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ নিয়ে সারাবিশ্বে প্রশাসন বিজ্ঞানীদের মাঝে অনেক বিতর্ক রয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের লোক-প্রশাসনের অদক্ষতা ও সীমাহীন দুর্নীতি এ ধারণাকে আরো সুদৃঢ় করে। তবে এ কথা ঠিক যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নব লোক-ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার পাশাপাশি বেশ কিছু সফলতাও রয়েছে।

ইতোমধ্যে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তবে তারা পুরো সংস্কার প্যাকেজটিকে গ্রহণ করেনি এবং সাথে সাথে তারা এমন কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে যেগুলো নব লোক-ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী হিসাবে মালয়েশিয়ার "Total Quality Management", উগান্ডার "Result-Oriented Management Initiative" কিংবা চিলির শিক্ষা খাতে "Wholesale Restructuring"-এর কথা বেশ উলেখযোগ্য [১১]। ফিলিপাইনও নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসুচী গ্রহণ করেছে। তবে সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নব লোক-ব্যবস্থাপনার মূলনীতিসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায়নি আমলাতন্ত্রের কারণে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের অভাবের কারণে, প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচীর পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি। তবে ১৯৮৬ সালে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার ফলে, বেশ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৯১ সালের "Local Government Code" -এর কথা উলেখ করা যায়। এটি মূলতঃ ফিলিপাইনের শাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার প্রত্যর্পণ এবং জন অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয়েছে। এর বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে, Devolution, Deconcentration, Privatization এবং Participation [১২]।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলো নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করার পূর্বে, এর দু'টি উপাদানের সাথে বেশ পরিচিত ছিল। সেগুলো হচ্ছে, "বেসরকারীকরণ" এবং "সরকারী জনবল হ্রাস"। আশির দশকে বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ-এর "কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী"র উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল উপরোক্ত সংস্কার উপাদান। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেরই এ ধরনের সংস্কার কর্মসূচীর পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনা যে একবারে নতুন, তা বলা যাবে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলো নব লোক-ব্যবস্থাপনার আরো একটি উপাদান বাস্তবায়নে বেশ এগিয়ে আছে। তা হলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে কর্পোরেশনে পরিণত করে একীভূত সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে তাদের মডেল হচ্ছে যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ড। যেমন তারা শুল্ক ও আয়কর বিভাগকে একীভূত করে জাতীয় রাজস্ব কর্তৃপক্ষে রূপান্তরিত করেছে। ঘানা, কেনিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা এবং পাকিস্থানে এ ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। অন্যদিকে, বলিভিয়ায় "জরুরী সামাজিক

www.amarboi.org

তহবিল" স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল ভূমিকা রাখছে।

নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করতে আরো বেশ কিছু দেশ আগ্রহী। প্রশাসন বিজ্ঞানীরা অবশ্য উন্নত দেশের দেখা দেখি পুরো প্যাকেজটিকে গ্রহণ না করে, সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা সঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব, তা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাংলাদেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনা

অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশও নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে আগ্রহী। বিভিন্ন "জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন" -এর রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশমালার সাথে নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচীর মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত "জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন" ২০০০ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করেছে, তাতে বর্ণিত সুপারিশমালার অনেকগুলোই নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচীর সাথে মিল রয়েছে [১৩]। এ কমিশন গঠনে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "... to ensure good governance", অর্থ্যাৎ সুশাসন নিশ্চিত করা। কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে, "একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে গঠিত এ কমিশন উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, সারা বিশ্ব এখন এক নতুন লোক-প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারপ্রান্তে। Performance based and result oriented administration with outscoring and contracting out wherever possible and upholding citizen's rights for better and cheaper service", অর্থ্যাৎ এমন একটি প্রশাসন যার ভিত্তি হবে কর্মকুশলতা ও ফলদায়ক ব্যবস্থাপনা যেখানে সরকারে বাইরে থেকেও সহযোগিতা সংগ্রহ এবং যেখানে সম্ভব বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক কর্ম সম্পদন যা নাগরিক অধিকার সমুন্নত রেখে অধিকতর ভালো ও কম খরচে সেবা প্রদান করতে পারে। এখানে লক্ষণীয় যে, লোক-প্রশাসনে কতগুলি নতুন মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: 'জনগণের অধিকার সবার উপর স্থান পাবে' এবং 'সম্ভাব্য সেবা সুলভে এবং একই সাথে সস্তা হতে হবে'। তবে তার আগেও সমসাময়িক সময়ে বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও বিশ্বব্যাংক তাদের উন্নয়ন সহযোগিতার পূর্বশর্ত হিসাবে যেসব সংস্কার কর্মসূচীর শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, তাদের কতগুলোর সাথে এর মিল ছিল। আশির দশকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী বা ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত *Government That works* নামক বইতে বর্ণিত "প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারভিত্তিক জন প্রশাসন ব্যবস্থা" গড়ে তোলার জন্য আহ্বানের কথা উল্লেখ করা যায়। ২০০০ সালের "জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন"-এর রিপোর্টে বর্ণিত যে যে সুপারিশমালার সাথে নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচীর মিল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে [১৪];

ক) সরকারী সেবার মান বাড়ানো;

খ) সিভিল সার্ভিসের সংস্কার সাধন;

www.amarboi.org

গ) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পূনর্বিন্যাস ও জনবল কমানো;
ঘ) লোক- প্রশাসনে অপচয় হ্রাস করা;
ঙ) লোক- প্রশাসনে উপর সংসদীয় তদারকী আরো বাড়ানো;
চ) দুর্নীতি রোধ করা; এবং
ছ) বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ানো।

তবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, নব লোক-ব্যবস্থাপনার আদলে উপরোক্ত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন খুব একটা সহজ নয়। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন:

ক) বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রশাসনিক সংস্কার বা প্রশাসনকে আধুনিকায়নের প্রতিশ্রুতি রাখে না বা রাখতে পারে না;
খ) প্রশাসনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ;
গ) নব লোক ব্যবস্থাপনার মতো উচ্চবিলাসী সংস্কার কর্মসূচী চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা ও কাঠামোর অনুপস্থিতি;
ঘ) সুশাসনের ন্যূনতম উপাদান পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি, যেমন আইনের শাসন ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ইত্যাদি; এবং
ঙ) ব্যাপকহারে প্রশাসনিক দুর্নীতি।

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের আগে বাংলাদেশের মতো দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনার মতো সংস্কার কর্মসূচী কোন সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না।

নব লোক-ব্যবস্থাপনার সমালোচনা

উন্নত দেশগুলোতে নব লোক-ব্যবস্থাপনা বেশ সাফল্য পেলেও বিভিন্ন কারণে এধরনের প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী সমালোচনার সন্মুখীন হয়েছে। বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে এর সফলতা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সমালোচকদের দৃষ্টিতে নব লোক-ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

ক) নব লোক-ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয়েছে এই বলে যে, এটি মনে হয় "জনসেবার" 'জন' কথাটিকেই হঠাতে এসেছে তার অর্থনৈতিক যুক্তিযুক্ততার মাধ্যমে। বিশেষ করে, "শিক্ষা" ও "স্বাস্থ্যসেবার" মতো খাতগুলোতে নব লোক-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের কারণে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ দু'টি খাতকে সরকার লাভ-ক্ষতির পরিমাপে বিচার করতে পারে না।

খ) অনেক সমালোচনাকারীর মতে, নব লোক-ব্যবস্থাপনা মোটেই নতুন কিছু নয়। এটি মূলতঃ "টেইলরবাদ" -এর আরেকটি সংস্করণ মাত্র।

গ) উন্নয়নশীল সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি হতে ভিন্ন। এই ভিন্ন প্রত্যাশা ও ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত নব লোক-ব্যবস্থাপনা মডেলের প্রয়োগ উপযোগিতা প্রশ্নাতীত নয়।

www.amarboi.org

ঘ) নব লোক-ব্যবস্থাপনার আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, এর উৎপত্তি ও সংজ্ঞা নিয়ে বেশ মতদ্বৈততা রয়েছে। এখনো পর্যন্ত নব লোক-ব্যবস্থাপনার কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা নির্ধারণ বা নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচীতে কি কি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান থাকবে তার কোন নির্দিষ্ট কাঠামো নেই।

ঙ) নব লোক-ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি কাঠামেতে আনা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ এটি প্রশাসনে অধিক স্বায়ত্তশাসন ও আমলাদের প্রশাসনিক স্ববিবেচনা ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে।

চ) নব লোক-ব্যবস্থাপনা সরকারের কার্যাবলী সম্পাদনে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। সেখানে সরকারী সেবার ব্যবস্থাপকরা একটি দায়িত্বশীল ভূমিকার চাইতে নিজস্ব প্রেষণা দ্বারাই পরিচালিত হয়।

ছ) উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংস্কৃতিতে রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র ও নির্বাহী সংস্থার প্রধানদের মধ্যকার আন্ত-সম্পর্ক বেশ জটিল ও সমস্যাবহুল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নব লোক-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সফল নাও হতে পারে।

উপসংহার

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, সরকারী প্রশাসন ব্যাবস্থাকে গতিশীল করার ব্যাপারে নব লোক-ব্যবস্থাপনা পদ্বতির সফলতা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশেগুলোর অভিজ্ঞতা আশানুরূপ নয়। উন্নত দেশগুলোর শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো, বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনকল্যাণমুখী আমলাতন্ত্র যে কোন ধরনের প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সেসব দেশের সুশীল সমাজ ও সচেতন জনগণও এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পলন করে থাকে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নব লোক-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংস্কার কর্মসূচী প্রয়োগের আগে অন্ততঃ সুশাসনের মৌলিক শর্তাবলী নিশ্চিত করা প্রয়োজন হবে যেমনঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন, নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা ইত্যাদি। এ ছাড়াও দরকার একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব যার মূল লক্ষ্যই হবে সব ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের উর্ধ্বে উঠে জনকল্যাণমুখী যে কোন ধরনের সংস্কার কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শুধুমাত্র তখনই উন্নয়নশীল দেশে নব লোক-ব্যবস্থাপনার কার্যকর ভূমিকা প্রতিভাত হতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. Derry Ormond, *New Public Management: What to take and What to leave*, available at *www.clad.org. ve/ congreso/ormond.html* নব লোক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আরো দেখুন Rizwan Khair, "New Public Management" (n.a) এবং Abdun Noor, "Millennium Development Goals and the New public Management: A Partnership Building Approach", paper presented in a seminar organized by the Department of Public Administration, University of Chittagong in February 17, 2007.

www.amarboi.org

২. Tor Hernes, "Four Ideal-type Organizational Responses to New Public Management Reforms and Some Consequences," *is International Review of Administrative Science*, Vol, 2005,71(1): pp.5-17.

৩. D. Osborne, and T. Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse, City Hall to Pentagon,* Reading, MA: Addison Wesley, 1992.

৪. Guy Peters, "Contracts As A Tool For Management: Their Strange Absence in North America", in Fortin Ynonne and Hugo van Hassel, C*ontracting in the New Public Management* (Amsterdam: IOS Press, 2000).

৫. Christopher Pollitt, *Managerialism and Public Service* (Oxford: Blackwell, 1993).

৬. Christopher Pollitt, "Justification By Works By Faith: Evaluating the New Public Management", in *Evaluation* 1(2) October, 1995.

৭. Cristopher Hood, "A Public Management for All Seasons"? in *Public Administration, Vol.69, Spring (3-19)*,1991.

৮. Osamu Koike, "*New Public Management in Japan and Southeast Asian Countries: A Magic Sword for Governance Reform*,2000", available at www1.biz.biglobe.ne.jp/~iam/httpdocs/pdfdownloadsbologna00-paper1.pdf –

৯. Dr Julio Teehankee, "*New Public Management: Lean State, Lean Government*", paper presented in a seminar held in Germany in 2003.

১০. Dr. Julio Techankee, *প্রাগুক্ত* ।

১১. বিস্তরিত আলোচনার জন্য দেখুন, Charles Polidano, "*The New Public Management in Developing Countries", available at* www.unpan1.un.org/ intradoc/groups/ public/ documents /APCITY/ UNPAN014322. pdf

১২. Dr. Julio Techankee, *প্রাগুক্ত* ।

১৩. Government of the People's Republic of Bangladesh, Public Adminisration Reform Commission, *Public Adminisration for 21st Century: Report of the Pubic Adminisration Reform Commission,* 3 Volumes, 2000; also see Abu Elias Sarker, "New Public Management in Bangladesh: Chasing Mirage?" *In Indian Journal of Public Administration*, Vol. XLVII.No.2 April-June, 2001.

১৪. *ঐ* ।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

খ. লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধ

৫. আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন ৬১-৬৯

৬. নব লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৭১-৭৮

৭. লোক প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৭৯-৯৫

৭. মহানবী (সা:)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা (৬২৩-৬৩২ খ্রি:) ৯৭-১১৬

৮. সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইসলামী প্রশাসনের রীতি ১১৭-১২৭

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন*

ভূমিকা

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের আচরণের মূলে রয়েছে তার দর্শন বা বিশ্বাস। অনুরূপভাবে, প্রতিটি সংগঠনকর্মী বা পেশাজীবীর একটি বিশ্বদর্শন (দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও প্রত্যাশা ইত্যাদি) থাকে যেটা সংগঠনে তার চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করে [১]। প্রখ্যাত লোক-প্রশাসনবিদ্ Dwight Waldo -এর মতে, লোক-প্রশাসনেও আমলাদের বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে [২]। আলোচ্য প্রবন্ধে আধুনিক মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক[৩] দর্শনের সাথে ইসলামী প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক দর্শনের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের প্রচেষ্টা থাকবে।

আধুনিক লোক-প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক বিশ্বদর্শন

আধুনিক সমাজে সরকারী আমলাদেরকে "সিভিল সার্ভেন্টস" বলা হয়। "সিভিল সার্ভেন্টস" শব্দগুচ্ছটি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকগণ বেসামরিক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। ইংরেজি Civil Servant-কে বাংলার "আমাত্য", "জন পাল কৃত্য" এবং "সুশীল সেবক" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু নাম যাই হউক না কেন, সরকারী আমলাদের বাস্তব আচার-আচরণে কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে, তারা আসলে "সিভিল লর্ডস"। বাংলাদেশের প্রশাসন সাহিত্যে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে "সুশীল সেবক" হিসাবে অভিহিত করা হলেও *সিভিল সার্ভেন্টদের* মনের ভাবটা এমন যে, তারা জনগণের সেবক নন, বরং জনগণের উপর প্রভুত্বকারী ক্ষমতার অংশীদার বা প্রতিনিধি। আমলারা যেন নিজস্ব স্বার্থেরই সেবক। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, প্রতিটি পেশার ন্যায় আমলাতন্ত্রেরও একটি নিজস্ব বিশ্বদর্শন আছে যা প্রতিশ্রুত (Filtered) হয় শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে [৪]।

বিশ্বব্যাপী সরকারী আমলাতন্ত্রের ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা জনগণের কল্যাণ সাধন [৫]। কিন্তু আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন সর্বক্ষেত্রে জনস্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। Anthony Downs তাঁর *Inside Bureaucracy* গ্রন্থে আমলাতন্ত্রের আচরণের শ্রেণী বিভাজনের মাধ্যমে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য একটি তাত্ত্বিক কাঠামো গঠনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাগণ সর্বদা নিজেদের স্বার্থেই প্রভাবিত হন [৬]। Robert D. Miewald-এর মতে, "পেশাদার আমলাতন্ত্রগুলি হচ্ছে স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণকারী যন্ত্র (Self perpetuating machines) বিশেষ" [৭]। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এমন অভিযোগও

---

*সৌজন্যে ঃ *মানব উন্নয়ন জার্ণাল*, বর্ষ- ৩, সংখ্যা-৪, ১৯৯১,পৃঃ ৫০-৫৮।

www.amarboi.org

উত্থাপিত হয়েছে যে, আমলাদের পেশাজীবী মূল্যবোধ (অর্থাৎ অধঃস্তন-উর্ধতন সম্পর্ক, নিয়ম-নীতির কড়াকড়ি ও নৈর্ব্যক্তিকতা) ক্রমান্বয়ে সংগঠনের লক্ষ্যের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে, এবং শেষ পর্যন্ত সংগঠনকে এর মূল লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করে ফেলে [৮]। অনেক সময় কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতার কারণে প্রদত্ত আমলাদের 'স্ববিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত' (Administrative Discretion) প্রদানের ক্ষমতা পরবর্তীতে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে ষাটের দশকের শেষে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনে" [৯]।

সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাদের প্রধান ভূমিকা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৮৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশের (জর্ডান, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, দক্ষিণ ইয়েমেন ও দুবাই) উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দু'শত জন আমলার উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গড়ে শতকরা ৮০জন আমলাই মনে করেন যে তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সরকারী কর্মে (নীতি বাস্তবায়নে) নির্ধারিত আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ (সারণি-১)। সুতরাং গবেষকদের মতে, "এটা আশা করা বৃথা যে সরকারী প্রশাসকবৃন্দ জনগণের সমস্যা ও চাহিদার প্রতি আগ্রহশীল হবেন" [১০]। অনেক সময় আমলাগণ আইন ও নিয়ম-নীতির দোহাই দিয়ে নাগরিকদেরকে প্রশাসনের কাছেই ঘেঁষতে দেয় না [১১]। উপরিউক্ত সমীক্ষায় উত্তর প্রদানকারী আমলাগণ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে "কেন্দ্রীয়করণ", "কর্তৃত্ব" ও "ক্ষমতার" উপর [১২]। সুতরাং সাংগঠনিক দায়িত্ব যাই হউক না কেন, সরকারী কর্মকর্তাদের প্রধান পথ নির্দেশক মূল্যবোধ (Guided value) হচ্ছে নির্ধারিত বিধি-বিধান [১৩]।

সারণি-১

আমলাতন্ত্রের পূর্বাভিমুখীনতা

দেশ	শতকরা হার
জর্ডান	৭৫%
কুয়েত	৮০%
বাহরাইন	৭৮%
কাতার	৮২%
দক্ষিণ ইয়েমেন	৮৫%
দুবাই	৭৯%

উৎস : Yaser M. Adwan and Zuhair Kayed, "The Responsiveness of Government Officials to Public Demands: A Comparative Study", in *Asian Affairs* 10 (April-June, 1988), p.7.

মানুষ কেন সরকারী আমলাতন্ত্রে যোগদান করে? বাংলাদেশের উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের উপর পরিচালিত এক মতামত জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৮৮ জন উত্তর প্রদানকারীই *সিভিল সার্ভিসে* যোগদানের কারণ হিসাবে চাকুরীর চাকচিক্যের মোহ

www.amarboi.org

(Glamour) কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ জনস্বার্থ নয়, বরং "ক্ষমতা", "সম্মান" ও "অর্থের মোহই" তাদেরকে আমলাতন্ত্রে যোগদানের ব্যাপারে প্রলুব্ধ করেছে [১৪]। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বার্ষিক রিপোর্টে যখন শতকরা প্রায় ৮০ জন সরকারী আমলার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকে না [১৫]।

Mosher I. Humnel-এর অভিমত হচ্ছে, পেশাজীবী আমলাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জনগণের মতামত বা দাবি জানার জন্য সচেষ্ট না হয়ে জনগণের জন্য কি মঙ্গলকর সে ব্যাপারে নিজস্ব বিবেচনা নিয়ে কর্মোদ্যোগী হন [১৬]। বাংলাদেশের *সিভিল সার্ভেন্টদের* উপর পরিচালিত Emajuddin Ahmed-এর গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে, শতকরা ৮০জন সরকারী আমলার মানসিকতা হচ্ছে অভিভাবকসূলভ, অর্থাৎ তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নন [১৭]। নাগরিকদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, সু-নাগরিকের দায়িত্ব শুধু আইন মান্য করা যাকে Almond ও Verba "কর্তৃপদীয় সংস্কৃতি" (Subjective culture) বলে অভিহিত করেছেন [১৮]। সর্বক্ষেত্রেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে নাগরিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমলাদের দারুন নিরুৎসাহ রয়েছে।

অপর একজন গবেষকের মতে, শাসন ব্যবস্থার নির্বাহী শাখায় অধিষ্ঠিত আমলারা (ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, মহা-পরিচালক বা মন্ত্রণালযের সচিব পর্যায় পর্যন্ত যিনিই হউন না কেন) সরকারী পদমর্যাদার বলে নিজেদেরকে জনগণ থেকে আলাদা, উন্নত এবং উর্ধ্বে অবস্থানকারী বলে মনে করেন [১৯]। নিজেদের সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে, তারা এমন একদল ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী যারা এবং শুধু তারাই বোঝেন জনগণের জন্য কি ভাল। সুতরাং তাদের মতে, প্রশাসনিক নিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আমলারাই জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারণ করবেন।

অপরদিকে, সরকারী আমলাদের সম্পর্কে জনগণের ধারণা হচ্ছে,"তারা (আমলারা) সব সময় নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। জনসাধারণের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি নেই, জনগণের উপকারের জন্য তারা কোন তৎপরতাও দেখান না" [২০]। জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যকার এজাতীয় পারস্পরিক আস্থাহীনতার পরিবেশ এবং আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন যে জনস্বার্থের অনুকূলে নয়, সেটা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক আমলাতন্ত্রের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গণজবাবদিহিতার অভাব। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলেও এতে মন্ত্রী পরিষদের "সমষ্টিগত জবাবদিহিতার" (Collective accountability) আড়ালে এবং সরকারী কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা (Political neutrality) ও বেনামীর (Anonymity) ছদ্মাবরণে, আমলারা জনগণের নিকট

www.amarboi.org

সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে আমলাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। সংক্ষেপে, আধুনিক লোক-প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক বিশ্বদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখান হল (সারণি-২)।

সারণি-২
আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১.	আমি কে ?	১. ক্ষমতার/ সরকারের প্রতিনিধি।
২.	আমার কি কর্তব্য ?	২. সরকারী কর্মে নির্ধারিত বিধি-বিধানের প্রয়োগ।
৩.	প্রশাসনের লক্ষ্য কি?	৩. দক্ষতা ও স্বল্পব্যয়ে সরকারী নীতির বাস্তবায়ন।
৪.	আমার আনুগত্য কার প্রতি?	৪. ক্ষমতা/সংগঠন /পেশাগত দলের প্রতি।
৫.	আমার জবাবদিহিতা কার প্রতি ?	৫. পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি।
৬.	আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ?	৬. অভিভাবকসুলভ (যেখানে সরকারী আমলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে)।
৭.	আমি কেন আমলা হলাম?	৭. ক্ষমতা, সম্মান ও অর্থের মোহে।
৮.	আমলারা কর্মজীবনে কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়?	৮. ব্যক্তিগত ও শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বারা ।

উৎস : Anthony Downs, *Inside Bureaucracy* (Boston: Little Brown and Company, 1969); Robert D. Miewald, *Public Administration: A Critical Perspective* (New York: McGraw Hill, 1988); Yaser M. Adwan and Zahir Kayed "The Responsiveness of Government Officials to Public Demands: A Comparative Study", in *Asian Affairs* 10 (April-June 1988); Emajuddin Ahmed, "Bureaucratic Elites in Bangladesh and Their Development Orientation", in *The Dhaka University Studies*, Part A 18(June 1978); আখতার হামিদ খান, "জনসাধারণ ও সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রসঙ্গে", *পল্লী উন্নয়ন*, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮৯।

ইসলামী প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন

ইসলাম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের নিকট আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ্ নির্ধারিত জীবন বিধির যথাযথ অনুশীলনের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের জাগতিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি (*সূরা বাকারা*, ২ঃ ২০১)। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে

www.amarboi.org

ইসলামী প্রশাসনের মূল লক্ষ [২১]। *কুরআনে* মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেনঃ *"য়্যা বানি' আদাম...কুল্ আমারা বিল কিসতে"*, অর্থাৎ 'হে বনি আদম! বল আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার (*সূরা আরাফ*, ৭ঃ২৭-২৯)। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন ন্যায়নীতির পথ নির্দেশিকা (কিতাব)সহ যাতে মানুষ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে (*সূরা হাদীদ*, ৫৭ঃ ২৫)।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -কে আল্লাহ্ দ্বীনের (আল্লাহ্ নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থা) পথে মানুষকে আহ্বান করা ছাড়াও অপর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি অর্পণ করেছিলেন সেটি হচেছ, মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (*সূরা শূরা*, ৪২ঃ১৫)। এই শেষোক্ত লক্ষ্যেই রাসূল (সাঃ) মদীনার মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সমন্বয়ে প্রথমে একটি সমন্বিত সমাজ গঠন করেছেন মদীনা সনদ নামক সামাজিক চুক্তি প্রণয়নের মাধ্যমে [২২]। পরবর্তীকালে ইসলামের ন্যায়বিচার ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক এই মদীনা সমাজই একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব, ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বের মূল লক্ষ হচ্ছে "সমাজে ন্যায় ও কল্যাণ" প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্য যে, ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন", "নয়া রাজনীতি বিজ্ঞান" ও "নয়া অর্থনৈতিক অর্ডার" আন্দোলনেরও মূল লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে "সামাজিক ন্যায়বিচার"।

ইসলামী প্রশাসনের বিশ্বদর্শনে এই উচিত সুলভ (Normative) ধারণা পাশ্চাত্য মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কেননা, ইসলামী দর্শনে লোক-প্রশাসনের সাথে সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে এক ধরণের উদ্বেগ বা সচেতনতা প্রকাশ পায়। সুতরাং ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় লক্ষসমূহের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে, লোক-প্রশাসকদের মনে প্রথমে একটি ইসলামী বিশ্বদর্শনের চেতনা সৃষ্টি করা।

লোক-প্রশাসনের চিরাচরিত লক্ষ্য অর্থাৎ "দক্ষতা" (Efficiency) ও "ব্যয়-সংকোচন" (Economy) ইসলামী প্রশাসনে ভিন্নতর অর্থে ব্যবহৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, স্বৈরশাসন বা ঔপনিবেশিক শাসনেও লোক-প্রশাসন কর্মে প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হয় "দক্ষতা" ও "ব্যয় সংকোচন" নীতির উপর। কিন্তু তথায় সরকারের লক্ষ্য ভিন্নতর বলে, লোক-প্রশাসনে দক্ষতার ধারণাকেও ভিন্নতর অর্থে ব্যবহার করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনে "দক্ষতা" বলতে বুঝায় আইনের প্রয়োগ বা জনগণকে নিয়ন্ত্রিত রাখা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে কার্যকর করা। অনুরূপভাবে, প্রশাসনের "ব্যয়সংকোচন" নীতিতে উৎপাদন ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া হয় বেশী। কিন্তু "সামাজিক ন্যায়বিচারে" যখন লোক-প্রশাসনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, তখন সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যসমূহ [২৩] অর্জনের ক্ষেত্রে লোক-প্রশাসনকে কার্যকর করার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। এক্ষেত্রে ইসলামী প্রশাসনে প্রশাসকদের দক্ষতা ও ব্যয় সংকোচনের মত সনাতন মূল্যবোধসমূহ ততদূর পর্যন্ত গুরুত্ব বহন করে যতদূর পর্যন্ত এগুলি "সামাজিক ন্যায়বিচারের" লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

www.amarboi.org

আধুনিক লোক-প্রশাসনে কর্মচারী নিয়োগের ভিত্তি হচ্ছে "মেধা" (প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা)। কিন্তু ইসলামী প্রশাসনে লোক নিয়োগের ভিত্তি হিসাবে মেধা ছাড়াও গুরুত্ব আরোপ করা হয় প্রার্থীর উন্নত নৈতিক চরিত্র (সততা ও ন্যায়বোধ), দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়বিচারের কর্মসূচীর প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতার উপর (*সূরা কাসাস*, ২৪, ২৬) [২৪]। সমাজে মেধার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। আধুনিক শিক্ষা শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে মানুষের দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ইসলাম মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে, আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি হিসাবে উৎপাদিত সম্পদ ও সেবাসমূহ সমাজে ন্যায়ের ভিত্তিতে বিতরণের প্রয়োজনে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক বিকাশ তথা সততা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও সমাজবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বিকাশের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে [২৫]।

ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে, স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর মালিক, পরিচালক ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (*সূরা বাকারা*, ২ ঃ ১০৭)। সরকারী নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসকগণ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি। সুতরাং একজন শাসকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হচ্ছে তার উপর অর্পিত পবিত্র আমানত (Trustee)[২৬]। একমাত্র জনস্বার্থ বা জনকল্যাণার্থেই তিনি তার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন (*সূরা আল-এমরান*, ১১০; *সূরা বুরুজ*, ১১, *সূরা বায়্যিনা*, ৭-৮) [২৭]। এ ব্যাপারে রাসূল (সা:)-এর একটি বিখ্যাত *হাদীস* হচ্ছে, "যে ব্যক্তি (শাসক/প্রশাসক) জনগণের বিষয়ে দায়িত্বশীল হলেন, অতঃপর তিনি তাদের কল্যাণ ও স্বার্থের জন্য সে ধরনের চেষ্টা করলেন না, যে ধরনের চেষ্টা তিনি নিজের (বা গোষ্ঠীর স্বার্থের) জন্য করেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌ তাকে উল্টো করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন" *(তাবারানী)*।

অতএব, ইসলামী প্রশাসনে একজন প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে লক্ষ্যমুখী। তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজের স্বার্থের নীচে স্থান দেবেন *(বুখারী শরীফ)*। তাই প্রশাসকদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অধীনস্থ কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (*সূরা শূরা* ঃ ৩৮; *সূরা মুজাদালা* ঃ ৯)। এ ব্যাপারে তাদের জন্য নির্ধারিত বিধি-বিধান বা পথ নির্দেশিকা হচ্ছে আল্লাহ্‌র *কুরআন* ও রাসূলের *সুন্নাহ্‌* এবং সমাজে বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী শাসক ও প্রশাসকদের ন্যায়সংগত নির্দেশাবলী (*সূরা নিসা* ঃ ৫৯,১০৫; *হাদীস* ঃ ২৫; এবং *সূরা হাশর* ঃ ৭)। এভাবে ইসলামী প্রশাসনে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট একটি কর্তৃত্ব কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ যথাযথভাবে অর্থাৎ সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। এটা শুধু সংগঠন বা সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় নয়, এটা ধর্মীয় কর্তব্যও বটে *(বুখারী শরীফ)* [২৮]। ইসলাম প্রশাসকদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করে যে, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌ প্রত্যক্ষ করছেন এবং তার ফেরেশ্‌তাগণ তা রেকর্ড করছেন। ইসলামের শিক্ষা

www.amarboi.org

দেশের প্রশাসন কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই চেতনাবোধ জাগ্রত করে যে, তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, জনগণ নির্বাচিত *খলিফা* বা রাষ্ট্রপ্রধান ও সংসদ ছাড়াও সরাসরি জনগণ (সাপ্তাহিক শুক্রবার ও বার্ষিক হজ্বের সম্মেলনে) এবং শেষ বিচারের দিন প্রভূ আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করবেন (*সুরা বাকারাঃ* ২০৩,২৮১ এবং *সুরা নিসাঃ* ৮৭)। *কুরআন* ও *সুন্নাহ্‌র* আলোকে সমাজে ন্যায়বিচারের কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যাপারে যারা যথাযথভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের জন্য ইহ্‌জীবনে কল্যাণ ও পরকালে পুরস্কারের অঙ্গীকার রয়েছে প্রভূ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে (*সুরা বাকারাঃ* ৮২; *সুরা কাফঃ* ৩১-৩২)। আর যারা শাসক ও প্রশাসক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার করবেন, কর্তব্যকর্মে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবেন, শেষ বিচারের দিনের কর্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের জন্য দোজখের গ্লানিকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে হুঁশিয়ারি রয়েছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে (*সুরা নিসাঃ* ১২৩; *সুরা ফাতিরঃ* ৩৬-৩৭)। সংক্ষেপে ইসলামী প্রশাসনে বিশ্বদর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নের সারণিতে দেখান হল (সারণি-৩)।

সারণি-৩
ইসলামী প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন

ক্রমিক	প্রশ্ন	উত্তর
১.	আমি কে?	১. পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলির সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক সার্বভৌম আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি।
২.	আমার আনুগত্য কার প্রতি?	২. আল্লাহ্‌ ,রাসূল ও বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারীর প্রতি।
৩.	প্রশাসনের লক্ষ্য কি?	৩. সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা।
৪.	এ ব্যাপারে পথ নির্দেশিকা কি?	৪. আল্লাহ্‌র *কিতাব* ও রাসূলের সুন্নাহ্‌ ।
৫.	ইসলামী প্রশাসনে নেতৃত্বের স্বরূপ কি হবে?	৫. গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সংশি-ষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে।
৬.	ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহিতা কার প্রতি?	৬. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, জনগণ ও শেষ বিচারের দিন প্রভূ আল্লাহ্‌র কাছে।
৭.	ইসলামী প্রশাসনে কিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়?	৭. দক্ষতা ও অপচয়রোধ; এবং ন্যায়বিচার ও জনগণের কল্যাণের উপর।
৮.	ইসলামী প্রশাসনে আমলারা কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়?	৮. ক) মানব কল্যাণার্থে সৎকর্ম সৃষ্টি এবং অসৎকর্ম প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র নির্দেশ; খ) পার্থিব কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল-াহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার চেতনা; এবং গ) সৎকর্মের জন্য পরকালে বেহেশ্‌ত এবং অসৎকর্মের জন্য দোজখের শাস্তির ব্যাপারে আল-াহ্‌র অঙ্গীকার।

উৎস : Abdun Noor, "Process of Public Administration: Islamic Perspective", in *Indian Journal of Public Administration*,Vol.44, No. 2,April-June 1998.

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সরকার ও প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের মনে একটি ইসলামী বিশ্বদর্শনের চেতনা সৃষ্টি করা। এজন্য প্রয়োজন লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচীতে প্রশাসন সম্পর্কিত *কুরআন* ও *সুন্নাহ্‌র* নির্দেশাবলী, আদর্শ ও বিধি-বিধানের সমন্বয় ঘটান।

তথ্যসূত্র

১. Fremont E.Kast and James E. Rosenzweig, *Organization and Management: A System and Contingency Approach*,Third Edition(Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha Ltd., 1981), পৃ ঃ ১১০।

২. D. Waldo, *The Study of Public Administration* (New York : Random House, 1965), পৃঃ ১০। আলোচ্য প্রবন্ধে "আমলা" বলতে সেইসব মাঝারি ও উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের বুঝান হয়েছে, যারা কেন্দ্র অথবা মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অর্থাৎ যারা নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে মানুষকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার ব্যাপারে দায়িত্ব লাভ করেন। আধুনিক সরকারের আমলাতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে Joseph La Palombara অনুরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। দেখুন Joseph La Palombara, "An Overview of Bureaucracy and Political Development" in Joseph La Palombara(ed.), *Bureaucracy and Political Development* (Pirnceton, New Jersey : Princeton University Press, 1963), পৃঃ ৭-৮।

৩. "আমলাতন্ত্র" হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের কাঠামোগত কর্ম প্রক্রিয়া। অতএব, আমলা বলতে পদসোপান ভিত্তিক সরকারী কর্মচারী কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকেই বুঝায়।

৪. দেখুন, Richard C. Kearney and Chandan Sinha, "Professionalizm and Bureaucratic Responsivencss: Conflict and Compatibiliy", in *Public Administration Review 48* (January-February, 1988), পৃঃ ৫৭৪।

৫. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *A Handbook of Public Administration: Current Concepts and Practices With Special Reference to Developing Countries,* বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান, *লোক প্রশাসন সার* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯),পৃঃ ১৬, ১৮,২৪।

৬. Anthony Downs, *Inside Bareaucracy* (Boston: Little Brown and Company, 1969).

৭. Robert D. Miewald, *Public Administration: A Critical Perspective* (New York : McGraw-Hill, 1978).

৮. Herbert G Hicks and C. Ray Gullet, *Organizations : Theory and Behavior* (Tokyo: McGraw-Hill International Book Company, 1975), পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৯. নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Frank Marini (ed), *Toward a New Public Administration: A Minnowbrook Perspective* (Serantion: Chandler Publishing Company, 1972).

১০. Yaser M. Adwan and Zuhair Kayed, "The Responsivencss of Government Officials to Public Demands : A Comparative Study ", in *ASIAN AFFAIRS* 10 (April-June 1988), পৃঃ ৭।

১১. *ঐ*।

১২. *ঐ*, পৃঃ ৬।

১৩. *ঐ*।

www.amarboi.org

১৪. দেখুন, Emajuddin Ahmed, "Bureaucratic Elitcs in Bangladesh and Their Development Orientatioin", in *The Dhaka University Studies*, Part A (18 June 1978), পৃঃ ৬৬-৬৭।

১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, *বাৎসরিক প্রতিবেদন*, ১৯৮৮ ইংরেজি, সারণি -৬, পৃঃ ২১।

১৬. Frederick C. Mosher, *Democracy and the Public Service*, Second Edition (NewYork: Oxford University Press, 1982); Ralph P. Hummel, *The Bureaucratic Experience*, Third Edition (New York : St. Maitions Press, 1987).

১৭. Emajuddin Ahmed, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬৭।

১৮. Almond and Verba, T*he Civic Culture* (Boston : Brown and Co, 1963), পৃঃ ১৬৮- ৮৫।

১৯. আসহাব উদ্দীন, "আমলাতন্ত্র", ভূঁইয়া ইকবাল ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *বক্তব্য*, নভেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ২০।

২০. আখতার হামিদ খান, "জনসাধারণ ও সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রসঙ্গে", *পল্লী উন্নয়ন*, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই১৯৮৯, পৃ ঃ ১৪৪।

২১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "The Concept of Justice and the System of Administration in Islam", বিগত ২৫শে মে থেকে ২৭শে মে (১৯৯০) পর্যন্ত চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী দর্শন সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

২২. সপ্তদশ শতাব্দীতে মদীনায় বসবাসরত ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা বিধান এবং ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণার্থে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক সম্পাদিত মদীনা সনদকে মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে অভিহিত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন M. Hamidullah, *The First Written Constitution in The World* (Lahore : Sh. Mohammad Ashraf, 1981).

২৩. ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে, জনগণের মৌলিক চাহিদার পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদনের উপকরণসমূহের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, আইনের শাসন কায়েম, সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে সবাইর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ, ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাস এবং সামাজিক শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা। দেখুন লেখকের "সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইসলামী প্রশাসনের রূপরেখা", *প্রশাসন সমীক্ষা*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৯৬।

২৪. লোক-প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত সূরাটির নির্দেশের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Ibnomer Mohammed Sharfuddin, "Towards an Islamic Administrative Theory", in *The American Journal of Islamic Social Sciences* 4 (December 1987), পৃঃ ২৩৪।

২৫. শিক্ষা সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৩বর্ষ, ৪ সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ১৯৯৪)।

২৬. *The Speeches and Table-Talks of Prophet Muhammed (SM)*, chosen and translated by Stanley Lane-poole (New Delhi : Kitab Bhavan,1979), c,,t 165; এবং Ibn Taymeeyah, *Shariati Conduct of State*, বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা জুলফিকার আহমেদ কিস্‌মতি, *শরীয়তি রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৮।

২৭. Muhammad Asad, *The Prinicples of State and Government in Islam*, অধ্যাপক শাহেদ আলী অনুদিত, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৮।

২৮. রাসূল (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্ এটা পছন্দ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই দায়িত্ব যেন *এহসান* অর্থাৎ যথাযথভাবে পালন করে" *(বায়হাকী)*।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

নব লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা*

ভূমিকা

সত্তরের দশকের শুরুতে, পাশ্চাত্য দুনিয়ায় লোক-প্রশাসনের নতুন দিগন্ত হিসাবে "নব লোক-প্রশাসন" (New Public Administration) নামে একটি নতুন মতবাদ বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে মূলতঃ আধুনিক সমাজের সংকট নিরসনে চিরাচরিত লোক-প্রশাসনের অপর্যাপ্ততা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর প্রেক্ষাপটে, মার্কিন লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের অনুচিন্তা ও গবেষণা হতে। বিগত শতকে সরকারী উদ্যোগ ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও, দেশে দেশে ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল একটি উদ্বেগজনক বৈশিষ্ট্য। এর কারণ বিশ্লেষণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় তরুণ লোক-প্রশাসন পন্ডিত ও অভিজ্ঞ সরকারী আমলা ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনব্রোক নামক স্থানে এক সম্মেলনে মিলিত হন। বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ্ Dwight Waldo ছিলেন সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। লোক-প্রশাসনের নবীন পন্ডিতবর্গ মনে করেন যে, লোক প্রশাসনের সনাতনী লক্ষ ও কর্মপদ্ধতি বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে আর অতটা প্রাসংগিক নয়। মূল্য নিরপেক্ষ লক্ষ (উৎপাদনশীলতা) অর্জন বা যান্ত্রিক দক্ষতাই প্রশাসনিক কার্যকারিতা পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। সকল ধরনের প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু মানুষ, সেহেতু লোক-প্রশাসনে মানবিক মূল্যবোধের ভূমিকা থাকা বাঞ্চনীয়। তাঁদের মতে, শিল্পোত্তর সমাজগুলোতে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লোক-প্রশাসনকে প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং 'দক্ষতার' সাথে সাথে, 'সামাজিক সমতা'ও নিশ্চিত করতে হবে। এ জাতীয় চিন্তা প্রবণতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক যে সকল লোক-প্রশাসন সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা "নব লোক-প্রশাসন" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে[১]। নিম্নোক্ত আলোচনায় নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনের মূল ভাবধারা ও নীতিমালাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক, এসবের সাথে ইসলামী লোক-প্রশাসনের সামঞ্জস্যতা তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

মিনব্রোক সম্মেলনটি ষাটের দশকে আমেরিকার রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যাকান্ড, সমান অধিকারের জন্য সংখ্যালঘুদের আন্দোলন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে সরকারী

*সৌজন্যে ঃ *Journal of Islamic Administration*, Vol.3,No.1 (Chittagong), pp.93-100.

www.amarboi.org

সমাধানের অপর্যাপ্ততা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য মোছনের দাবীতে আন্দোলন এবং উপরোল্লিখিত কারণে শিক্ষাঙ্গনসমূহে ক্রমবর্ধমান ছাত্র অসন্তোষ ইত্যাদির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ঐ সময়কালটাকে বিক্ষোভপূর্ণ সময় (Time of turbulence) বলে অভিহিত করা হয়েছিল। উক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলায় সরকারী আমলাতন্ত্র চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

লোক-প্রশাসনে নৈতিক শূন্যতা

এক অর্থে লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারী সেবা বিতরণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম প্রক্রিয়া [২]। এ ব্যাপারে "দক্ষতার" সাথে এবং যতদূর সম্ভব "স্বল্পতম ব্যয়ে" সরকারের নীতি ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়নই হচ্ছে পরম্পরাগতভাবে লোক-প্রশাসনের ঘোষিত লক্ষ্য। কিন্তু "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলনকারীদের আলোচনায় লোক-প্রশাসনের সাথে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং সমাজ জীবনে লোক-প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে এক নতুন চিন্তাধারার সংযোজন ঘটে। পণ্ডিতবর্গের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আধুনিক লোক-প্রশাসন একটি নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতায় ভূগছে। এতদিন ধরে সংগঠন তত্ত্ববিদ্‌গণের চিন্তাধারা প্রশাসন কিভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত, কেন মানুষ সংগঠনে আচরণ করে, কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু লোক-প্রশাসন কাদের স্বার্থে? লোক-প্রশাসকদের কি করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত? এ সকল উচিতসূলভ (Normative) চিন্তাধারা কিন্তু এতদিন ধরে বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় তেমন প্রাধান্য পায়নি।

লোক-প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মিনব্রোক সম্মেলনে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এতদিন ধরে লোক-প্রশাসন সমাজের কম সুবিধাজনক অবস্থানের জনগোষ্ঠীকে (যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠও বটে) সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানের জনগোষ্ঠীর স্বার্থে! এতদিন ধরে এটা শুধু সামাজিক স্থিতাবস্থা (Social status quo) বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবেই ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক লোক-প্রশাসন একটি নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) আমলাতান্ত্রিক সংগঠন যা সর্বদা সাধারণ জনগণের নয় বরং সমাজের প্রভাবশালী ও অধিকারভোগী শ্রেণীরই স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। Elden এর মতে, "এটাকে জনগণের কল্যাণ, নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন এবং সত্যিকার গণতন্ত্রের জন্য উৎসর্গীকৃত বলে ধরা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু এটা বিপরীতমুখী কর্মই সৃষ্টি করে।" [৩]

মিনব্রোক সম্মেলনে উপস্থিত পন্ডিতবর্গের আলোচনায় কিন্তু লোক-প্রশাসনের মূল্যবোধ বা লক্ষ পুনঃ নির্ধারণের ব্যাপারে তেমন সুস্পষ্ট বা সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। Robert T. Golembiewski-এর মতে, "কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির ব্যাপারে (পণ্ডিতবর্গের মধ্যে) মতভেদ ছাড়া আর কিছুই 'নব লোক-

www.amarboi.org

প্রশাসনকে' এত স্পষ্ট করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে নাই" [৪]। যেমন Kronemberg বলেন, "মানুষের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমরা আমাদের বিজ্ঞান ও প্রতিভাকে ব্যবহার করা উচিত" [৫]; La Porte-এর বক্তব্য হচ্ছে, "আমাদের সরকারী সংগঠনের প্রাথমিক করণীয় হচ্ছে অর্থনৈতিক ও মানবিক দুর্দশার লাঘব এবং সংগঠনের ভিতরে ও বাইরে সবার জন্য জীবনের সুযোগ বৃদ্ধি করা" [৬]; এবং Frederickson-এর অভিমত হচ্ছে, "নব লোক-প্রশাসন এবং ঐ সকল নীতি ও কাঠামো পরিবর্তনে প্রত্যাশী যেগুলি রীতিবদ্ধভাবে সামাজিক সমতা অর্জনে বাধা দেয়" [৭] ইত্যাদি।

নব লোক-প্রশাসনের সংযোজন

Myung See Park-এর মতে, "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ লোক-প্রশাসনের ভূমিকা হিসাবে "সামাজিক ন্যায়বিচার" (Social Justice) প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন [৮]। উল্লেখ্য যে, একই সময়ে ভিন্নভাবে পরিচালিত "নব রাজনীতি বিজ্ঞান (New Political Science) আন্দোলনেও অনুরূপ শ্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল [৯]। এতদিন ধরে লোক-প্রশাসনের সনাতনী লক্ষ ছিল সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রশাসন অর্থাৎ "দক্ষতা" (Efficiency) ও "মিতব্যয়িতার" (Economy) সাথে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীসমূহ কার্যকর করা। অতএব, এই চিরাচরিত লক্ষ্যের সাথে "নব লোক-প্রশাসন" যে নতুন মূল্যবোধটি সংযোজিত করল সেটি হচ্ছে, "সামাজিক সমতা"(Social equity) বা সামাজিক ন্যায়বিচার [১০]।

"সামাজিক ন্যায়বিচার' নৈতিকতাবোধ থেকে উৎসারিত একটি উচিতসূলভ (Normative) চিন্তাধারা। নব লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের মতে, লোক-প্রশাসন যেহেতু শুধু নীতি বাস্তবায়নই করে না, নীতি প্রণয়নের সাথেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেহেতু এটা মূল্য নিরপেক্ষ হতে পারে না। সুতরাং "দক্ষতা" ও "ব্যয় সংকোচনের" সাথে সাথে, নতুন মূল্যবোধ অর্থাৎ "সামাজিক ন্যায়বিচার" অর্জনের প্রতিও লোক-প্রশাসনকে প্রতিশ্রুতিশীল ও সক্রিয় হতে হবে। John Rowls-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে সমাজে বসবাসকারী সবার সমান (রাজনৈতিক) অধিকার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য লোক-প্রশাসনের অগ্রণী ভূমিকা পালনকে বুঝায় [১১]। অনেকের মতে, 'নব লোক-প্রশাসন' আন্দোলনের অনেক বক্তব্যের শিকড় নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে Frederickson স্বীকার করেছেন যে, নব লোক-প্রশাসন চিন্তার মূল ভাবটি উৎসারিত হয়েছে প্লেটো, হব্‌স, হেমিলটন এবং জেফারসনের দর্শন থেকে [১২]।

সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অতীতের সরকারগুলি অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে সরকারী আমলাতন্ত্রের কর্মদক্ষতার উপরই শুধু গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধের বিষয়টিকে পুরাপুরি অবহেলা করেছেন। ফলে সরকারী নীতি নির্ধারণী সংস্থা অর্থাৎ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী আমলাগণ অনেক সময় সামাজিক সমতার বিনিময়ে হলেও "দক্ষতা" ও "ব্যয় সংকোচনের" উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। ফলে সাধারণ

www.amarboi.org

জনগণের কল্যাণের প্রতি তারা তেমন আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিশীল হননি। প্রশাসনিক বিধি-বিধান (Rules and regulations) এবং নৈর্ব্যক্তিকতার (Impersonality) দোহাই দিয়ে তারা অনেক সময় জনগণের সত্যিকার প্রয়োজন ও চাহিদাকে উপেক্ষা করে থাকেন। এবং এতে সমাজের প্রভাবশালী/অধিকারভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থই সংরক্ষণ করা হয়েছে বেশী। সরকারী আমলাদের সম্পর্কে এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে যে তারা সরকারী সেবা বিতরণের ক্ষেত্রে জনগণের "মানবিক প্রয়োজনের" প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নন। অতএব, নব লোক-প্রশাসনবিদদের মতে, সমাজে "ন্যায়বিচার" নিশ্চিত করতে হলে আমলাতন্ত্রকে তথাকথিত "নৈর্ব্যক্তিকতা" ও "বিধি-বিধানের" কড়াকড়ি পরিহার করে মক্কেল বা জনগণের প্রতি আগ্রহশীল/ সহানুভূতিশীল হতে হবে। Nigro এবং Nigro এ জাতীয় প্রশাসনকে সেবা গ্রহীতাকেন্দ্রীক প্রশাসন (Client focussed administration) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে, এ জাতীয় প্রশাসনে সফল হতে হলে "পদসোপান" ভিত্তিক কর্তৃত্ব কাঠামো শিথিল করে হলেও আমলাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। অতএব, সরকারী সেবা ও সরবরাহ বিতরণের ক্ষেত্রে জনগণের প্রয়োজন ও মতামতকে প্রতিফলিত করার প্রয়োজনে, প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে এতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে [১৩]।

নব লোক-প্রশাসনের সমালোচনা

নব লোক-প্রশাসনের লক্ষ অর্জনে সফল হতে হলে, আধুনিক লোক-প্রশাসনকে একটি সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এজন্য দরকার আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং এর দৃষ্টিভংগীতে পরিবর্তন আনয়ন। কিন্তু নব লোক-প্রশাসন আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, "সামাজিক ন্যায়বিচারের" ধারণাটিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে? এর কর্ম কাঠামো কি হবে? "সামাজিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার জন্য লোক-প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মপদ্ধতির ধরন কিরূপ হবে? লোক-প্রশাসনে দক্ষতা ও ব্যয় সংকোচন নীতিকে কম গুরুত্ব প্রদান করা হলে আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পাবেনা ত? 'সামাজিক সমতার' চেতনা নিয়ে আমলাগণ নিজেদের বিবেচনায় কিছু করতে গেলে সেটা আবার রীতি বিরুদ্ধ হবেনা ত? এ সকল ব্যাপারে নব লোক-প্রশাসন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তেমন কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন নি [১৪]।

কিন্তু এসকল সমালোচনা সত্ত্বেও "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন যে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সর্ম্পকে একটি গঠনমূলক বিতর্কের সূত্রপাত করেছে, তা অনস্বীকার্য। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই বির্তক লোক-প্রশাসনের ইতিবাচক উদ্দেশ্য বা ভূমিকা এবং নৈতিকতার বিষয়ে এক নতুন ভাবধারা প্রবর্তনে সফল হয়েছে। দু'জন মার্কিন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞের মতে, "প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও নৈতিক লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের (নব লোক-প্রশাসনবিদ্গণের) গুরুত্ব আরোপ, সরকারী আমলাতন্ত্রের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে" [১৫]। দু'জন অষ্ট্রেলিয়ান গবেষকও আশা প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের উচিত সমাজের বঞ্চিত সদস্যদের অবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারে 'নব

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসন'-এর বাণীকে জরুরী ভিত্তিতে সরকারী নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত করা" [১৬]। সর্বশেষে বলা যায়, নব লোক-প্রশাসনে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সেবা গ্রহীতাকেন্দ্রীক রীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির লোক-প্রশাসনে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তনের জন্য এর তাত্ত্বিক বিকাশ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে।

নব লোক-প্রশাসন ও ইসলামী লোক-প্রশাসন

ডঃ মোহাম্মদ আল-ব্যুরে আমেরিকার নর্থ কেরোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রচিত তাঁর পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভে "নব লোক-প্রশাসনের" সাথে "ইসলামী লোক-প্রশাসনের" একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করেছেন [১৭]। মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনগণের কল্যাণের অঙ্গীকারে, আজ হতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে যাত্রা শুরু হয়েছিল 'ইসলামী লোক-প্রশাসনের'। কুরআনে নবী (সা:) ও জনগণকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন ঃ *"ওয়া কুল উমিরতু লি আ'দিলা বাইনাকুম"* অর্থাৎ '(হে নবী! আপনি) বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, '(*সূরা শুরা* ৪২ঃ১৫) এবং *"ইন্নাল্লাহা য়্যা মুরু বিল আদলে ওয়াল ইহ্সানে"*, অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ করেছেন সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার করতে এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করতে' (*সূরা নাহল*, ১৬ঃ৯০)।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে ঃ *"ওয়া আমরুহুম শূ'রা বাইনাহুম"* অর্থাৎ (তোমরা) নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে (*আল-কুরআন*, ৪২ঃ৩৮ ; আরও দেখুন ৩ঃ১৫৯)।

অতএব, আল-ব্যুরের মতে, সামাজিক সমতা, ন্যায়বিচার, প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও মানবিক মর্যাদার মত মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে 'নব লোক-প্রশাসন' অনেকটা 'ইসলামী লোক-প্রশাসনের' সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা বিগত তিন দশকেরও অধিককাল ধরে আধুনিক লোক-প্রশাসন সাহিত্যে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় [১৮]। তবে, এ দু'টি মডেলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, যেখানে 'নব লোক-প্রশাসনের' বিবেচনায় জীবন আত্মার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ইসলামের বিবেচনায় জীবন ও আত্মা, দেহ ও হৃদয় এবং বস্তু ও অবস্তু সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে, উন্নয়ন কর্মসূচীতে মানুষের দৈহিক ও বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে, তার আত্মিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

আদর্শ 'ইসলামী প্রশাসন' ও 'নব লোক-প্রশাসনের' মধ্যে এ সকল মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও সাংগঠনিক তত্ত্বের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় অভিন্ন যে, উভয়েই বৃহৎ ও জটিল আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের প্রচলিত ধারণাসমূহ যেমন, পদসোপান, কর্তৃত্ব ও মূল্য নিরপেক্ষতা ইত্যাদি ধারণাসমূহের তীব্র সমালোচক। সংক্ষেপে, আধুনিক লোক-প্রশাসনের বিরুদ্ধে উভয়ের অভিযোগসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

www.amarboi.org

"দক্ষতা, ব্যয় সংকোচন ও কার্যকারিতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ; ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কর্তৃত্ব কাঠামোর অকার্যকর প্রভাব; মানুষের মানবিক গুণাবলীকে অবহেলা করে শুধু যৌক্তিকতাকে (Rationality) প্রাধান্য দেয়া; সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে সাংগঠনিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা; তাত্ত্বিকভাবে মূল্য নিরপেক্ষ পেশা বা দায়িত্বের প্রতি (Professionalism) আস্থাজ্ঞাপন; সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন বা অসুবিধাজনক অবস্থানের লোকদের বঞ্চনার বিনিময়ে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীলদের আনুকূল্য করার স্বার্থে অযথার্থ লক্ষ্য নির্ধারণ; মক্কেল বা সেবা গ্রহীতাদের প্রতি জবাবদিহিতার অভাব; মেধাভিত্তিক সরকারী প্রশাসনে এলিটদের প্রাধান্য; সংগঠনসমূহে নৈতিকতার অভাব; এবং কর্মচারী, মক্কেল, গ্রুপ ও অন্যান্যদের উপর আমলাতন্ত্রের যান্ত্রিকতা বা মানবতা বিবর্জিত প্রভাব ইত্যাদি" [১৯]।

'ইসলামী লোক-প্রশাসন' (যা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে) জনগণের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নয়নে 'নব লোক-প্রশাসনের' সাথে এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে সেই সব নীতি ও কাঠামো পরিবর্তনে প্রত্যাশী, যা পদ্ধতিগতভাবে সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্থ করে। আল-ব্যুরের মতে, "সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও কর্তব্যবোধ, মানবতা ও মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও পরামর্শ এবং মানুষের অবস্থানের সার্বিক কল্যাণই হচ্ছে উভয় মডেলের ('নব লোক-প্রশাসন' ও 'ইসলামী লোক-প্রশাসন') প্রধান বিবেচ্য বিষয়" [২০]।

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও 'নব লোক-প্রশাসন' ও ইসলামী রীতির মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে, যেখানে 'সামাজিক সমতা' হচ্ছে প্রথমটির শেষ লক্ষ্য, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ওটি হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের পন্থা বা মাধ্যম মাত্র। 'ইসলামী লোক-প্রশাসন' হচেছ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার একটি উপ-পদ্ধতি (Sub-system) যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্র মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা। এসবের মধ্যে 'সামাজিক সমতা' হচ্ছে মাত্র একটি মূল্যবোধ। উপরন্তু, ইসলামী প্রশাসন বস্তুগত উন্নয়ন ছাড়াও মানুষের আধ্যাত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক মঙ্গলের প্রতিও মনোযোগী হয়। কিন্তু উপরেই যেমন উল্লেখিত হয়েছে, নব লোক-প্রশাসন আধ্যাত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক মাত্রার বদলে গুরুত্ব আরোপ করে শুধুমাত্র বস্তুগত উন্নয়নের উপর।

'নব লোক-প্রশাসন' এবং লোক-প্রশাসনের অপরাপর তত্ত্বসমূহ সৃষ্টি হয়েছে মূলত: প্রশাসন কর্মে কার্যকারিতা অর্জনের জন্য, জনজীবনের প্রধান স্রোতে আনা হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্য উদ্বেগ দেখিয়ে তাদের দৈহিক জীবনের গুণগত মানের উন্নয়নের জন্য এবং মানবিক সভ্যতাকে আরো বিকশিত করার প্রত্যাশায়। 'ইসলামী লোক-প্রশাসনের' বিবেচনায় কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ সংযোজিত যা মানুষের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বাস্থ্যের জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আল-ব্যুরে প্রশ্ন রাখেন, 'এটা কি আমাদের জন্য মঙ্গলকর হবে যদি লোক-প্রশাসন (পুরাতন ও নতুন) মানুষের আধাত্মিক কল্যাণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু বস্তুগত সমৃদ্ধির উপর মনোযোগী হয়'? তাঁর মতে, এর ফল হবে ভয়াবহ যেহেতু আধুনিক দেশসমূহে সম্পদ পুনঃবর্ন্টন করা

www.amarboi.org

হচ্ছে সমাজের বহু সংখ্যক সদস্যের আধাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য।

'নব লোক-প্রশাসনের' বক্তব্য কিন্তু সাম্প্রতিককালের এবং তা ইহজীবন সম্বন্ধীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। 'নব লোক-প্রশাসন' আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা George H. Frederickson বলেন, "সংক্ষেপে, 'নব লোক-প্রশাসন' রীতির বিকাশ ষাট এবং সত্তর-এর দশকের মধ্যবর্তীতে সংগঠিত তিনটি বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাপ্রবাহের ফসল যা অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজ ও সরকারের উপর অমোচনীয় প্রভাব ফেলে। ঘটনাসমূহ হচ্ছে: ১) ভিয়েতনাম যুদ্ধ; ২) নগরসমূহে সংগঠিত বর্ণদাংগা ও অব্যাহত সাম্প্রদায়িক কলহ; এবং ৩) ওয়াটারগেট কেলেংকারী" [২১]। তিনি আরো বলেন "এ সকল সংকট এবং ঘটনা প্রবাহের পরিণতিতে, সরকারী নীতি এবং লোক-প্রশাসন ও এর বাস্তব কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে সৃষ্টি করে পরিবর্তিত চিন্তাধারা।" অতএব, নব লোক-প্রশাসনের জন্য অপরাপর মূল্যবোধের মধ্যে 'সামাজিক সমতার দাবি ছিল আসলে সমসাময়িক অসমতাপূর্ণ পরিবেশের একটি প্রতিক্রিয়া। অথচ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে সামাজিক সমতা একটি শ্বাশত মূল্যবোধ। এটা ইসলামের মৌলিক আদর্শেই প্রোথিত। সমতা ও ন্যায়বিচার, জনকল্যাণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি মূল্যবোধের উৎস ইসলামের তত্ত্ব ও এর প্রাথমিক আচরণের মধ্যেই সন্নিবেশিত। একটি অথবা অপরটির উপর গুরুত্ব আরোপ নির্ভর করে ইসলামী লোক-প্রশাসন পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষের বাস্তব আচরণের উপর। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, (সম্পদের) বিতরণমূলক ন্যায়বিচার হতে পারে তৈল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহের একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ।

সর্বশেষে, 'নব লোক-প্রশাসন' আন্দোলনটি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এখনও তাত্ত্বিকদের দর্শনচর্চায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'ইসলামী লোক-প্রশাসনে' সামাজিক ন্যায়বিচারের বাস্তব রূপ লাভ করেছিল মহানবী (দঃ) ও *খোলাফা'য়ে রা'শেদীন*-এর শাসনামলে মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায়। দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্যের উন্নয়ন মডেল চর্চার হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে, বর্তমান সহস্রাব্দে দেশজ প্রযুক্তি হিসাবে এই আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ মুসলিম দুনিয়াসহ বিশ্বব্যাপী মানুষ আন্দোলনরত।

তথ্যসূত্র

১. মিনব্রোক সম্মেলনের পণ্ডিতবর্গের আলোচনার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন ফ্র্যাংক মেরিনী এবং অপরটি ডুয়াইট ওয়ালডো। দেখুন Frank Marini (ed.) *Toward a New Public Administration : A Minnowbrook Perspective* (Seranton: Chandler Publishing Company, 1972); এবং Dwight Waldo (ed.) *Public Administration in a Time of Turbulence* (New York : Intext, 1971)। পরবর্তীকালে বিষয়টির উপর আরও বিশ্লেষণমূলক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন সম্মেলনের অন্যতম অংশগ্রহণকারী জর্জ ফ্রেডারিক্সন। দেখুন George H. Frederickson. *New Public Administration* (Alabama: University of Alabama Press, 1980)।

২. "প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম প্রক্রিয়া" এবং "সরকারী সেবা" শব্দের পূর্ণ অর্থের ব্যাপারে আলোচনার জন্য দেখুন, V. Bogdanor (ed.), *The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions* (Oxford . Blackwell. 1987), পৃঃ ৫০৪-৭।

www.amarboi.org

৩. দেখুন, James M. Elden, "Radical Politics and the Future of Public Administration in the Post-industrial Era", in Dwight Waldo (ed.) *Public Administration in a Time of Turbulence* (New York : Intext.1971).

৪. Robert T. Golembiewski, *Public Administration as a Developing Discipline* 1977. quoted by S. Mohit Bhatta-charya, "Recent Advances in the Discipline of Public Administration," *The Indian Journal of Public Administration.* Vol. XXXV1.No.1.January-March, 1990.

৫. Frank Marini(ed.), *Toward a New Public Administration: A Minnowbrook Perspective* (Seranton: Chandler Publishing Company, 1972).

৬. Frank Marini (ed.), *ঐ*, পৃঃ ৩২৭।

৭. *ঐ*, পৃঃ ৩১২।

৮. Myung See Park, Public Policy : *Emerging Dimensions in Public Administration* (Washington.D.C. : University Press of America Inc., 1979), পৃঃ ৪৯।

৯. দেখুন, Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs*, Second Edition (Englewood Cliffs.N.J. : Prentice-Hall.Inc 1980)। আলোচ্য প্রবন্ধে "সামাজিক সমতা" ও "সামাজিক ন্যায়বিচার" শব্দ গুচ্ছদ্বয়কে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, H.George Frederickson, "Toward a New Public Administration", in Frank Marini (ed.), *প্রাগুক্ত*।

১০. Black's Law Dictionary- এর মতে, সামাজিক সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার সমার্থবোধক শব্দ। সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Cambridge University Press 1971) Ges Abdun Noor, *Social Justice and Human Development* (Dhaka: Adorn Publication,2007).

১১. *-ঐ-*

১২. Frank Marini (ed.), *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০৯।

১৩. দেখুন Felix A, Nigro and Lioyd G Nigro, *Modern Public Administration,* Fifth Edition (New York : Harper and Row Publishers, 1980), পৃঃ ১৭; Nicholas Henry, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯।

১৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Felix.A. Nigro and Lioyd G Nigro, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭-১৮

১৫. *-ঐ-* পৃঃ ১৮।

১৬. E.F.Kelly and R.L. Wettenhall, "Policy Analysis and the New Public Administration: A Review Article", *in Public Administration* (Australia) 32 (December 1973); pp.412-413.

১৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Muhammad Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KP1, 1985), পৃঃ ৩৩১- ৩৪০।

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৮।

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৯।

২০. *প্রাগুক্ত*।

২১. George H.Frederickson. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩।

*The basic goal of Islamic administration is to maximize Islamic values, just as a socialist model seeks to maximize socialist values and a democratic model democratic values. —**Muhammad Al-Buraey***

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*

ভূমিকা

প্রতিটি রাষ্ট্রে সরকারের নীতি ও কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারী ও বিধি-বিধানের একটি সংশ্রয় (Network) সংগঠিত করা প্রয়োজন হয় যা সমষ্টিগতভাবে লোক-প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। Dwight Waldo লোক-প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন সরকারের অভিপ্রায় বা নীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে[১]। অপর এক লোক-প্রশাসনবিদের মতে, লোক-প্রশাসক বা সরকারী আমলাগণ যা করেন তাই হচ্ছে লোক-প্রশাসন[২]। মোটামুটিভাবে বলা যায়, লোক-প্রশাসন হচ্ছে একটি সুসংগঠিত সরকারী কর্মী বাহিনী যারা নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রণীত নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এটি হচ্ছে মূলতঃ সরকারী কর্মচারীদের একটি কাঠামোগত কর্ম-প্রক্রিয়া। লোক-প্রশাসন তত্ত্বের একজন প্রথম সারির উদ্যোক্তা Henri Fayol-এর মতে, লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে বুঝার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এর ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীকে পর্যালোচনা করা। তিনি একটি সংগঠনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পাচঁটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কর্মকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনা প্রদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ [৩]। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ Luther Gulick 1937 সালে প্রণীত একটি রিপোর্টে প্রশাসন প্রক্রিয়ার ৭টি কর্মকান্ডকে তাঁর বিখ্যাত আদ্যক্ষর POSDCORB- এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন [৪]। তবে Fayol, Gulick, Koontz I. O' Dunnel, Kast I. Rosenweig এবং Stephen P. Robbins প্রমুখ লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের মতামত পর্যালোচনা করে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে *প্রধানত* চারটি সমন্বিত কর্মকান্ডের একটি সমষ্টি বলা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ ১) পরিকল্পনা প্রণয়ন; ২) সংগঠিতকরণ; ৩) নেতৃত্ব প্রদান; ও ৪) নিয়ন্ত্রন বা জবাবদিহিতা (সারণি-১)।

পরম্পরাগতভাবে, 'দক্ষতার' (Efficiency) সাথে এবং যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যায়ে' (Economy) সরকারের আইন ও নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় [৫]। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা, ধনী ও গরীবের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান এবং অব্যাহত সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, লোক-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'সামাজিক ন্যায়বিচার'

---

*সৌজন্যে : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৭।

www.amarboi.org

নিশ্চিত করার ব্যাপারে লোক-প্রশাসকদের নৈতিক মানসিকতা গঠনের উপর ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন আন্দোলন" বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে [৬]। উল্লেখ্য যে, ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) কর্তৃক মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত (মানব রচিত প্রথম) সাংবিধানিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজে *আদল* বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা (*আল-কুরআন*, ৫৭: ২৫;১৬: ৯০) [৭]। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে 'স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল) উল্লেখিত "সামাজিক ন্যায়বিচার" [অনুচ্ছেদ ৮ (১)] এবং সরকার পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ৮ (২)]। আলোচ্য প্রবন্ধে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার্থে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার উপরোল্লিখিত ৪টি সমন্বিত কর্মকান্ডে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

উপরিউক্ত সাংবিধানিক ধারাগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, তার আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কার্যাদি সংগঠিত পরিচালিত হবে। H. George Frederickson এর মতে, কোন দেশের লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভিত্তি হওয়া উচিত সে দেশের সংবিধান [৮]। অতএব, আশা করা যায় যে, এজাতীয় আলোচনা বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি প্রতিশ্রুতিশীল, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডসমূহ

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning)

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের লক্ষ কি এবং তা কিভাবে অর্জন করা হবে এ সকল ব্যাপারে আগাম নির্ধারণই হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। *কুরআনে* মহান প্রভু আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবই তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঘটছে (*সূরা হাদীদ*, ৫৭: ২২)। এ ছাড়াও মানুষের উদ্দেশ্য *কুরআনের* স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে : "নিজ নিজ প্রচেষ্টার বাইরে মানুষের কিছুই প্রাপ্য নেই" (*সূরা নজম*, ৫৩ : ৩৯); এবং "আল্লাহ্ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যারা নিজেরাই নিজদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়" (*সূরা রা'দ*, ১৩: ১১)। *কুরআনের* এ সকল আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ মানুষকে উন্নতি লাভ বা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মোদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

www.amarboi.org

সারণি-১
লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া

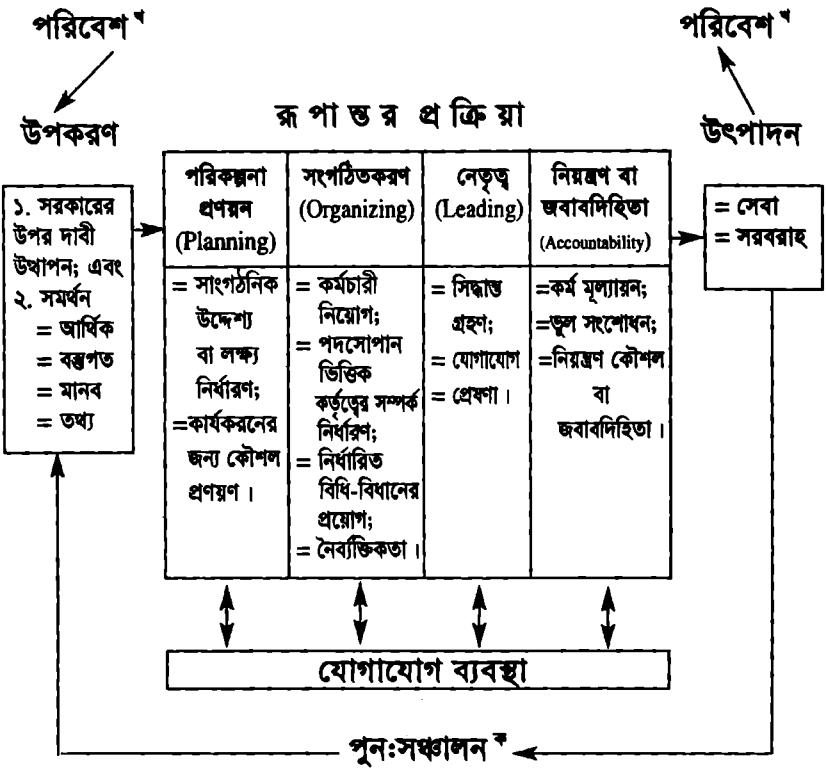

উৎস: অভিযোজিত Ira Sharkansky , *Public Administration : Policy Making in Government Agencies*, Third Edition (Chicago : Rand McNally College Publishing Company, 1975), p.49; Harold K. Koontz, Cyril O' Dunnell and Heinz Weihrich, *Management*, Eighth Edition (Singapore: McGraw-Hill Inc, 1984), p.228; Stephen P. Robbins, The *Aministrative Process : Integrating Theory and Practice* (New Delhi : Prentice Hall of India, 1978), p.55.

নোট : ক. পুন:সঞ্চালন পরিবেশের উপর উৎপাদনের প্রভাবকে পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তিতে উপকরণ সমূহকে উপযোগী করে পুনর্গঠিত করে।

খ. পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে : ১. মক্কেল বা সেবা গ্রহিতা; ২. সেবা ও সরবরাহের ব্যয়; এবং ৩. জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যারা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসকগণ এবং কর্মসূচিগুলোকে সমর্থন প্রদান বা বিরোধিতা করে।

www.amarboi.org

প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী প্রশাসনের প্রধান লক্ষ হচ্ছে সমাজে *আদল* বা 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা। মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেন :

"হে বণি আদম!... বল! আমার প্রতিপালক নির্দেশ করেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার" (*সূরা আ'রাফ*, ৭: ২৭-২৯);

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা, করলে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" (*সূরা সাদ*,৭: ২৬);

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ করছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে" (*সূরা নাহল*, ১৬ : ৯০); এবং

"আমি (আল্লাহ্) রাসূলদের (পথপ্রদর্শক) প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ (পথনির্দেশিকা) যাতে মানুষ (সমাজে নিজেদের মধ্যে) 'ন্যায়বিচার' কায়েম করে" (*সূরা হাদীদ*, ৫৭ : ২৫)।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কর্মসূচীসমূহ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আসবে : ক) সমাজে বসবাসকারী সকলের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা) পূরণ; খ) সমাজ হ'তে দারিদ্র্য *দূরীকরণ*; গ) সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস; এবং ঘ) উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি [৯]। নিম্নে এতদ্সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

ক) মৌলিক চাহিদা পূরণ

একটি কল্যাণকামী সমাজ গঠনের মূল্যবোধের সাথে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণকে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমাজে বসবাসকারী সবার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন : "প্রতিটি আদম সন্তানের তিনটি বিষয়ের উপর অধিকার রয়েছে খাবার জন্য আহার, থাকার জন্য বাসস্থান, এবং পরার জন্য বস্ত্র" (*তিরমিজী*)। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপর *হাদীসটি* হচ্ছে : "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ" (*ইবনে মাযাহ্*)। অতএব, জনগণের এসকল মৌলিক চাহিদা যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা (এবং স্বাস্থ্য ও দাম্পত্য জীবন) অর্থাৎ ইসলামী পরিভাষায় *জরুরতে ছিত্তা* (বা ছয়টি প্রয়োজনীয় বিষয়) পূরণের দায়িত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকারের। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সামাজের সদস্যদের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক প্রতিভার বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়। অতঃপর তারা সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

খ) দারিদ্র্য বিমোচন

ইসলামী সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ হচ্ছে সমাজ হতে দারিদ্র

www.amarboi.org

বিমোচন। ইসলাম নিম্নোক্ত উপায়ে সমাজ হতে দারিদ্র্য বিমোচন বা *দূরীকরণের* নির্দেশ করে :

(১) সমাজের সকল দক্ষ ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং

(২) সমাজের অক্ষম, রোগী, এতিম, বিধবা, ছিন্নমূল অর্থাৎ যারা কাজ করতে অক্ষম, তাদের জন্য সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হযরত মোহাম্মদ (সা:) বলেছেন : "কেউ নির্ভরশীল পোষ্য রেখে মারা গেলে, নির্ভরশীলদের দায়িত্ব আমাদের" এবং "সমাজে যার কোন অবলম্বন নেই, রাষ্ট্রই (সরকার) তার অবলম্বন" (*আবু দাউদ*)। এ জাতীয় পুনর্বাসন কর্মসূচির ব্যয়ভার বহনের জন্য ইসলামী বিধানে প্রতিষ্ঠানিক কৌশল হিসাবে *জাকাত* বা ধনীদের সম্পদের একটি অংশ (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) নির্দিষ্ট করা হয়েছে গরীবদের হক বা প্রাপ্য হিসাবে। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেন : "ধনীদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে সমাজের গরীব ও বঞ্চিতদের" (*সূরা জারিযাত*, ৫১: ১৯)। *জাকাতের* মাধ্যমে গরীবদের প্রাপ্য পরিশোধ ছাড়াও ইসলামে ধনীদের কাছ হতে গরীবদের কাছে সম্পদ হস্তান্তরের কৌশল হিসাবে বিভিন্ন রকমের *ছাদ্‌কা* ও দানকে ধর্মীয় পুণ্য হিসাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

গ) ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাস

ইসলাম মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া বা করা নিষেধ করে এবং ধনী ও গরীবদের মধ্যে সম্পদ পুন:র্বন্টনের আদেশ দেয়। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেন: "তোমাদের মধ্যে শুধু ধনীদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়" (*সূরা হাশর*, ৫৯ : ৭)। এ লক্ষে ইসলামে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি বন্টন, *ওয়াক্‌ফ*, *জাকাত* এবং *ছাদ্‌কা* ইত্যাদির বিধান রয়েছে। বিশিষ্ট উন্নয়ন তত্ত্ববিদ Dudly Seers-এর মতে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে যদি আয়ের কেন্দ্রীভূতিও কমিয়ে আনা যায়, তাহলে দারিদ্র্য *দূরীকরণের* কাজ অনেক বেশী ত্বরান্বিত হবে [১০]।

ঘ) উৎপাদনের উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার

সর্বশেষে, সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ইসলাম ভূমি, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হয়রত ওমরের (রা:) নির্দেশ ছিল, "কারো হাতে পুঁজি থাকলে তা প্রয়োগ করা উচিত, এবং কারো মালিকানাধীন জমি থাকলে তা চাষ করা উচিত"। রাসূল (সা:) বলেছেন, "কেউ জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও একাধিক্রমে তিন বৎসর জমি চাষ না করে পতিত রাখলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত হবে।" পরবর্তীতে ঐ সকল জমি প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনুরূপভাবে, *কুরআনেও* কারো কাছে পুঁজি থাকলে সেটাকে উৎপাদনমুখী ব্যবসায় খাটানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে (*সূরা বাকারা*, ২: ২৭৫)।

www.amarboi.org

উপরোল্লিখিত লক্ষসমূহ অর্জনের জন্য ইসলাম রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বনের সুপারিশ করেছে :

(১) একটি পরিস্রবণ পদ্ধতির (Filter mechanism) সাহায্যে সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর এবং বিলাসী দ্রব্যের আমদানী, উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনা;

(২) সমাজে বসবাসকারী অন্যান্যদের সাথে সম্পদ ভাগাভাগি করে ভোগ করার জন্য একটি প্রেষণা ব্যবস্থা (Motivation system), অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে বা মানুষের কল্যাণে সম্পদের কিয়দংশ উৎসর্গ করাকে ইসলামে ধর্মীয় কর্তব্য বা "পূণ্যের কাজ" (Virtuous deed) হিসাবে উৎসাহিত করে (*সূরা যারিয়াত*. ৫১ : ১৫, ১৯); এবং

৩. জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা (Re-structuring the economy) যাতে একদিকে যেমন মুষ্টিময় ধনীর হাতে সমাজের সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত হতে না পারে; এবং অপরদিকে, সমাজে বসবাসকারী সকল সদস্যের মৌলিক প্রয়োজন ও সমাজের চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদের উৎপাদন সম্ভবপর হয় [১১]।

২. সংগঠিতকরণ (Organizing)

আধুনিক লোক-প্রশাসনের মূলে রয়েছে সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের সংগঠন। ইসলামও আল্লাহ্‌র নির্দেশনা ও রাসূলের (সঃ) তরীকা অনুযায়ী, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুসারীদেরকে সংগঠিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে (*সূরা আল-ইমরান*, ৩: ১০৩)। খলিফা ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন: "কর্তৃত্ব ছাড়া নেতৃত্ব হয় না, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন হয় না এবং সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না"।

একটি যুক্তিযুক্ত সংগঠনের প্রধানত চারটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান থাকে : ক) মেধার ভিত্তিতে কর্মচারীদের নিয়োগ; খ) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের বিন্যাস; গ) কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত আইন বা বিধি-বিধান ; এবং ঘ) নৈর্ব্যক্তিকতা [১২]। এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা নিম্নের আলোচনায় তুলে ধরা হল।

ক. কর্মচারী নিয়োগ

জাতিসংঘের প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের লোক-প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে মেধাভিত্তিক নিয়োগকৃত ও সংগঠিত *ক্যারিয়ার সার্ভিসের* উপযুক্ততা (Competency) ও দক্ষতা [১৩]। কেননা সরকারী কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত অবস্থানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আধুনিক প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের ন্যায় ইসলামও সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র মেধাকেই মানদন্ড হিসেবে গণ্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রশাসনিক দায়িত্ব ও ক্ষমতাকে ইসলামী পরিভাষায় আমানত (Trustee) বলা হয়। তাই

www.amarboi.org

কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে : "আমানত উহার (উপযুক্ত) মালিককে প্রত্যার্পণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করিবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে" (*সূরা নিসা*, ৪: ৫৮)। কর্মচারী নিয়োগের সময় উপযুক্ত বা যোগ্য প্রার্থী থাকলে তাকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করা ইসলাম কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন: "যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কারো বদলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করল, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (*ইবনে তাইমিয়া*)। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে *সিভিল সার্ভেন্টস* বা সরকারী আমলাদের মেধা যাঁচাইয়ের মানদন্ড কেবল তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত দক্ষতাই নয়, উপরন্তু তাঁদের চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং সর্বোপরি, ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতিশীলতাও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। *কুরআনে* উল্লেখ আছে যে, "মজুর (কর্মচারী) হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে 'শক্তিশালী' এবং 'বিশ্বস্ত' (*সূরা কাসাস*, ২৮:২৬)।" ইসলামী গবেষকদের মতে, 'শক্তিশালী' কথাটা সংশ্লিষ্ট পদ বা কর্মের জন্য ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সমার্থক এবং শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা বুঝার ও প্রয়োগের ক্ষমতাকে বুঝায়। অপরদিকে, 'বিশ্বস্ত' প্রত্যয়টি আল্লাহ্র ভীতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাংগঠনিক লক্ষের (ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ) প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা অর্থে বুঝান হয়েছে [১৪]। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, *এ হ্যান্ডবুক অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন* (১৯৬১) গ্রন্থেও সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর মধ্যে সততা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে [১৫]।

ইসলামী প্রশাসনে নিয়োগ নীতির একটি গুরত্বপূর্ণ দিক হল, এখানে সরকারী পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোন পার্থক্য করা হয়না। Professor Montogomery Watt তাঁর সুবিখ্যাত, *The Majesty That Was Islam* নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এবং *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলের কথা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সেসময়ে মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, প্রাদেশিক সচিব ও দেশের প্রধান অর্থনিয়ন্ত্রক ইত্যাদিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতা অনুয়ায়ী অমুসলিমদের নিয়োগ করা হয়েছিল [১৬]।

খ. কর্তৃত্বের পদসোপান

সংগঠনে পদসোপান বলতে কর্মচারীদের উর্ধবতন-অধঃস্তন সম্পর্ককে বুঝায়, এবং কর্তৃত্ব হচ্ছে উর্ধ্বতন কর্তৃক অধঃস্তনকে নির্দেশনা প্রদানের আইনানুগ অধিকার। প্রশাসনিক সংগঠনে নিম্নক্রমিকভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় এবং প্রতিটি অফিসকে উর্ধ্বতন অফিসের নিকট দায়ী রাখা হয়। এমনিভাবে তারা পিরামিড সদৃশ সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে অধিষ্ঠিত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকে।

ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবেও বিবেচিত।

www.amarboi.org

কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে মান্য কর, তাঁর রাসূলকে মান্য কর এবং মান্য কর তাঁদেরকে যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের স্মরণ লও" (*সূরা নিসা*, ৪: ৫৯)। অতএব, ইসলামী প্রশাসনে বিভিন্ন গ্রেডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। ইসলাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ্‌র (*কুরআনের*) প্রতি এবং রাসূলের (*সুন্নাহর*) প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আদেশ করছে, এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম একই সাথে জনগণকেও উপদেশ দেয় সামাজিক শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নেতৃত্বের 'আইনানুগ ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত সমূহকে' মেনে চলতে [১৭]।

গ. নির্ধারিত আইন

যে কোন যুক্তিযুক্ত সংগঠনে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং বিমূর্ত নীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। সমাজে ন্যায়বিচারের সাথে দ্রব্য ও সেবাসমূহ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রশাসকদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক নীতি-নির্দেশিকা হচ্ছে *শরীয়া* (*সূরা নিসা*, ৪: ৫৯, এবং *সূরা হাশর*, ৫৯: ৭, ১০৫)। *শরীয়া* হচ্ছে মহান প্রভু আল্লাহ্‌র *কুরআন;* রাসূলের *সুন্নাহ* ও *ইজতিহাদ* (নৈতিক বিবেচনা) -এর সমষ্টি [১৮]। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মোয়াজ ইব্‌নে জাবালকে ইয়ামেন প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগের পর মদীনা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিভাবে তিনি (মোয়াজ) প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। "কুরআনের পথ নির্দেশনা অনুযায়ী", মোয়াজ জবাবে বলেছিলেন। "কিন্তু তুমি যদি তথায় কোন সমাধান না পাও"? "তাহলে আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাহ্ মোতাবেক "। "সেখানেও যদি কোন সমাধান না মিলে"? "বেশ ! সে অবস্থায় আমি নিজের বিবেকবুদ্ধি (বা নৈতিক বিবেচনা) অনুসারে ফয়সালা করব" । এতে রাসূল (সঃ) এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি মোয়াজকে বুকে জড়িয়ে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন [১৯]। এভাবে ইসলামী *শরীয়া* শাসনতান্ত্রিক মৌল নীতিমালার ন্যায় মানুষের জন্য প্রশাসনিক আইনের একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করে এবং সময় বা এলাকার দাবী অনুযায়ী সবিস্তারের জন্য তাদের উপর স্ববিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করে (অবশ্য *শরীয়া* নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে) [২০]। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের ন্যায় আধুনিক যুগের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও *শরীয়ার* প্রয়োগ উপযোগিতার ব্যাপারে S.M.at. Tamawi বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী হওয়ার কারণে, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কার্যকারিতার ব্যাপারে আস্থাহীন বা সন্দেহপ্রবণ আরবের একটি মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পুণর্গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে সমসাময়িককালের দু'জন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। Luther Gulick এবং James Pollock

www.amarboi.org

নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উক্ত আমেরিকান বিশেষজ্ঞদ্বয় ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন : "Islamic culture is one of the best bases for a strong and successful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times",অর্থাৎ 'ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিত্তি' [২১]। তাঁরা আরও লিখেছেন : "The *Shari'ah* offers the Egyptians the basic principles and elements upon which they can erect their new democracy and use their leadership qualities, citizen's involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery, and private and public wealth in the best interest of the nation as a whole",অর্থাৎ '*শরীয়া* আইন মিশরীয়দেরকে তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রশাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে' [২২]।

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এই সাক্ষ্য শুধু মিশর নয়, অপরাপর সকল মুসলিম দেশের কর্মকর্তাদেরকে নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং নৈতিক আচরণের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ দেশের নয়া প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে [২৩]।

ঘ. নৈর্ব্যক্তিকতা

যে কোন যুক্তিযুক্ত সংগঠনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নৈর্ব্যক্তিকতা। আমলাতন্ত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা হচ্ছে এর বস্তুনিষ্ঠতা এবং নির্ধারিত বিধান বা নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ--কারো খেয়াল-খুশী, ইচ্ছা বা পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে নয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, সরকারী আমলা বা কর্মচারীগণ নির্ধারিত বিধান বা আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। কারো প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি অথবা বিদ্বেষ পরিহার করার জন্য তাদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। *কুরআনে* আল্লাহ্ আদেশ করছেন:

> "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সত্য সাক্ষ্য দাও, এমনকি তা যদি তোমার নিজের, প্রিয়জনদের বা পিতামাতার বিরুদ্ধেও যায়। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে কামনার অনুগামী হইও না। তোমরা যাহাই করো না কেন, আল্লাহ্ সবকিছুরই খবর রাখেন" (*সূরা নিসা* ৪: ১৩৫);
>
> "কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার হতে বিচ্যুত না করে। ন্যায়বিচার কর, কেননা এটাই আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর" (*সূরা মাঈদা*, ৫:৮); এবং
>
> "তোমরা ন্যায়সংগতভাবে পরিমাপ করবে এবং লোকদিগকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না" (*সূরা হুদ*, ১১:৮৫)।

www.amarboi.org

ইসলামী সমাজে সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা–সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতি ও মূল্যবোধ কঠোরভাবে মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা যুক্তিযুক্ত আমলাতন্ত্রের (Rational bureaucracy) সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত প্রশাসনিক নৈর্ব্যক্তিকতার কথা ইসলাম বলেছে সেই সপ্তম শতকে। ইসলাম শুধু নৈর্ব্যক্তিকতার কথাই বলেনি, হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবদ্দশায় এবং *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে, মদীনা রাষ্ট্রে তার পূর্ণ বিকাশ, প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন ঘটেছিল।

৩. নেতৃত্ব প্রদান (Leading)

সংগঠনে প্রত্যাশিত বা কাঙ্খিত লক্ষ অর্জনের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বা প্রভাবিতকরণের একটি সফল প্রক্রিয়া হচ্ছে নেতৃত্ব। লোক-প্রশাসন সাহিত্যে নেতৃত্বের যে কয়টি ধরণ (Style) রয়েছে সেগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১) স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic); ২) গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক (Democratic); এবং ৩) অবাধ (Laissez-faire) নেতৃত্ব [২৪]। লোক-প্রশাসন পন্ডিতদের প্রায় সবাই গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কাম্যতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সাংগঠনিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারনের ক্ষেত্রে অনুসারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং ধারণা করা হয় যে, এতে কর্মচারীরা সংগঠনের প্রতি একাত্মবোধ করে এবং ফলে, কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের একাগ্রতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম আল্লাহ্ এবং রাসূলের পর সমাজের বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকা এবং কর্তৃপক্ষের আইনানুগ সকল সিদ্ধান্তকে মেনে চলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় (*আল-কুরআন*, ৪: ৪৯)। অপরদিকে, প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের প্রতিও অনুসারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে [২৫]। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেন: *"ওয়া আমরুহুম শূ'রা বাইনাহুম"* অর্থাৎ '(তোমরা) নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পরার্শের মাধ্যমে', (*সূরা শুরা*, ৪২ : ৩৮; আরও দেখুন *সূরা আল-ইমরান*, ৩:১৫৯)। মোটামোটিভাবে বলা যায়, ইসলামী নেতৃত্ব অনেকটা Professor Rensis Likert বর্ণিত System-4 Management (Participatory Group) -এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইতিহাসে এ ব্যাপারে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় মহানবী (সা:) এবং চার খলিফা গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বদা তাঁদের সংগীদের সাথে আলোচনা-পরামর্শ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথেও পরামর্শ করার নজির রয়েছে তাঁদের শাসনামলে।

৪. নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহিতা (Accountability)

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বা সর্বশেষ পর্যায়টি হল মূল্যায়ন বা জবাবদিহিতা। নিয়ন্ত্রণ বা দায়িত্বশীলতা হিসাবেও এটিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক

www.amarboi.org

সরকার ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র সরকারী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে দায়িত্বশীল হবে– এটাই প্রত্যাশিত। প্রশাসনিক কর্মে আমলাদেরকে আচরণে পেশাগত ও নৈতিক মানও বজায় রাখতে হয়। Peter Self-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সরকারী আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে লোক-প্রশাসন সাহিত্যে দু'টি তত্ত্ব প্রচলিত আছে : ক) পদসোপানিক তত্ত্ব; এবং খ) যুক্তি-যুক্ততার তত্ত্ব [২৬]।

পদসোপানিক তত্ত্ব মতে, আমলাতন্ত্রকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি রাখার জন্য কতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন [২৭]। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আইন সভায় প্রশ্নোত্তর, বাজেট অনুমোদন এবং সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পর্যালোচনা ইত্যাদি। কিন্তু উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের সমষ্টিগত জবাবদিহিতার (Collective responsibility) আড়ালে এবং প্রশাসকদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা (Political neutrality) ও বেনামীর (Anonymity) ছদ্মাবরণে, সরকারী আমলাগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে সক্ষম হন। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরিভাবে জনগণের কাছে সরকারী আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, শেষোক্ত তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি এবং নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমনভাবে প্রেষণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও যুক্তি-যুক্ততার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আধুনিক চীন ও ইউরোপের সুইজারল্যান্ড। Farrel Heady তাঁর তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, সুইজারল্যান্ডের আমলাগণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচির মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বলে, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অধিকতর সচেতন। অপরদিকে, চীনা সরকারী কর্মকর্তারা কন্‌ফুসিয়ান দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে, জনগণের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সদাচরণের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী [২৮]। এর বিপরীতে, বাংলাদেশের সরকারী আমলাগণ কোন নৈতিক দর্শন বা অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত নন বলে, তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা ১৯৮৭ সালের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে সরকারী প্রতিবেদনে বেশ উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে[২৯]। অতএব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, সরকারী আমলাদের কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পদসোপানিক তত্ত্ব ও যুক্তি-যুক্ততা তত্ত্বের যৌথ প্রয়োগ অপরিহার্য।

ইসলামী প্রশাসনের জবাবদিহি ব্যবস্থায় উপরের উভয় তত্ত্বের একটি অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহি ব্যবস্থা ত্রি-মাত্রিক : ১) প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট (কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং অধঃস্তনের কার্যকলাপ পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে) জবাবদিহি করা; ২) সরাসরি জনগণের নিকট

www.amarboi.org

জবাবদিহি করা (*দিওয়ান-ই-মাজালিম*-এর মাধ্যমে সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকার বিধান ছাড়াও সরকারী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবা এবং বার্ষিক হজ্বের সম্মেলনে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও উত্তরদান ব্যবস্থার মাধ্যমে); এবং ৩) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করার চেতনা সমুন্নত রাখার মাধ্যমে (*সূরা বাকারা*, ২ : ২০৩, ২৮১; *সূরা নিসা*, ৪ : ৮৭) [৩০]। জনগণের অবস্থা পরিদর্শনকালে ইসলামী প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার বলেছিলেন: "সুদূর তাইগ্রীস নদীর তীরে কোন কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, তা'হলে আল্লাহ্‌র দোহাই, ওমরকে তার জন্য শেষ বিচারের দিন (আল্লাহ্‌র কাছে) জবাবদিহি করতে হবে"। এ জাতীয় চেতনাই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন প্রশাসকের মনে অহর্নিশ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণে ব্রতী হবার তাগিদ সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় আধুনিক ও ইসলামী প্রশাসনের সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা নিম্নের সারণী দু'টিতে তুলে ধরা হল :

সারণি-২
আধুনিক লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া	আধুনিক লোক-প্রশাসন (লক্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গি)	ইসলামী প্রশাসন (লক্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
১. পরিকল্পনা প্রণয়ন	উৎপাদন ও বিতরণ কর্মে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা	ন্যায়বিচার ও কল্যাণ
২. কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ ক) নিয়োগ; খ) পদসোপান; গ) বিধি-বিধান; এবং ঘ) নৈর্ব্যক্তিকতা।	ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা; খ) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য; গ) স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত বিধিমালার প্রয়োগ; এবং ঘ) মূল্য নিরপেক্ষভাবে বিধিমালা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।	ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা; খ) আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ) ও বৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের প্রতি আনুগত্য; গ) আল্লাহ্‌র কুরআন, রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ ও নৈতিক বিবেচনা; এবং ঘ) কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।
৩. নেতৃত্ব	অবস্থা বা ঘটনাচক্রজাত	শূরা বা অংশগ্রহণমূলক
৪। জবাবদিহিতা	পদসোপান ভিত্তিক বা আনুষ্ঠানিক	ক) পদসোপান ভিত্তিক; খ) সরাসরি জনগণের নিকট; গ) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার প্রতি জবাবদিহি করার চেতনা বা নৈতিকতাবোধ।

www.amarboi.org

সারণি-৩
আধুনিক লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের বিশ্ব দর্শন

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	আধুনিক লোক-প্রশাসন	ইসলামী প্রশাসন
১।	আমি কে?	ক্ষমতার/ সরকারের প্রতিনিধি	পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীয় সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক সার্বভৌম আল্লাহ্‌র *খলীফা* বা প্রতিনিধি।
২।	আমার কি করণীয়?	সরকারী নীতির বাস্তবায়নে নির্ধারিত বিধি-বিধানের প্রয়োগ	আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ সাধন।
৩।	প্রশাসনের লক্ষ্য কি ?	দক্ষতা ও স্বল্পব্যয়ে সরকারী নীতির বাস্তবায়ন	সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ।
৪।	আমার অনুগত্য কার প্রতি?	ক্ষমতা / সংগঠন / পেশাগত দলের প্রতি	আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) ও বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারীর প্রতি।
৫।	প্রশাসনিক নেতৃত্বের স্বরূপ কি?	অভিভাবকসুলভ (যেখানে সরকারী আমলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং জনগণ আইন পালন করবে)।	গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে।
৬।	আমলারা কর্মজীবনে কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়?	ব্যক্তি/ শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বারা	ক) মানব কল্যাণার্থে সৎকর্ম সৃষ্টি ও অসৎকর্ম প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন; খ) পার্থিব কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার চেতনা; এবং গ) সৎকর্মের জন্য পরকালে বেহেশ্‌ত এবং অসৎকর্মের জন্য দোযখের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুঁশিয়ারী।

উৎস: Anthony Downs, *Inside Bureaucracy* (Boston : Little Brown and Company,1969) ; Robert D.Miewald, *Public Adiministration : A Critical Perspective* (New York : McGraw Hill, 1978); Yaser M. Adwan and Zahir Kayed, "The Responsiveness of Government Officials to Public Demands : A Comparative Study", *Asian Affairs* 10 (April-June, 1988); আবদুন নুর, "আমলাতন্ত্রের বিশ্ব দর্শন", *মানব উন্নয়ন জার্নাল*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪, ১৯৯১, পৃ: ৪৩ ও ৪৫।

www.amarboi.org

উপসংহার

লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের ইচ্ছা বা নীতিসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের একটি কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রধাণত চারটি সমন্বিত কর্মকান্ডের সমষ্টি : ১. পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশাসন কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ; ২. পরিকল্পনা কার্যকরণের জন্য উপযুক্ত কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ; ৩. কর্মসূচী কার্যকরণের জন্য কর্মচারীদের পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদান; এবং ৪. কর্মচারীদেরকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি ব্যবস্থা।

পরম্পরাগতভাবে, 'দক্ষতার' সাথে এবং যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যয়ে' সরকারের আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নই ছিল লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা, ধনী ও গরীবের ব্যবধান এবং অব্যাহত সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, 'দক্ষতা' ও 'মিতব্যয়িতার' সাথে সাথে, প্রশাসনের মাধ্যমে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার উপর ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত (মানব রচিত প্রথম) সাংবিধানিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ ছিল সমাজে *আদ্‌ল* বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তবে "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলনে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কারণে হলেও ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের নির্দেশ শাশ্বত। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে : ক) সমাজে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ; খ) সমাজ হতে দারিদ্র্য দূরীকরণ; গ) উৎপাদনের উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি; এবং (ঘ) সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস।

উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য লোক-প্রশাসন অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী সংগঠনে লোক নিয়োগের ভিত্তি হবে মেধা। কিন্তু ইসলামের দৃষ্ঠিতে সরকারী আমলাদের মেধা যাঁচাইয়ের মানদন্ড কেবল তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত দক্ষতার উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না। উপরন্তু, তাদের চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সর্বোপরি, ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতাও বিবেচ্য বিষয়। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ্, রাসূল (সা:) ও বৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত -এই তিন স্তরবিশিষ্ট কর্তৃত্ব কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। সমাজে ন্যায়বিচারের সাথে দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কারো প্রতি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অনুরাগ বা বিরাগ নয়, বরং সরকারী আমলাদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক পথ নির্দেশিকা হচ্ছে মহাগ্রন্থ *আল-কুরআনের* বিশ্বজনীন নীতি ও রাসূল (সঃ)-এর *সুন্নাহ্* এবং *কুরআন* ও *সুন্নাহ্‌র* আলোকে *ইজতিহাদ* (নৈতিক বিবেচনা)।

www.amarboi.org

ইসলামী প্রশাসনে নেতৃত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ। আধুনিক লোক-প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি করার জন্য শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নিরেপেক্ষতা ও বেনামীর ছদ্মাবরণে, আধুনিক ব্যবস্থায় সরকারী আমলাদেরকে সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের জন্য জবাবদিহি ব্যবস্থা ত্রি-মাত্রিক: (ক) প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি থাকা; (খ) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা; এবং গ) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করার চেতনা মনে জাগরূক রাখার মাধ্যমে। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার উপরিউক্ত নীতিমালা শুধু তত্ত্বই নয়, এসবের পূর্ণ বিকাশ, প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবদ্দশায় এবং *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে সপ্তম শতাব্দীর মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায়।

তথ্যসূত্র

১. Dwight Waldo, "The Study of Public *Administration*" in Richard Stillman (ed.), *Public Administration : Concepts and Cases,* Second Edition (Boston : Houghton Mifflin Company, 1780), p.4.

২. Gerald E. Caiden, *The Dynamics of Public Administration* (New York : Holt Rinehart and Winston,1949), p vii.

৩. Henri Fayol, *General and Industrial Management,* Constance Storrs translated (London : Pitman, 1949), pp, 43-107.

৪. Luther Gulick and L. Urwick (eds.) *Papers on the Science of Adminisration* (New York : Institute of Public Administration, 1937), p.13.

৫. *ঐ*, পৃ : ১৯২।

৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Frank Marini (ed.), *Towards A New Public Administration : A Minnowbrook Perspective* (Seranton : Chandler Publishing Company, 1972)। এ ছাড়াও জাতিসংঘের লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'জনস্বার্থ সংরক্ষণ' বা জনগণের কল্যাণ সাধন করা। দেখুন, United Nation, *A Handbook of Public Administration,* বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ: ১৬, ১৮ ও ২৪। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে 'জনস্বার্থের' ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে। 'জনস্বার্থের' দার্শনিক ভিত্তি বা কর্মকাঠামো কি হবে? বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ D.K.Hart ১৯৭৪ সালে *Public Administration Review* -তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জনস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোক-প্রশাসন কর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত John Rawls কর্তৃক প্রবর্তিত "সামাজিক ন্যায়বিচারের " নীতিমালা, যেখানে ন্যায়বিচারকে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সাধারণ সুবিধার্থে অবদান ভিত্তিক বিনিময়/ পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে একটি জটিল মিশ্রণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, D.K. Hart, "Social Epuity, Justice and the Equitable

www.amarboi.org

Administration", *in Public Administration Review* 34 (1974), pp.3-10.

৭. ইসলামী প্রশাসনের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন *A Classic Administration Policy Letter of Hazrat Ali (RA),* Department of Forms and Stationeries, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1976.

৮. H. George Frederickson,"Towards A Theory of the Public for Public Administration", in *Administration and Society* 22(1991), p. 408.

৯. ইসলামে "সামাজিক ন্যায়বিচার" বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের *Social Justice in Bangladesh : An Islamic Perspective* (Chittagong : Liberty Forum,1991); এবং "Outlining Social Justice From Comparative Perspective : An Exploration", বিগত ১৯ ও ২০ শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইংরেজী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ; এবং *Social Justice and Human Development* (Dhaka : Adorn Publication 2007)।

১০. Dudley Seers, "The Meaning of Development": *International Development Review,* Vol. II, No. 4, 1964.

১১. ডঃ এম ওমর চাপরা "নতুন অর্থ ব্যবস্থার সন্ধানে" *ইসলামী ব্যাংকিং*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী।

১২. Peter M. Blau and Marshall W. Meyer, *Bureaucracy in Modern Society* (New York : Random House, 1971). pp.8-9.

১৩. United Nations, *A Handbook of Public Administration,* 1961, p.34.

১৪. দেখুন, Ibnomer Mohammed Sharfuddin, "Towards An Islamic Administrative Theory" in *The American Journal of Islamic Social Sciences,* Vol . 4, December, 1987, p.233.

১৫. জাতিসংঘ, *A Handbook of Public Administration,*মোহাম্মদ শামসুর রহমান অনূদিত, *লোক প্রশাসন সার* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯), পৃ:৫০।

১৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Montogomery Watt, *The Majesty That Was Islam* (London : Sidgwick and Jackson Ltd, 1974), pp.44-54.

১৭. Muhammad Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KPI,1985), p. 359.

১৮. *শরীয়া* বা ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎসের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "ইসলামী আইনের (*শরীয়া*) উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলী", *জার্ণাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভল্যুম ৪-৫, সংখ্যা-১(১৯৯৮-৯৯), পৃঃ ৬০-৭৫,

১৯. Sayed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London : Christopher, 1961), p.183.

২০. Muhammad Al-Buraey, *op.cit.,p.239.*

২১. Luther Gulick and James Pollock, "The Organization of Governmet Administration of the United Arab Republic (Egypt)", quoted by Sulaiman M. at-Tamawi, *Umar Ibn al-Khattab Wa usul as-Siyasah wal Idarah* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1969),pp.10-11.

২২. *ঐ*।

www.amarboi.org

২৩. Al-Buraey, *op.cit.,pp.*239-240.

২৪. Felix A. Nigro and Lioyd G. Nigro, *Modern Public Administration* (New York: Harper and Row Publishes, 1980),p.271.

২৫. ইসলামী প্রশাসনে নেতৃত্বের যোগ্যতা, পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Mahammad Anisuzzaman and Md. Zainul Abedin Majamder, *Leadirship : Western and Islamic* (Dhaka : BIIT, 1996).

২৬. Peter Self, *Administrative Theories and Polities : An Inquriy into the Structure and Process of Modern Government* (London :George Allen And Unwin Ltd. 1975),p.229.

২৭. Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy : A Comparative Perspective* (New York: : Longman, 1978), p.20-21. একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি করার প্রাতিষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Abunasar Shamsul Hoq, *Administrative Reform in Pakistan* (Dacca : Natinal Institute of Public Administration, 1970), pp.267-288; Ali Ahmed, *Basic Principles and Pactices of Administrative Organization : Bangladesh* (Dacca : NILG, 1981), pp. 170-195.

২৮. Farrel Heady, *Public Administration : A Comparative Perspective,* 3r ed. (New York : Marcel Dekker, 1984), পৃ: 66.

২৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, *বাৎসরিক প্রতিবেদন,* ১৯৮৮,সারণী ৬, পৃ :২১ ।

৩০. বিস্তারিত আলোজচনার জন্য দেখুন, লেখকের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ *Social Justice and Human Development* (Dhaka : Adorn Publications, 2007).

www.amarboi.org

www.amarboi.org

মহানবী (সাঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা*
(৬২৩-৬৩২ খ্রিঃ)

ভূমিকা

রহ্‌মাতুলি-ল আ'লামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধুমাত্র একজন নবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মহান রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয় সংস্থার পরিচালক [১]। তাঁর জীবন সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। গোত্র কলহে লিপ্ত যাযাবর ও মরুবাসী আরববাসীদেরকে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সংগঠনি ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে একই সূত্রে গ্রথিত করে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তিনি গোড়া পত্তন করেন একটি 'উম্মাহ্' ভিত্তিক রাষ্ট্রের। এর মাধ্যমে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল্লাহ্‌র প্রভূত্ব ও মানবিক সাম্য। *শির্‌কের* সকল চিহ্ন মূলোৎপাটিত হয়েছিল সমাজের অংগন হতে। অবসান হয়েছিল মানুষের উপর মানুষের বা কৃত্রিম প্রভূত্বের। মানুষ স্বাদ পেয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার, ফিরে পেয়েছিল মানুষ হিসাবে বিকশিত হবার সকল প্রকারের মৌলিক অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন ও ন্যায়ের শাসন। শাসক পরিণত হয়েছিল জনগণের সেবকে। মানুষের নিরাপত্তা ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্র। সমাজে নারীরা প্রথমবারের মত পেয়েছিল মর্যাদার আসন। রচিত হয়েছিল ক্রীতদাস ও দাসীদেরও মুক্তির সোপান। সমাজ হতে শোষণের হাতিয়ার *রিবা* বা সুদ উচ্ছেদ হয়ে তদস্থলে প্রবর্তিত হয়েছিল জনকল্যাণমুখী *জাকাত* ব্যবস্থা। ধনী ও দরিদ্রের আকাশ-কুসুম পার্থক্য হয়েছিল সংকুচিত। মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং। মহান আল্লাহ্ *ওহীর* মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ করতে থাকেন। আর মহানবী (সাঃ) তাঁর সাথীদের সাথে *শূরা* বা পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেইসব বিধি-বিধান কার্যকর করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটি সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা [২]। ঐতিহাসিকদের মতে, রসুলাল্লা (সাঃ) প্রবর্তীত মদীনার রাষ্ট্রটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবিধানিক সরকার এবং সর্বোত্তম জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই এই রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটেছিল মদীনা শহর ছাড়িয়ে আরবের প্রায় ১৯ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে [৩]। রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক সামাজিক চুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বক্ষ্যমান নিবন্ধে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দিক ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

*সৌজন্যে : *Journal of Islamic Adminitration,* No-1,Winter 1995. নিবন্ধটি মাস্টার্স শ্রেণীর ছাত্র (বর্তমানে ব্যাংক কর্মকর্তা) বাবর হোসাইন সিদ্দিকীর সাথে যৌথভাবে লিখিত।

www.amarboi.org

মহানবীর সময়কালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মহানবী (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র তথা এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া প্রয়োজন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহ্‌র দুই মহান নবী যীশু (হযরত ঈসা আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আগমন ঘটেনি। ইসলামে এই সময়টাকে *আইয়ামে জাহেলিয়া* বা 'মূর্খতার যুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা ইসলামী 'জ্ঞান ও আলোর' যুগের বিপরীত। জাহেলী যুগে আরবরা দুই বৃহৎ অংশে বিভক্ত ছিল [৪]। প্রথম অংশে ছিল মরুবাসী বেদুইন। মধ্য আরবে ছিল এদের বসবাস। এদের নির্দিষ্ট কোন বসতি ছিল না। এরা তাদের উট, মেষ ও ঘোড়া চারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ খোঁজার উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এদের জীবন যাপন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। এরা ছিল শক্তিশালী, উদ্যমী ও অতিথিপরায়ন। আরবদের অপর অংশটি আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। যাযাবর বেদুইনদের তুলনায় এরা সভ্যতার দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর ছিল। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল এবং বৎসরে দু'বার বাণিজ্য সফর করত। বাণিজ্য সফরে তারা শীতের সময় ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে, আর গ্রীষ্মকালে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার প্রধান প্রধান শহর ও নগরসমূহে গমন করত [৫]।

যাযাবর আরবরা পরিবার, গোত্র, দল ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক পরিবার, দল ও গোত্রের একজন প্রধান বা নেতা ছিল। পূর্বপুরুষদের নামানুসারে পরিবার ও গোত্রের নামকরণ করা হত। এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ আবদুল করিম বলেন, "গোত্রের বন্ধনই ছিল আরবদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। গোত্রই তাদের সরকার এবং গোত্র প্রধানই ছিল তাদের সরকার প্রধান। এই সূত্রে গোত্রই ছিল সার্বভৌম এবং গোত্রের প্রতিই তাদের আনুগত্য থাকত। গোত্রের বাইরে একসাথে বসবাস করা আরবের সমসাময়িক অবস্থায় সম্ভব ছিল না" [৬]। বয়স, ব্যক্তিত্ব, সততা, প্রজ্ঞা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে গোত্রীয় প্রধান নির্বাচিত হতেন। সুতরাং বেদুইনদের সামাজিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের মৌলিক ইউনিট ছিল গোত্র যার ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক। এস.এ.কিউ.হোসাইনী -এর মতে, সাধারণভাবে আরব এবং বিশেষভাবে বেদুইনরা আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রী ছিল। তারা দলীয় প্রধান নির্বাচনে অংশ নিত, কিন্তু তার আরোপিত (স্বেচ্ছাচারী) শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করত না। দলীয় প্রধান সাধারণতঃ প্রবীণ ও জ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিলের সম্মুখে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন। আগেই বলা হয়েছে যে, আরবদের জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তাই তারা কোন আনুষ্ঠানিক সরকার, প্রশাসন, অফিস ও নিয়মিত অফিস কর্মকর্তা ইত্যাদির ব্যাপারে তেমন মনযোগী ছিল না।

অন্যদিকে, শহরবাসী আরবদের নগর-রাষ্ট্র ভিত্তিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল, ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি। সে সময়কার ঐতিহাসিকদের মতে, "মক্কার আদিবাসীদের একটি সিটি

www.amarboi.org

হল (City Hall) ছিল যার নাম ছিল *দারুন নদ্ওয়া* (সম্মেলন কক্ষ)[৭]। নেতৃস্থানীয় ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কার্যাবলী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্য সেখানে মিলিত হতেন। এছাড়াও তাদের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ এজাতীয় ২১টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন, যথাঃ ১) *নদ্ওয়া; ২) মশওরা ৩) কিয়াদাহ্; ৪) সেদানা; ৫) হিযাবা; ৬) সেকায়া; ৭) ইমারাতুল বাইত; ৮) ইফাদা; ৯) ইজাজাহ্; ১০) নসি; ১১) কুব্বা; ১২) আল্লাহ; ১৩) রিফাদাহ; ১৪) আমওয়ালে মাহ্জরা; ১৫) ই'সার; ১৬) এশনাক; ১৭) হুকুমাহ্; ১৮) সেফারা; ১৯) ইকাব; ২০) বুয়া'; এবং ২১) হিলওয়া নুন নফর*[৮]।

মক্কার অভিজাত পরিবারসমূহ কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করত। এসবের মধ্যে ছিল পর্যটক ও হাজীদের সেবা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ। এসকল সেবামূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা মদীনার মধ্যদিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে কর আদায় করতেন।

মহানবী (সা:) এই মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও গোত্রীয় প্রথা অটুট রেখে একই *উম্মাহ্* বা জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে সূচনা করেছিলেন আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক একটি এককেন্দ্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের।

মদীনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি

মহানবী (সা:) -এর জীবন সাধনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত ছিল, মক্কা হতে মদীনায় *হিজরত*। এই *হিজরত* উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসকেই শুধু বদলে দেয়নি, ইসলামের বিকাশেও একটি বিশেষ পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যীশু খ্রিষ্টের মৃত্যুর ৬২২ বৎসর পর, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁর মাতৃভূমি মক্কানগরী ছেড়ে মদীনায় *হিজরত* করেন। তৎকালীন মদীনায় *মুহাযির* এবং *আনসার* ছাড়াও অনেক ইহুদী বসবাস করত। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে সময়ে মদীনায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। যথাঃ ১) মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়; ২) বিদেশী ইহুদী সম্প্রদায়; এবং ৩) নব দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়[৯]। এদের কারো সাথে কারো আদর্শের কোন মিল ছিল না, বরং তার উপর ছিল দলগত হিংসা ও বিদ্বেষ। এ সকল বিভিন্ন গোত্র এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকদের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপনের জন্য রাসূল (সা:) প্রাথমিকভাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা একখানি দলীলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ওটাকেই *কিতাব-উর-রাসূল* বা রাসূল (সা:) এর কিতাব বা দলীল বলা হয়[১০]। এই দলীলই ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক মদীনা সনদ নামে পরিচিত। Reuben Levy-এর মতে, এই মদীনা সনদের মধ্যেই নিহিত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ[১১]। এই সনদের মাধ্যমেই গোড়াপত্তন হয় ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী, একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় চারটি উপাদানের ঃ ১) একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড; ২) একটি জনগোষ্ঠী; ৩) সার্বভৌম সরকার; এবং ৪) রাজনৈতিক সমন্বয় বা জনগণের মধ্যে

www.amarboi.org

একাত্মবোধ। মহানবী (সা:) -এর হিযরতের সময় মদীনায় ভূখন্ড এবং জনগোষ্ঠী ছিল, কিন্তু কোন সরকার ছিল না এবং জনগণের মধ্যে একাত্মবোধেরও অভাব ছিল। মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক এই *কিতাব* (সনদ) জারী করার ফলে, তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সনদের শর্তানুযায়ী, মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সবাই মিলে একই *উম্মাহ্* বা জাতিতে পরিণত হয়। এই *উম্মাহ্* শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল না, ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারেও। এতে বুঝা যায় যে, এখানে *উম্মাহ্* শব্দটি নাগরিক অর্থাৎ নাগরিকদের একত্মবোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে, এই সনদের (সংবিধান) মাধ্যমে মদীনায় যে প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে, মুহাম্মদ (সা:) হয়েছিল সেই সরকারের প্রধান।

মহানবী (সা:) কর্তৃক রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক ভিত্তি

মহানবী (সা:) কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে মদীনা সনদ জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে *উম্মাহ্* ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের ঘটনাকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক প্রয়োজন বা সে সময়কার পরিস্থিতিজনিত উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এর পেছনে যে যৌক্তিক কারণ ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা *কুরআনের* বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট। রাসূল (সা:)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামকে মানবজাতির জন্য জীবন বিধান হিসাবে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছেন (*আল-কুরআন,৮৪৫*)। মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড যথা- রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি আল্লাহ্র আনুগত্য তথা *শরীয়া* আইনের কাঠামোয় পরিচালনার জন্য ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হেদায়েতের পথে আহ্বানের জন্য। তাঁরা কেউ কখনও নতুন সমাজ গঠন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হননি। কিন্তু হযরত (সা:) প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য *রহ্মাতুল্লিল আ'লামীন* হিসাবে (*আল-কুরআন,৩৪৪২৮*)। পূর্বের নবীগণের দায়িত্ব ছিল শুধু মানুষকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে আহবান জানানোর। এসকল সাধারণ বিষয় ছাড়াও মহানবী (সা:)-কে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার (*আল-কুরআন,৪২৪১৫*); মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান ও অসৎকর্ম প্রতিহত করার (*আল-কুরআন,৩ ঃ ১১০*); এবং মানুষকে অধীনস্থ রাখার সকল ধরণের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্র প্রভুত্বে সবার জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার (*আল-কুরআন,৭ঃ ১৫৭; ১৭ঃ ৩৩; ৪ঃ ২৯; ৪৯ ঃ ১১-১৩*)।

সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্ম প্রতিহতকরণ এবং মানবমুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন সামাজিক কর্তৃত্বের, অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মীদের সংগঠিতকরন এবং নেতৃত্ব বা নির্দেশনা প্রদানের অধিকার। অতএব, আল্লাহ্র আনুগত্যের ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজে

www.amarboi.org

উপরোল্লিখিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন প্রক্রিয়ায় রাসূল (সা:) প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা। এ ছাড়াও কলেমার প্রথম উচ্চারণ "লা" শব্দের মাধ্যমে সকল ধরনের কৃত্রিম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিদ্রোহ এবং "ইল্লাল্লাহ্"-এর আনুগত্যে গঠিত জীবন ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সামরিক কাঠামো, যা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্ভব।

মহানবী (সা:)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা

হযরত (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। উক্ত রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইনই রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে মহানবী (সা:) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিক সাধারণের মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতেন। । জরুরী পরিস্থিতিতে তিনি জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন [১২]। হয়রত (সা:)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও সরলতা। প্রাথমিক অবস্থায় স্থায়ী কোন অফিস বা নিয়মিত বেতনভূক্ত কোন কর্মচারী ব্যবস্থা ছিলনা। সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র ছিল মস্‌জিদ। এতে হযরত (সা:) বসবাস করতেন, প্রার্থনা করতেন, উপদেশ প্রদান করতেন, সাক্ষাৎপ্রার্থী ও বিদেশী পর্যটকদের সাথে দেখা করতেন, সমাজের কার্যক্রম সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সমসাময়িক রাজা, সম্রাট ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরণের জন্য পত্রাদি রচনা করতেন। তাই বলা যায়, তখন সম্পূর্ণ অর্থে না হলেও *দিওয়ান* বা বিভাগীয় অনেক কার্যাবলী অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদন করা হত [১৩]। নিম্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক-প্রশাসনের আলোকে মহানবী (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র । কুর*আনে* ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কারো আদেশ বা আধিপত্য নাই" [১৪]। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ এই যে, যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পিত হবে তারা হবেন আল্লাহ্‌র আইনের অধীন। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্যই যুগে যুগে রাসূলগণের আগমন। মদীনা সনদ অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রে মুহাম্মদ (সা:) -এর সার্বিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই কর্তৃত্ব সার্বভৌম আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মধ্যে এজাতীয় বিভাজন সম্পর্কে বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বোদিন,[১৫] অষ্টিন [১৬] ও হব্‌স [১৭] একই অভিমত পোষণ করেছে। হব্‌স এর ভাষায় : "The Ruler was above his own laws but under God's or under the law of nature" [১৮]। হযরত (সা:)-এর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থনে হোসাইনীর মন্তব্য হচ্ছে : "He regulated social relations, he raised armies and commanded them, he acquired territories and adminis-

www.amarboi.org

tered them" [১৯]। প্রকৃতপক্ষে, মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌ই ছিলেন আইনত সার্বভৌম কিন্তু মহানবী (সা:) ছিলেন কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ।

সরকারী কর্মচারী ব্যবস্থা

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরতের (সা:) সময়ে কোন স্থায়ী ও বেতনভূক কর্মচারী প্রশাসন ছিল না। তবে মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য হয়রত (সা:) নিয়োজিত করেছিলেন তিন ধরনের সরকারী কর্মচারী, যথা ঃ ১) *আল-ওয়ালী* (গভর্নর); ২) *আল-আমিল* (কর আদায়কারী); এবং ৩) *আল-কাজী* (বিচারক)। এভাবে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার সংগঠনে কর্ম বিভাজন নীতির প্রবর্তন করেন (সারণি-১ ও ২)।

সারণি-১
মহানবী (সা:) প্রবর্তিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

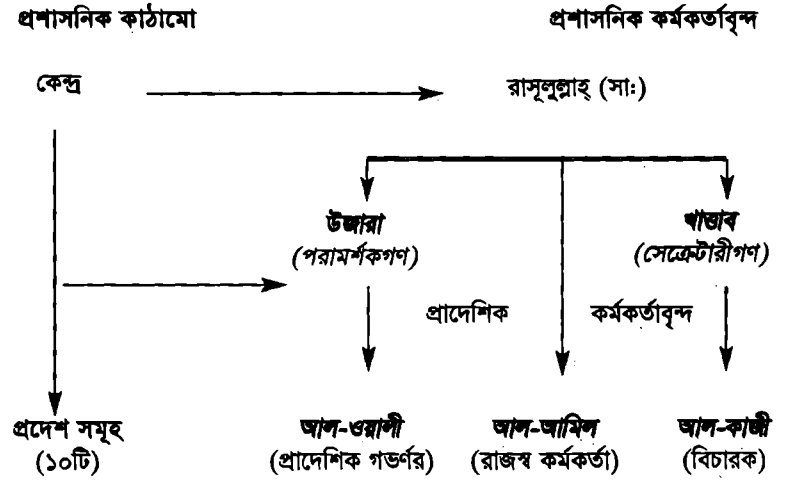

উৎস : Mohammad Al-Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective (London: KPI, Ltd., 1985)*, পৃঃ ২৪০-২৪৬ ; এবং *Journal of Islamic Administration*, Vol.1. No.1, Winter 1995, পৃঃ ১১২-১২৮।

www.amarboi.org

সারণি-২
মহানবী (সাঃ)-এর সচিবালয়

মহানবী (সাঃ) স্বয়ং (ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি)	
দপ্তর সমূহ	**সচিবালয় (মসৃজিদ-ই-নববি) সচিবগণ**
আল্লাহ্‌র ওহী (প্রত্যাদেশ) সমূহ লিপিবদ্ধকরণ	হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) (তাঁদের অনুপস্থিতিতে উবাই-বিন-কা'ব ও জাবেদ- বিন-তাবিত)
জাকাত ও *সাদ্‌কা* হতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ	আল জুহাইম-বিন-আল-সাত এবং আল-জুবাইর বিন আল- আওয়া'ম
খেজুর হতে সম্ভাব্য আয়ের হিসাব তৈরী	হুদ'ইফা বিন-আল-ইয়ামন
জনগণের মধ্যকার যোগাযোগ রেকর্ড	আল-মুগীরাহ বিন-সুআইব এবং আল-হাছান-বিন-নামির
বিভিন্ন গোত্র ও তাদের পানির হিসাব সংরক্ষণ (এছাড়াও এই দপ্তরে আনছার, পুরুষ ও মহিলাদের রেকর্ড রাখা হত)	আবদুল-াহ- বিন-আল-আরকাম এবং আলা বিন-উখবাহ্
রাজন্যবর্গ ও গোত্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠির খসড়া তৈরী *	জায়েদ-বিন-তাবিত এবং আবদুল্লাহ-ইব্‌নে আল-আকরাম
রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব সংরক্ষণ	মুয়াকিব-বিন-আবি ফাতিমা
সিলমোহর সংরক্ষণ	হানজালাহ্-বিন আল-রাবী

উৎস ঃ S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Vol. 1 : "Prophet and the Pious Caliphs" (Dacca: S.M. Shahabuddin,1970), p.230; মহানবী (সঃ) এর সচিবালয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Dr.S.A.K. Husaini, *Arab Administration* (Delhi: Idarah-e-Adabiyati, 1976), p. 17-18 এবং Dr. Muhammad Yasin Mazhar Siddique, *Organization of Government Under the Prophet (রূপ)*, বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইঁয়া (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪)।

*পরবর্তীকালে *খোলাফায়ে রা'শেদীন*-এর শাসনামলে *দিওয়ান-ই-ইনসাহ* নামে পৃথক একটি পত্র যোগাযোগ ও নথিপত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয় যা ছিল ইসলামী প্রশাসনের ইতিহাসে প্রথম *দিওয়ান* বা বিভাগ যার গোড়াপত্তন করেছেন স্বয়ং মহানবী (সাঃ)।

www.amarboi.org

১. *আল-ওয়ালী* বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা

মহানবী (সা:) কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনায়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি আরবদেশকে কতগুলো প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ওয়ালীগণ প্রদেশ গুলিতে জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষাদান, ইসলামের প্রচার এবং আইনের শাসন তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। মদীনা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বয়ং মহানবী (সা:)-এর শাসনাধীন ছিল। মদীনা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশগুলো ছিল ঃ তাইমা, আল-জানাদ, বনুকিন্দ, মক্কা, নাজরান, ইয়েমেন, হাজরা-মাউত, উমান এবং বাহ্‌রাইন। ইব্‌নে হিশামের বর্ণনা মতে, যিয়াদ বিন্ লবিত হাজরা-মাউতের, আলী বিন্ আবু তালিব নাজরানের, মুয়ায বিন্ জাবাল ইয়েমেনের, ইয়ালা বিন্ উমাইয়া আল-জানাদের, আলা বিন্ হাযরানী বাহ্‌রাইনের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন [২০]। এছাড়াও ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান তাইমা এবং ইত্তাব ইবনে উসাইদ মক্কার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন [২১]। ওয়ালীর যোগ্যতা ও গুণাগুণের মধ্যে ছিল ইসলামী জ্ঞান, খোদাভীরুতা, সততা, কতর্ব্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা [২২]।

২. *আল-আমিল*

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা এবং ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে, রাষ্ট্রীয় করসমূহ সুষ্ঠুভাবে আদায়ের জন্য মহানবী (সা:) *ওয়ালী* ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বা বড় বড় গোত্রের উপর *আমিল* নিযুক্ত করেছিলেন। *আমিলের* কাজ ছিল নির্দিষ্ট অঞ্চলের মুসলিমদের কাছ থেকে *জাকাত* ও *ছাদ্‌কা* এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধাদি ও নিরাপত্তা ভোগকারী অমুসলিমদের নিকট থেকে *জিজিয়া* নামক নিরাপত্তা কর আদায় করা। *আমিলগণ* উন্নত চরিত্র ও ধর্মপ্রাণ সাহাবীদের মধ্য হতে নিয়োজিত হতেন।

৩. *আল-কাজী*

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থায় তৃতীয় ধরণের কর্মচারী ছিলেন *আল-কাজী* বা বিচারক। মহানবী (সা:) প্রদেশসমূহে *ওয়ালী* ও *আমিলদের* পাশাপাশি একজন বিচারককেও নিয়োগ প্রদান করতেন। *কাজীগণ ওয়ালী* বা প্রাদেশিক গভর্নরের নিয়ন্ত্রন থেকে স্বাধীন ছিলেন এবং সরাসরি মহানবী (সা:)-এর নিকট রিপোর্ট করতেন। মহানবী (সা:)-ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। তিনি মদীনার মসজিদে বসে রাজকার্যের সাথে সাথে বিচারকার্যও পর্যবেক্ষণ করতেন। বিচারক পদের জন্য যোগ্যতা ও গুণাগুণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। বিচারকদের বিশেষভাবে *কুরআন* ও *হাদীসের ফকীহ্* বা আইনের জ্ঞানসম্পন্ন এবং একই সাথে, ধর্মীয় ও ন্যায়-বিচার করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হত। কোন কোন সময় বিচারকদেরকে গভর্নরের দায়িত্বও প্রদান করা হত। এছাড়াও তাঁরা *ওয়াক্‌ফ* সম্পত্তি ও নাবালকের বিষয় সম্পত্তিরও দেখাশুনা করতেন। হযরত আলী (রাঃ)

www.amarboi.org

এবং মুয়ায ইব্নে জাবাল (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ রাসূল (সা:)কর্তৃক বিচারপতি নিয়োজিত হওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন [২৩]।

রাজস্ব ব্যবস্থা

হযরত (সা:)-এর শাসনকালে মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয় দেখাশুনার জন্য কোন অর্থ বিভাগ বা *ট্রেজারী* ছিল না। রাজস্ব সংগ্রহের উৎসের মধ্যে ছিল প্রধানতঃ *জাকাত*, দান ও *ছাদ্‌কা*। অতিরিক্ত উৎস সমূহের মধ্যে ছিল ভূমি রাজস্ব (*খারাজ*),ভূমি কর (*ফা'ই*), *গনিমত* ও *জিজিয়া* ইত্যাদি। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হল ঃ

জাকাত

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে, কেবল সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান নাগরিকদেরকেই *জাকাত* দিতে হত। *জাকাত* শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "পবিত্রকরণ"। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে, যে কোন ধরনের বহনযোগ্য বা স্থানান্ত রযোগ্য সম্পদ একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে (*নিসাব*) [২৪] পৌঁছলে, তার উপর দেয় করকে *জাকাত* বলা হয়। সম্পদের রকমারী হিসাব অনুযায়ী, *জাকাতের* জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্পদগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা ঃ ১) খাদ্যশস্য; ২) গৃহপালিত জন্তু; ৩) স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু; এবং ৪) বাণিজ্য দ্রব্য।

কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী, *জাকাত* হতে সংগৃহীত অর্থ আটটি খাতে ব্যয়িত হবে। এই খাতগুলো হচ্ছে ঃ ১) গরীব ও অক্ষমকে সাহায্য প্রদান; ২) অভাবগ্রস্থদের অভাব দূরীকরণ; ৩) *জাকাত* আদায়কারী কর্মচারীদের বেতন প্রদান; ৪) গরীব নওমুসলিমদের ভরন-পোষণ; ৫) দাস ও বন্দী মুক্তি; ৬) ঋণগ্রস্থের সাহায্য; ৭) আল্লাহ্‌র পথে *জিহাদ*; এবং ৮) *মুসাফিরের* সাহায্যার্থে (যারা বিদেশ সফরে অর্থ কৃচ্ছতায় পড়ে)।

দান ও *সদ্‌কাহ*

দান হচ্ছে *ছাদ্‌কা* ও *জাকাতের* ন্যায় দেয় সাহায্য । তবে *জাকাত* হচ্ছে অপরিহার্য, আর দান ও *ছাদ্‌কা* হল ঐচ্ছিক। *কুরআনের* বিভিন্ন আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে *জাকাত* ও *ছাদ্‌কা* প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে [২৫]। উক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য আট শ্রেণীর প্রাপকের বিষয়েও কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে। তারা হচ্ছে ঃ নিকট আত্মীয়, অনাথ ও এতিম শিশু, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, ভিক্ষুক, বন্দীমুক্তির জন্য দেয় পণ, জিহাদে অংশগ্রহণকারী এবং অভাবে সাহায্যপ্রার্থী অথচ লজ্জাবশতঃ তা প্রকাশ করেনা। দান ও *ছাদ্‌কা* প্রদান সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ *আমালুস্ সালেহ্* বা পূণ্যকর্ম হিসাবে বিবেচিত।

www.amarboi.org

আল-খারায

রাজস্ব আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল *আল-খারায* বা ভূমি রাজস্ব। অমুসলিম কৃষি প্রজাদের উপর মুহাম্মদ (সা:) এই কর ধার্য করেন। এই করের পরিমাণ ছিল ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ [২৬]। হযরত (সা:) খায়বর বিজয়ের পর সর্বপ্রথম সেখানকার কৃষিভূমির উপর এই কর ধার্য করেন [২৭]। তথাকার ইহুদীগণ মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং *খারায* প্রদানের শর্তে সেখানকার কৃষিযোগ্য ভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে।

আল-ফাই

হযরত (সা:) -এর সময়ে রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিল *আল-ফাই* বা রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি। বিজিত দেশের আবাদী ভূমির কতকাংশ সরাসরি রাষ্ট্রের দখলে নিয়ে নেয়া হত। ঐ সকল কৃষি ভূমিকে *আল-ফাই* বা রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি বলা হত [২৮]। এসল সম্পত্তির আয় থেকে মহানবী (সা:)-এর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ এবং দেশের অনাথ নারী-শিশু, গরীব-দুঃখী, পরিব্রাজক এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হত [২৯]।

গনিমত

আভিধানিক অর্থে, *গনিমত* বলতে ধন-দৌলতকে বুঝায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক অর্থে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সম্পদকে *গনিমত* বা ইংরেজীতে Booty বলা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের যে সকল মালামাল মুসলমান সৈনিকদের হস্তগত হত, সেগুলোকে একত্রিত করে এক পঞ্চমাংশ মহানবী (সা:) তথা রাষ্ট্রের জন্য রেখে, অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ যুদ্ধে (*জেহাদে*) অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত [৩০]।

জিজিয়া

জিজিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক সাধারণের উপর ধার্যকৃত একটি নিরাপত্তা কর। *কুরআনের* নির্দেশ অনুসারে, হযরত (সা:) অমুসলিম প্রজার উপর এই *জিজিয়া* ধার্য করেন [৩১]। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে যারা প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করতেন না, শুধু তারাই রাষ্ট্রকে এই কর প্রদান করতেন। হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর শাসনকালে এই করের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু এক দিনার। কিন্তু অমুসলিম ধর্মযাজক, শিশু, মহিলা, উন্মাদ ও গরীব যারা *জিজিয়া* প্রদানে অক্ষম, তারা এবং পীড়িত ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে *জিজিয়া* হতে রেয়াত দেয়া হত। *খারায* এবং *জিজিয়া* হতে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হত।

www.amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

হযরত (সা:) এর কোন নির্দ্দিষ্ট সামরিক বিভাগ বা নিয়মিত সৈন্য বাহিনী ছিল না। প্রয়োজনের সময় তিনি জাতিকে আহবান করতেন। ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে উৎসাহী ব্যক্তিগণ সেচ্ছায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেন। এভাবে গঠিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী (সা:) স্বয়ং। যোদ্ধাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রে সজ্জিতকরণ এবং সমস্ত মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি হযরতের (সা:) নিজের হাতেই ছিল। সাধারণত তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী সর্বাধিনায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে এর জন্য তিনি উপনেতা নির্বাচিত করতেন। হযরত (সা:)-এর শাসনকালে মুসলমানদেরকে বহুসংখ্যক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। তন্মধ্যে মুহাম্মদ (সা:) স্বয়ং ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন এবং অবশিষ্টগুলোতে এক একজন প্রতিনিধিকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করেছিলেন [৩২]।

সৈন্য বাহিনী প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বিন্যাস করার সময় *কুরআনের* আয়াত (৬১:৪) অনুসারে *সফবন্দীভাবে* সৈন্য সমাবেশ করা হত। প্রথম *সফে* (লাইন) বর্শাধারীগণ বাম হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঢাল নিয়ে শত্রু নিকটবর্তী হওয়ার অপেক্ষা করতেন। দ্বিতীয় লাইনে তীরন্দাজগণ পরিমানমত দূরত্বে ব্যূহ রচনা করতেন এবং তৃতীয় লাইনে অশ্বারোহী বাহিনী সামগ্রিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা:) সৈন্যদিগকে *সফবন্দী* করে সাজিয়ে স্বয়ং প্রতিসারিতে প্রবেশ করে *সফ* বা লাইন সোজা করেছিলেন [৩৩]।

মহানবী (সা:)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে তুলে ধরা হয়েছে তাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠে ঃ

১. ধর্ম রাষ্ট্র

মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্ম রাষ্ট্র। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আল্লাহ্র একজন রাসূল বা প্রেরিত বার্তাবাহক কর্তৃক। তিনি *কুরআনের* আলোকে এর আইন-কানুনসমূহ প্রবর্তন করেন। যদিও তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তবুও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মহান প্রভূ আল্লাহ্র নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতেন। মোট কথা, উক্ত রাষ্ট্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

২. সমতা

মদীনা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমতা। সেখানে আইনের চোখে দেশের শাসক ও জনগণ সবাই ছিল সমান। এমন কি মহানবী (সা:) ও একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতেন। সমসাময়িক বিশ্বের রাজন্যবর্গ ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ ঐশ্বরিক অধিকার বা Immunity -এর যে দাবী করে থাকেন, মদীনা রাষ্ট্রে স্বয়ং মহানবী (সা:)-এর জন্য তেমন কোন অধিকার সংরক্ষিত ছিল না। আইনের শাসন কায়েম করতে গিয়ে তিনি

www.amarboi.org

নিজের আত্মীয় স্বজনকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। একদা চুরির অপরাধে ধৃত সম্ভ্রান্ত মকজুমী বংশীয় ফাতিমা বিন্‌তে আসাদ নামীয় এক মহিলার পক্ষ হয়ে কেউ শাস্তি মওকুফের আবেদন জানালে, রাসূল (সা:) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন, কেননা তারা একই অপরাধের জন্য দুর্বলদের শাস্তি দিত, কিন্তু ধনী ও সবলদের ছেড়ে দিত। আল্লাহ্‌র কসম! ফাতিমা বিন্‌তে মোহাম্মদও যদি চুরির অপরাধে ধৃত হত, তাহলে তার জন্যও আমি *শরীয়া* আইনে নির্ধারিত একই ধরনের শাস্তির নির্দেশ দিতাম" *(বুখারী শরীফ)*। আধুনিক যুগে ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্রে "রাজা কোন অপরাধ করতে পারেন না" বলে স্বীকৃত অথবা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতিকে আদালতে জবাবদিহি করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫১ (১) (২)। আবার সংসদ সদস্যদের জন্য করমুক্ত কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে তেমন কোন সুযোগ কারো জন্য সংরক্ষিত ছিল না। তাই দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি হয়েও খলিফা হযরত আলীকে (রাঃ) একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় কাজীর দরবারে উপস্থিত হতে হয়েছিল ন্যায়বিচারের প্রার্থী হিসাবে। অনুরূপভাবে, খলীফা ওমর' (রাঃ) কেও জুম্মার প্রকাশ্য সমাবেশে জবাবদিহি করতে হয়েছে সমতার ভিত্তিতে বায়তুল মালের সম্পদ বিতরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের। কেবল ধর্মভীরুতা ও সৎকর্ম এবং উন্নত চরিত্র ও শরীয়ত সম্বন্ধে পান্ডিত্যই ছিল সেখানে মানুষের মান ও মর্যাদা নির্ধারণের মাপকাঠি। উক্ত রাষ্ট্রে আরব-অনারব, সাদা-কালো, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ তথা বর্ণবাদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। হযরত (সা:) বলেছেন, "কোন নাককাটা কাল কাফ্রীও যদি স্বীয় যোগ্যতাবলে তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়, তবে তোমরা তাঁকে মান্য কর" *(আল-হাদীস)*।

৩. শ্রম বিভাজন

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংগঠিতকরণের নীতি অনুযায়ী, শ্রম বিভাজন (Division of Work) অপরিহার্য। মদীনা রাষ্ট্রেও দেখা যায় যে হযরত (সা:) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য *ওয়ালী, আমিল, কাজী, মুহ্‌তাসিব* (বাজার পরিদর্শক) ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করেছিলেন। এতে হযরত (সা:)-এর প্রশাসন পরিচালনায় শ্রমবিভাজন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার উপর গুরুত্ব আরোপ

মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের ভিত্তি ছিল মেধা ও যোগ্যতা। তথায় স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ ছিল না। মদীনা রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে মহানবী (সা:) প্রথমে গড়ে তুলেছিলেন একদল আদর্শবান মানুষ। ধর্মপরায়নতার সাথে সাথে, তাদের সততা ও নেতৃত্বের যোগ্যতাও বিকশিত হয় সমভাবে। এদেরকেই নিয়োগ দান করা হয় বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে। সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে *কুরআনের* নির্দেশ হচ্ছে, "(কর্মচারী) হিসাবে উত্তম হইবে

www.amarboi.org

সেই ব্যক্তি যে 'শক্তিশালী' এবং 'বিশ্বস্ত" (*সূরা কাসাস, ২৮:২৬*)। নিয়োগের সময় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন, "যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কারো বদলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করল, সে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (*ইব্নে তাইমিয়া*)।

৫. পদসোপান নীতি

মহানবীর (সা:) প্রশাসন ছিল পদসোপান নির্ভর। আল্লাহ্র আইন বা *কুরআনের* নির্দেশাবলীকে শিরোধার্য করে প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেছেন স্বয়ং রাসূল (সা:)। তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ কর্মরত থাকতেন। *কুরআনে* আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, *আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল, ওয়া উলিল আমরে বাইনাকুম*, অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, মান্য কর রাসূলকে এবং নেতৃত্ব মেনে চল তাঁদের যাদেরকে তোমাদের মধ্য হতে ক্ষমতাসীন করা হয়েছে' [৩৩]। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন পদসোপান ভিত্তিক হলেও এর কার্যক্রম আনুভূমিক (Horizontal) পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল কেননা, পারস্পরিক আলোচনাই ছিল সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি।

৬. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে *শূরা* বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। *কুরআনের* নির্দেশ হচ্ছে, *ওয়া আমরুহুম শু'রা বাইনাহুম* অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে' [৩৪]। মদীনা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। যদিও মহানবী (সা:) ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্র সর্বময় নেতা এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদেশ বিনা বাক্যে মেনে চলতেন, তথাপি তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, বদরের যুদ্ধের সময় রাসূল (সা:) প্রথমদিকে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে বদরের প্রান্তরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাবু খাটানোর নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি চূড়ান্তকরণ নিয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শের সময় জনৈক সাহাবা ভিন্নতর জায়গায় যেখানে পানির ফোয়ারা অবস্থিত, তথায় সেনা ছাউনী সরিয়ে নেবার পরামর্শ দেন যাতে শত্রুপক্ষ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। পরার্মশটি যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় এবং এর উপকারিতা বিবেচনা করে রাসূল (সা:) তা গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে তাদের ছাউনী পানির ফোয়ারার পার্শ্ববর্তী স্থানে সরিয়ে নেবার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে, ওহুদের যুদ্ধের সময়ও অধিকাংশ সাহাবার মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক রাসূল (সা:) তাঁর নিজস্ব মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও মদীনা নগরীর বাইরে গিয়ে শত্রুপক্ষের সাথে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহানবী (সা:)-কে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও

www.amarboi.org

প্রশাসনিক কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য *উজারা* (মন্ত্রী পরিষদ) এবং *খাত্তাব* (সেক্রেটারীগণ) ছাড়াও ছিলেন প্রিয় সহচর বা সাহাবীগণ। হযরত (সা:) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী প্রশাসনে জনগণের অধিকার ও অংশগ্রহণ হয়েছিল কার্যত স্বীকৃত। এমনকি, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে অমুসলিমদের সাথেও সরকারের পরামর্শ করার নজির রয়েছে।

৭. সামাজিক ন্যায়বিচার

আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী শান্তি ও ন্যায়বিচারের মহান আদর্শই ছিল মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ। আল্লাহ্ ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আদেশ করেছেন। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় রাজা-প্রজা , মুসলমান-অমুসলমান, আরব - অনারব, আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ ছিলনা। আল্লাহ্ বলেন, *কুল আমারা রাব্বি বিল কিসতে* অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ) বলুন, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার' [৩৬]। অন্যত্র বলা হয়েছে, *ওয়া ইজা হাকামতুম বাইনান্নাসি আন তাহ্‌কুমু বিল আদল্* অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র আদেশ হচ্ছে যখন বিচার করবে তখন ন্যায় বিচার করবে' [৩৭]। আরো বলা হয়েছে, *ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ'মানু কু'নু কাওয়ামিনা বিল কিস্‌তে শুহাদায়া লিল্লাহি ওয়ালও আ'লা আনফুসিকুম আওউল ওয়ালিদাইনে ওয়াল আকরাবিনা ফালা তাত্তাবিয়ুল হাওয়া আন তা'দিলু* অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারী গণ ! তোমরা *আল্লাহ্‌র* উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানকারী ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও। যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয় এবং ন্যায়বিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না' [৩৮]। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী (সা:) নিজেও সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ইসলামী আইন-কানুনে অভিজ্ঞ, সৎ, খোদাভীরু, নিঃস্বার্থ ও ন্যায়বান ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক ও *কাজী* পদে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন।

৮. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা

প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ অর্থাৎ *ওয়ালী, আমিল* এবং *কাজী* তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি রসূলুল্লাহ্‌র (সা:) নিকট দায়ী থাকতেন। হযরত (সা:) প্রদেশ সমূহের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয় তদারকির জন্য জবাবদিহি এবং ভারসাম্য (Checks & Balance) নীতি রক্ষা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একদা এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য *আমিল* পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত *আমিল* রাজস্ব আদায় করে মদীনায় এসে বললেন, রাজস্বের কিছু অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে উপহার হিসাবে দিয়েছে। তা' শুনে হযরত (সা:) বলেছিলেন, "সে ব্যক্তির কতই না ভুল ধারণা যাকে আমরা রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগ করেছিলাম অথচ সে এসে বলছে, 'এ অংশ আপনাদের জন্য ও ঐ অংশ আমাকে দেয়া হয়েছে'। যদি সে ব্যক্তি তার পিতামাতার ঘরে বসে থাকত, তাহলে কি তাকে কোন কিছু

www.amarboi.org

দেয়া হত?" একথা বলে নবী করিম (সাঃ) সামন্ত উপহার সামগ্রী *জাকাতের* সাথে *বায়তুলমালে* জমা করার নির্দেশ দেন এবং পরদিন সমাবেশ ডেকে সরকারী কর্মচারীদের জন্য জনগণের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩৯] হযরত (সা:) আরো বলেন, "যখন কোন ব্যক্তিকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, তখন তাকে আমরা বেতন ভাতাও দিয়ে থাকি। যদি কেউ এর পরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা নিয়ে থাকে, তবে তা হবে বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর [৪০]।

এছাড়াও সামাজিক অনাচার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অসাধুতা প্রতিরোধ এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা থেকে নাগরিকদের রক্ষার জন্য কালক্রমে *আল হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) এবং *দিওয়ান-আল-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানেরও প্রবর্তন করা হয়েছিল [৪১]।

৯. মানবতার বিকাশ

মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতা বিকাশের এক শুভ যাত্রা। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের ভিত্তিতে মানব সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত, সেখানে মহানবী (সা:) বৃহত্তর মানব কল্যাণের লক্ষে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো রচনা করেন যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বজায় রেখেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এখানেই। আধুনিক যুগে অনেকেই মনে করেন, 'ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে শুধু ইসলামী *শরী'য়ার* রূপায়ন ক্ষেত্র। শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, হিজাব, বিয়ে-তালাক, চুরির শাস্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ইসলামী বিধানই এখানে কয়েম হবে'। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের দিগন্ত বহু প্রসারিত। বিভিন্ন ধর্ম ও মতের অনুসারীগণ কিভাবে একই রাষ্ট্রে মিলে মিশে বসবাস করতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে তারই সফল দৃষ্টান্তস্থল। অন্যভাবে বলতে গেলে, উদার মানবতা ও বিশ্ববোধই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রেরণা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় *শরীয়তের* যে কঠোরতা সম্ভব, ইসলামী রাষ্ট্রে বরং তা অনেকাংশে শিথিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী সমাজে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের জন্য মূর্তিপূজা শুধু অনুমোদিতই নয়, বরং বিভিন্নভাবে অমুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জান-মালের নিরাপত্তা এবং সরকারী প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ সংরক্ষিত [৪২]।

১০. অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ

অমুসমানদের সাথে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ চুক্তি ও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাটা ছিল মদীনা রাষ্ট্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মহানবী (সা:) *জিজিয়ার* (নিরাপত্তা কর) বিনিময়ে অমুসলিমদের সাথে যে সকল মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তার মূল বিষয়বস্তু ছিলঃ

ক) তারা (অর্থাৎ অমুসলিমগণ) শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের রক্ষা করবে;

www.amarboi.org

খ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না;
গ) তাদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দেয়া হবে;
ঘ) তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তি অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে;
ঙ) তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জাদির কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করা হবে না;
চ) তাদের কোন নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না;
ছ) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না বা সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হবে না; এবং
জ) ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে [৪৩]।

বস্তুতঃ মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের জান-মাল ও ধর্ম পালনে নিরাপত্তা প্রদান এবং তাঁদের সাথে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। মহানবী (সা:) বলেন, "যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কেউ যদি তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে কিংবা তাদের উপর বহন করার অতিরিক্ত বোঝা (কর) চাপায়, তবে আমি শেষ বিচারের দিনে তাদের জিম্মার পক্ষে ওকালতি করব" [৪৪]।

১১. মহানবী (সা:) এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব

হযরত (সা:)-এর রাষ্ট্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তা হচ্ছে, তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী। ওয়েবারীয় ধারণামতে তিনি কোন গতানুগতিক (Traditional) নেতা ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে Al-Buraey বলেন, "He did not assert the right to rule and lead by virtue of his birth or class" [৪৫]। *কুরআনের* ঘোষণা অনুযায়ী, হযরত (সা:)-কে কেবলমাত্র আরব জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল বা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, *"ওয়ামা আরছলনাকা ইল্লা কা'ফফতান লিন্নাসে বশীরাউ ওয়ানজিরা"*, অর্থাৎ 'আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে' [৪৬]। তাঁর ভেতর ছিল সহজাত নেতার সকল শাশ্বত গুণাবলী। অতএব, তাঁকে আধ্যাত্মিক (Charismatic) ও আইনগত (Legal) উভয়বিধ নেতা হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তিনি তাঁর মিশনের প্রাথমিক অবস্থায় অনুসারীদেরকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডে উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলীর দ্বারা পরিচালিত করেছিলেন। এ কারণে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ হযরত (সা:)-কে তাদের পথ প্রদর্শক, পরিচালক ও নেতা হিসাবে বিবেচনা করে এবং তাঁর ইন্তেকালের প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরও তাঁর পথ অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে সচেষ্ট রয়েছে। একজন মহান নেতা হিসাবে হযরত (সা:)-এর দক্ষতার কথা বহু লেখক বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সামর্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে William Hocking বলেন, "মুহাম্মদ (সা:) এর চিন্তা ও কাজের মধ্যে ছিল অভিন্নতা এবং এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থা। তিনি একদিকে ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং

www.amarboi.org

অন্যদিকে ছিলেন আইন প্রণেতা ও ম্যাজিস্ট্রেট" [৪৭]। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মুহাম্মদ (সা:) ইসলামী কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে আরবজাতির চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত দল ও গোত্রসমূহের মধ্যে এক মহান আদর্শের প্রভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাফল্য অর্জন ইতিহাসে নজীর হিসাবে চির অম্লান থাকবে" [৪৮]। তাঁর এই মহান আদর্শের প্রভাব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এখনও সমানভাবে বিরাজিত রয়েছে। আর এজন্যই Michael H. Hart বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে হযরত (সা:)-কে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "He was the only man in history, who was supremely successful on both religious and secular levels" [৪৯]।

১২. তত্ত্ব ও প্রয়োগের বাস্তব নিদর্শন

চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে, হযরত (সা:) মদীনা রাষ্ট্রে সরকার ও প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক মহান দলিল ভান্ডার সৃজন করেছেন যা *ছিয়া ছিত্তাহ্* বা ছয়টি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ ও নাসাঈ)* লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর অনেক নির্দেশনা ও কথায় প্রশাসনের মৌলিক নীতিমালা, ন্যায়বিচার এবং দক্ষতার কথা প্রতিভাত হয়েছে। অধিকন্তু, আধুনিক প্রশাসনের ধারণা অনুযায়ী, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যে পরস্পর নির্ভরশীল, তা আজ থেকে ১৪০০ বৎসর আগে রাসূল (সা:)-এর অনেক *হাদীসে* প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা:)-এর একটি *হাদীস* হচ্ছে, "তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে মন্দকাজ করতে দেখ, তবে সে যেন তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে। আর যদি সে তাতেও অপারগ হয়, তবে সে যেন অন্তর দ্বারা পরিবর্তন কামনা করে-- তবে এটি হবে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক" [৫০]।

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে যদিও আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রশাসন যন্ত্র ছিল না, তথাপি সে সময়ের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা:)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার যথার্থতা ছিল সন্দেহাতীত। *শরীয়া* নীতির উপর ভিত্তি করেই এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং যার ব্যাপক ভিত্তি ছিল ব্যক্তির মানবিক গুণাবলী যথা,সততা, ন্যায়বোধ ও সহানুভূতি। এ প্রসঙ্গে আধুনিক লোক-প্রশাসন চিন্তাধারায় সাম্প্রতিক ধারণার প্রবক্তা আরব লোক-প্রশাসনবিদ আবদেল হাদী বলেন, হযরত (সা:)-এর সময়ের প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মহানবী (সা:) পৃথিবীতে এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করা। তিনি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কার্যাবলীকে পৃথকভাবে দেখেন নি, বরং একের সঙ্গে অপরকে সম্পর্কযুক্ত

www.amarboi.org

করে মানুষকে মহান হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সমাজে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সংরক্ষক ও পরিচালক। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছিলেন নিজ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্ব। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্রকে বহু ধর্ম ও বর্ণ ভিত্তিক একটি আদর্শ রাষ্ট্রও বলা যেতে পারে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আমীর হাসান সিদ্দিকী মদীনা রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "It was a unique welfare state ever designed by mankind" [৫১]। অতএব, মহানবী (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র ও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদেরকে আজও পথের দিশারী হিসাবে নির্দেশনা দেয়। বর্তমানে "নব লোক-প্রশাসনের" ধারণায় যে সাম্য, ন্যায়বিচার ও দরিদ্রের জন্য সহানুভূতির কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিফলন আমরা মদীনা রাষ্ট্রেই দেখতে পাই। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকর্মে আল্লাহ্‌র *কুরআন* ও রাসূলের (সা:) *সুন্নাহ* অর্থাৎ ইসলামের নীতিমালার প্রয়োগ উপযোগিতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনাধীন ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী হওয়ার কারণে, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কার্যকারিতার ব্যাপারে আস্থাহারা বা সন্দেহপ্রবণ আরবের একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পুণর্গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে সমসাময়িক কালের দু'জন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। Luther Gulick এবং James Pollock নামক আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টে লিখেছেনঃ "Islamic culture is one of the best bases for a strong and succesful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times" অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি [৫২]। তারা আরো লিখেছেন, "The *Shari'ah* offers the Egyptians (so to all Muslim countries) the basic principles and elements upon which they can erect their new democracy and use their leadership qualities, citizens' involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery in the best interest of the nation as a whole" অর্থাৎ ইসলামী *শরীয়া (কোরান, সুন্নাহ ও ইজতেহাদ)* মিশরীয়দেরকে (অতএব সকল মুসলিম দেশসমূহকে) তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে [৫৩]। কোন মৌলবাদী মুসলিম গবেষক নয়, বরং বিশ্ব বরেণ্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এ সকল উক্তি বিশ্বের নবজাগরিত মুসলিম জাতিসমূহকে হীনমন্যতা পরিহার এবং আত্মবিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করবে--এটাই প্রত্যাশিত।

www.amarboi.org

তথ্যসূত্র

০১. মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭),পৃঃ ৮৭।

০২. মাসিক *পৃথিবী*, আগষ্ট ১৯৯৫, পৃ:৭।

০৩. ড.মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *মহানবী (সা:)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা*, আ.ক.ম.আব্দুল কাদের অনূদিত (চট্টগ্রাম ঃ শাহীন একাডেমী,১৯৯০),পৃঃ ৪৫,উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক আবদুন নূর, "ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ম কাঠামো," *মনযিল*, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৯১, পৃঃ ১৭।

০৪. Muhammad Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KP1,1985),p.240.

০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪১।

০৬. আবদুল করিম, "কিতাবুর রসূল" (ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান), আব্দুল করিম সম্পাদিত, *ইসলামী ঐতিহ্য*, জুন ১৯৮৫,বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃঃ ১

০৭. Muhammad Al-Buraey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২।

০৮. ড.মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ , *আহাদে নববী মে নেজামে হুকুমরানী*, পৃ:৩৩।

০৯. গোলাম মোস্তাফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকাঃ ১৯৪২), পৃঃ ১৪৭।

১০. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫

১১. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (London : Cambridge University Press, 1979),p.275.

১২. S.A.Q. Husaini, *Constitution of the Arab Empire* (Lahore : Shaikh Muhammad Ashraf, 1958), p.2-4.

১৩. Mahammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৩।

১৪. *আল-কুরআন* (৩ ঃ ১৮৯)।

১৫. *De Republica*, p. 32।

১৬. *Lecture on Jurisprudence* (London : 1802) p.88.

১৭. *Leviathan*, Everyman's Library Series, p.12

১৮. *প্রাগুক্ত*, মুখবন্ধ।

১৯. S.A.Q. Hussaini, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯।

২০. ইবনে হিশাম, *সীরাতুন্নবী (সা:)*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৯৬৫।

২১. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *মহানবীর সচিবালয়* (ঢাকা ঃ নূর প্রকাশনী, ১৯৮৫) পৃঃ ২২।

২২. Muhammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৪।

২৩. *প্রাগুক্ত*, মুখবন্ধ।

২৪. *নিসাব* হচ্ছে একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি যার সারা বৎসর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের পর যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ অর্থ উদ্বৃত থাকা। এই এই উদ্বৃত্ত অংশের চল্লিশ ভাগের একভাগ নির্দিষ্ট খাতে *জাকাত* হিসাবে প্রদান করা *ফরজ*। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আল মাওয়ার্দী, *আহকামুস সুলতানিয়া*, পৃঃ ৩৯৯, উদ্ধৃত করেছেন ডঃ মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান, শেখ লুৎফুর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী ঃ বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯১৯), পৃঃ ৩৩।

২৫. *আল-কুরআন* (২ ঃ ৪০, ৭৭ ; এবং ৯ঃ ৫) ।

২৬. বালাযুরী, *ফতুহ আল বুলদান* (লাইদেন, ১৮৬৬), পৃঃ ২৭ ।

২৭. আল-মাওয়ার্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৬।

www.amarboi.org

২৮. আবু ইউসুফ "বাব আল গানীমত," *কিতাবুল খারায*, পৃঃ ১১।
২৯. বালাযূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।
৩০. আল-মাওয়ার্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৭-২৪৫।
৩১. *আল-কুরআন* (৯ঃ ২৯)।
৩২. ইব্নে হিশাম ও আল-ওয়াকিদী অবলম্বনে তালিকা, উদ্ধৃত করেছেন M. Watt, *Muhammad at Medina*, পৃঃ ৩৩৯-৪৩।
৩৩. ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৪৪।
৩৪. উদ্ধৃত করেছেন Muhammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৫।
৩৫. *আল-কুরআন (সূরা শুরা* ৪২:৩৮)।
৩৬. *আল-কুরআন (সূরা আ'রাফ*, ৭ : ২৭-২৯।
৩৭. *আল-কুরআন (সূরা নিসা*, ৪ঃ ৫৮)।
৩৮. *ঐ (সূরা নিসা*, ৪ ঃ ১৩৫)।
৩৯. *সহিহ্ মুসলিম*, উদ্ধৃত করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ, *আল-মাওয়াদী*, পৃঃ ১৬৮। *প্রাগুক্ত* ২৭।
৪০. *আবু দাউদ শরীফ (১৯৬৩ : ৬২৬)*।
৪১. *হিস্‌বা ও দিওয়ান আল-মাজালিম* বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন এই গ্রন্থে সংকলিত "প্রকাশনা সেচ্ছাচারিতা দমনে অম্‌বুড্‌স্‌ম্যান" নিবন্ধটি।
৪২. গোলাম মোস্তাফা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৯।
৪৩. ড.মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ লুৎফুর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃঃ ৪৩।
৪৪. আমীর হাসান কর্তৃক উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।
৪৫. Muhammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৬।
৪৬. *আল-কুরআন* (৩৪ঃ ২৮)।
৪৭. উদ্ধৃত করেছেন Muhammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৪৩।
৪৮. Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam* (Karachi : Pakistan Pablishing House, 1978). quoted by Mohammad Al-Burac, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৩।
৪৯. Michael. H. Hart, *The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in the History* (New York : Hart Publising , 1978), p.33
৫০. *আল নব্বীর চল্লিশ হাদীস*, ১৯৭৭ ঃ ১১০, উদ্ধৃত করেছেন Mahammad Al-Buraey *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৭।
৫১. *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃঃ ৪৪।
৫২. উদ্ধৃত করেছেন আবদুন নূর, "ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ম কাঠামো" *মনযিল*, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, ১৯৯১, পৃঃ ১৮।
৫৩. *ঐ*।

"God has promised those of you who have attained to faith and do righteous deeds that, of a certainty, He will cause them to accede to power on earth, even as He caused(some of) those who lived before them to accede to it,..."

—(Al-Qura'n,24:55).

www.amarboi.org

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইসলামী প্রশাসনের রীতি*

ভূমিকা

মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভূ আল্লাহ্ পবিত্র *কুরআনে* উল্লেখ করেছেন,"আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ (পথ নির্দেশিকা) যাতে মানুষ 'ন্যায়বিচার' কায়েম করে"(*আল-কুরআন, ৫৭ঃ২৫*)। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বে ন্যায়বিচারের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দ এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করেছেন। আর্জেন্টিনার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দান্তে কাপুটু (Dante Cuputo) বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৮৯) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বিদায়ী সভাপতির ভাষণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে বলেন, "পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বর্তমান বিশ্বে আমরা সবাই একই ট্রেনের অভিযাত্রী। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা নিরাপদ হতে পারে না যদি তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে বোমা থাকে" [১]। বিষয়টাকে পরিস্কার করতে গিয়ে জাতিসংঘের ৪৪তম অধিবেশনের নব নিযুক্ত সভাপতি নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত Joseph Garba বলেন, "বিশ্বের বর্তমান অশান্তি ও অস্থিরতার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য" [২]। বিশ্বের এক অংশের (দক্ষিণের অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের) ১২০ কোটি মানুষ আজ চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানের ফলে ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, গৃহহীনতা ও রোগে ভুগছে [৩]। আর অপর অংশের (উত্তরের অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশসমূহের) জনগণ যা বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর এক দশমাংশ, [৪] চরম ভোগ বিলাসে অপচয় করছে সম্পদ। সম্প্রতি জার্মানীতে অনুষ্ঠিত পদার্থবিদ্দের একটি আন্ত র্জাতিক সম্মেলনে মার্কিন প্রফেসর Victor Sidel বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে, "বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন শুধু অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে ৪০,০০০ শিশু, অথচ বিশ্বে প্রতিদিন যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হয় তা বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদারও দ্বিগুণ" [৫]। অপরদিকে, সম্পদের অপচয় হচ্ছে সামরিক গবেষণা ও নতুন নতুন মানব বিধ্বংসী সমরাস্ত্র নির্মাণে। জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব Parez de Cueler -এর হিসেব মতে, প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার তিন শত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে শুধু যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে [৬]। কিন্তু এভাবে ব্যয়কৃত মাত্র ২০ দিনের অস্ত্র-খরচ দিয়ে পৃথিবীর সকল শিশুর সারা বৎসরের খাবার, পানীয় জল এবং জীবনরক্ষাকারী প্রতিষেধকের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব [৭]। বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশে দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও আজকের বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে সামরিক প্রস্তুতি ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা, মানব জীবন ও সভ্যতাকে ক্রমাগতই হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে [৮]।

---

* সৌজন্যেঃ *প্রশাসন সমীক্ষা*, ভল্যুম-৩, নং-১,১৯৯০ (ঢাকা) (নিবন্ধটি আংশিক সংশোধিত)।

www.amarboi.org

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি জোসেফ গারবা তাই বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থাকে "ন্যায়বিচারের" উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছেন [৯]। ইতোপূর্বে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত Willy Brandt কমিশন রিপোর্টেও বিশ্ব মানবতাকে অশান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার স্বার্থে, উত্তরের ধনী দেশগুলোকে দক্ষিণের গরীব দেশসমূহকে বাণিজ্যিক সুবিধা ও কারিগরী সহায়তা প্রদানসহ অধিকহারে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে "ন্যায়বিচার " ভিত্তিক একটি "নব আর্ন্তজাতিক অর্থ ব্যবস্থা" (New International Economic Order) গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছে [১০]। পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলর উইলী ব্রান্ডের নেতৃত্বে বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশ থেকে মোট ১৮জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রাষ্ট্রনায়ক ও বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কমিশনের রিপোর্টে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের জাতীয় আয়ের (G.N.P.) শতকরা এক ভাগ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে সরকারী সাহায্য (Official Development Assistance বা সংক্ষেপে ODA) হিসাবে প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে [১১]। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের জাতীয় আয়ের মাত্র দশমিক ৭০ শতাংশ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে উন্নয়ন সাহায্য হিসাবে প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ অবধি একমাত্র সুইডেন ছাড়া, আর কোন শিল্পোন্নত দেশ উপরিউক্ত লক্ষমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হয় নি।

"উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ" (North-South Dialogue) নামে পরিচিত উইলী ব্রান্ড কমিশন রিপোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচেছ, এতে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, অনুন্নত দেশগুলোর অভ্যন্তরেও ধনী ও গরীবের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং সম্পদ পুন:র্বন্টনের মাধ্যমে "সামাজিক ন্যায়বিচার" (Social Justice) প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে [১২]। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ষাটের দশক থেকে মাথাপিছু আয় বা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে উপরের স্তরের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের হাতে। অপরদিকে, এসব দেশের আয়ের শতকরা হার পরিবর্তনের গতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, উপরের স্তরের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের আয় বৃদ্ধি হয়েছে নীচের স্তরের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবারকে বঞ্চনার বিনিময়ে [১৩]। ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যুগে এসেও দেশে দেশে পুষ্টিহীনতা, রোগ, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ধনী ও গরীবদের এই ব্যবধানের ফলে সামাজিক সংহতি হয়েছে হুমকির সম্মুখীন, বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। তাই দেশে দেশে সামাজিক সংহতি ও স্বস্তিবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষে সম্প্রতি শ্লোগান উঠেছে "নয়া অর্থ ব্যবস্থা" (New Economic Order) এবং "নব লোক-প্রশাসন" (New Public Administration) গড়ে তোলার স্বপক্ষে। "নয়া অর্থ ব্যবস্থার" মূল কথা হচ্ছে, শুধু উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, সম্পদ পুন:র্বন্টনের মাধ্যমে "সামাজিক

www.amarboi.org

ন্যায়বিচারও" নিশ্চিত করতে হবে। "নব লোক-প্রশাসনের" মূল কথা হচ্ছে, সরকারী সেবা ও সরবরাহ বিতরণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক কড়াকড়ি (অর্থাৎ উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্ক বা পদ সোপান, নিয়ম নীতির কড়াকড়ি ও নৈর্ব্যক্তিকতা) পরিহার করে, মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে "সামাজিক সমতা" (Social equity) প্রতিষ্ঠায় সরকারী আমলাতন্ত্র বা লোক-প্রশাসনকে সচেষ্ট হতে হবে [১৪]।

"ন্যায়বিচার" বা "সামাজিক ন্যায়বিচার" এমন একটি ধারণা (Concept) বা শব্দগুচ্ছ (Phrase) যা মানব ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে মহামানব, দার্শনিক ও রাষ্ট্র নায়কদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা পিতাগণ (Founding Fathers of American Independence) স্বাধীন জাতির শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে সরকার গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেনঃ "Justice is the end of government" অর্থাৎ "ন্যায়বিচারই হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য" [১৫]। তারও দু' হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক Plato (খ্রীঃ পূর্ব ৪২৭-৩৪৭) "ন্যায়বিচারকে" সরকারের একমাত্র আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন [১৬]। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রেও (পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে) গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি, অর্থনৈতিক ও "সামাজিক ন্যায়বিচারকে" রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে [১৭]। পরবর্তীতে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে "ইসলামকে" রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

কিন্তু ইসলামের দাবি ও পরিমন্ডল অনেক ব্যাপক। হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর উপর নাযিলকৃত *কুরআনের* সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ *"আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দি'নাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি' ওয়ারধিতু লাকুমুল ইসলামা দিনা"*, অর্থাৎ আজ (থেকে) তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম' (*সূরা মায়িদা* ঃ ৩)। উপরিউক্ত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম শুধু একটা ধর্ম নয়, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী বিধানের আলোকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন: *"লাকাদ আরসালনা রুসুলানা বিল বাইয়েনাতে ওয়া আনযালনা মায়া হুমুল কিতাবা ওয়াল মি'জানা লিয়াকু'মা আননাসু বিলকিস্তে"*, অর্থাৎ 'আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ (পথ নির্দেশিকা) যাতে মানুষ ন্যায়বিচার কায়েম করে' (*সূরা হাদীদঃ* ২৫)। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী সমাজে "ন্যায়বিচারের" বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রতিষ্ঠা কৌশল সম্পর্কের আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন বক্তব্যে "ন্যায়বিচারের" উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও "ন্যায়বিচার" সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অপরাপর বিশেষত: পাশ্চাত্য বক্তব্যের একটা ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। "নয়া অর্থ ব্যবস্থা" আন্দোলনে "ন্যায়বিচার" বলতে সম্পদ পুন:র্বন্টন অর্থাৎ ধনীদের কাছ থেকে সম্পদ গরীবের কাছে

www.amarboi.org

হস্তান্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ সরকার গঠন বা জাতীয় সিদ্ধান্তে গরীবের অংশগ্রহণের অধিকারের বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত। অপরদিকে, গ্রীক দর্শন ও আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাগনের চিন্তায় "ন্যায়বিচার" শুধু মানুষের রাজনৈতিক দিক নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনায় "ন্যায়বিচার" হচ্ছে সমাজে "প্রত্যেককে তার ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করা" [১৮]। প্রাপ্য বলতে প্লেটো যোগ্যতা অনুযায়ী নাগরিকদেরকে সরকারী দায়িত্বে নিয়োগকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু এখানে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে "ন্যায়বিচার" অর্থাৎ উৎপাদন ও বন্টন নীতি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অনুরূপভাবে, আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাগণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মানুষের সাম্য এবং কতিপয় অবশ্যম্ভাবী অধিকারের (অর্থাৎ জীবন,স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষা)স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। Jefferson -এর মতে, সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ঐ সকল স্বীকৃত অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মানুষের সাম্য (Equality of Man) বলতে শুধু সাদা মানুষদেরকে বোঝানো হয়েছে। নাগরিক অধিকার থেকে কালো আমেরিকান, দাস এবং মহিলাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। দীর্ঘ আন্দোলনের পর, মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে শাসনতন্ত্রের ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে কালো আমেরিকান এবং ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদেরকে ভোট প্রদানের অধিকার (১৯২০) প্রদান করা হয়েছে। বিগত শতাব্দীর জনৈক বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Carl J. Fredrickও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিক সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠা করা। "ন্যায়বিচার" বলতে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফ্রেড্রারিক দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথমতঃ আইন অনুযায়ী সকল ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য নিশ্চিত করা; এবং দ্বিতীয়তঃ আইন লংঘন না করে থাকলে কারও যেন জীবন বা অংগের 'ক্ষতি না হয়'[১৯]। "ন্যায়বিচার" সম্পর্কিত উপরিউক্ত সংজ্ঞাটির একটা অসম্পূর্ণতা হচ্ছে, এতে শুধু আইন অনুযায়ী বা আইন পালনের কথাই বলা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আইনটি কে প্রণয়ন করবে ? স্বৈরাচারী সরকার বা এক নায়কের নির্দেশও আইন যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা শাসিত 'বর্ণবৈষম্য আইন' (Law of Apartheid) যা নৈতিক বিচারে অন্যায়, আবার জনগণের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনও আইন। অতএব, প্রফেসর ফ্রেডারিকের সংজ্ঞায় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জনগণের ভূমিকা বা অধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত। তাই তাঁর প্রণীত সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ বলা যায়।

"ন্যায়বিচার" সম্পর্ক উপরে আলোচিত সংজ্ঞাসমূহ শুধু সরকারের উদ্দেশ্য বা করণীয় বিষয় নিয়েই আবর্তিত হয়েছে । এব্যাপারে জনগণ বা নাগরিকদের ভূমিকা বা দায়িত্ব সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। "ন্যায়বিচার" ভিত্তিক সমাজ গঠনের ব্যাপারে জনগণের করণীয় সম্পর্কে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Earnest Barker প্লেটোর বক্তব্যের সূত্র ধরে বলেনঃ "The Justice of the State is the Citizen's sense of duty" অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সমাজে "ন্যায়বিচার" হচ্ছে নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্ববোধ [২০]। এর অর্থ

www.amarboi.org

হচ্ছে, সমাজের নাগরিকবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থানে যথাযথভাবে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন। এই ধরনের মতবাদ আত্মকেন্দ্রীকতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের (Individualism) বিরোধী । এই মতবাদের মূল সুর হচ্ছে, ব্যক্তি কোন সমাজ বিচ্ছিন্ন উপাদান নয় বরং সমাজ ব্যবস্থারই অংশ বিশেষ। এছাড়া, ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়। সমাজে সবাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব নয় বরং সমাজের বা সমষ্টিগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে । অতএব, সমাজ ব্যবস্থাকে সচল রাখার স্বার্থে, সমাজের বিভিন্ন অবস্থানে নাগরিকগণ কর্তৃক নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাই হচ্ছে বার্কার এর মতে ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার সম্পর্কিত উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ মানুষের সমষ্টিগত জীবন প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এমন কোন সংজ্ঞা কেউ দিতে পারেন নি যা মানুষের সার্বিক জীবন ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করে। এ ব্যাপারে ইসলামে বর্ণিত ন্যায়বিচার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার

ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচী। ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (*সূরা মায়িদাঃ* ৩)। সমাজ জীবনে এই বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা (*সূরা হাদীদঃ* ২৫)। ইসলাম ন্যায়বিচার কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজ জীবনে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের কর্মসূচীসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :*

১. জনগণের মৌলিক চাহিদার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণ;
২. সমাজের স্বার্থে উৎপাদনের উপকরণসমূহের (ভূমি, শ্রম, পুঁজি, ইত্যাদি) সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমান সম্পদ সৃষ্টি;
৩. সম্পদের বন্টন ও পূণ:র্বন্টনের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাস;
৪. দারিদ্র্য বিমোচন (কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে);
৫. রাষ্ট্রীয় সেবা ও সরবরাহ বিতরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ;
৬. সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়ন অর্থাৎ সমাজে কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;
৭. নির্ধারিত আইন ও নীতি সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-গরীব, শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ; এবং
৮. ন্যায়বিচারের কর্মসূচী অব্যাহত রাখার স্বার্থে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত না করা।

*এই প্রবন্ধে উল্লেখিত ইসলামে ন্যায়বিচারের বৈশিষ্টাবলী লেখকের, *Social Justice in Bangladesh*,1991 শীর্ষক বই হতে সংক্ষিপ্ত কারে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, লেখকের সদ্য প্রকাশিত, *Social Justice and Human Development* (Dhaka:Adorn Publication, 2007).

www.amarboi.org

আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, "ন্যায়বিচার" ভিত্তিক একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়নকালে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সৎ ও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তিদের শাসন ব্যবস্থা কায়েমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শাসকদের মধ্যে সততাবোধ (Virtue) ও সমাজবোধ জাগ্রত করার জন্য প্লেটো এক ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা সুপারিশ করেছেন। আবার নেতৃবৃন্দ যেন সৎ ও নিঃস্বার্থপর হয় অর্থাৎ দুর্নীতির দিকে তাড়িত না হয়, তার জন্য শাসকদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক জীবন থাকতে পারবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্লেটোর মতে, শাসকদের পক্ষে নিঃস্বার্থপর থাকার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন। এগুলো মানুষকে আত্মকেন্দ্রীক, স্বার্থপর ও দুর্নীতির দিকে তাড়িত করে।

ইসলামও সমাজে ন্যায়বিচারের কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে সৎ ও নিঃস্বার্থপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেন ঃ *আত্তাবেয়ু মাল্লায়্যাসয়ালুকুম আজরাও ওয়াহুম মুহ্তাদু'ন*, অর্থাৎ 'তোমরা অনুসরণ কর তাদেরকে যারা সৎ এবং যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না' (*সূরা ইয়াসীন* : ২১)। আর দেশব্যাপী ন্যায়বিচারের কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য সরকারী আমলাতন্ত্র বা *সিভিল সার্ভিসে* লোক নিয়োগের ভিত্তি হবে "মেধা" (Merit), এবং মেধা যাচাইয়ের ভিত্তি হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও উন্নত নৈতিক চরিত্র, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়বিচারের কর্মসূচীর প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা (Commitment to Soial justice) (*সূরা কাসাস* : ২৬) [২১]।

শাসক ও প্রশাসকদের মধ্যে "সততাবোধ" জাগ্রত করার জন্য দার্শনিক প্লেটোর ন্যায় ইসলামও সবার জন্য শিক্ষাকে *ফরজ* বা আবশ্যিক ঘোষণা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে, মানুষ মুলতঃ দু'টি উপাদানের সমষ্টি ঃ ১) দেহ (যা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাটি, পানি এবং বায়ু ইত্যাদি উপাদানে গঠিত); এবং (২) আত্মা (যা আল্লাহ্ নিজ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন এবং মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীতে নেই বলেই মানুষকে "আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত" বা সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়েছে)। দেহের সংরক্ষণ ও পুষ্টি বিধানের জন্য প্রয়োজন বস্তুগত উপকরণাদি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ,বাসস্থান ইত্যাদি। আর আত্মা বা বিবেককে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। মানুষের দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন বহুবিধ বস্তুগত উপকরণের উৎপাদন ও সংগ্রহ, তেমনি সমাজে মানুষের বহুবিধ দৈহিক চাহিদার (সেবাও সরবরাহ) প্রয়োজন নির্ধারণ ও সমতার ভিত্তিতে বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ন্যায়ের শাসন। ইসলাম কর্তৃক মানুষের জন্য শিক্ষাকে *ফরজ* করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র *খলীফা* হিসেবে মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ বা বিবেকবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষা মানুষকে দৈহিক বা পাশবিক স্তর থেকে আত্মীক বা মানবিক স্তরে উন্নীত করে। শিক্ষা শুধু মানুষের কর্মদক্ষতাই বাড়ায় না, শিক্ষা মানুষের প্রতিভা, মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলীরও (যেমন দয়া, সহানুভূতি, অপরের জন্য ত্যাগবোধ, ইত্যাদি) বিকাশ ঘটায়।

www.amarboi.org

প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরনে ইসলামী রীতি

ইসলাম কিন্তু শাসকদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও দুর্নীতির প্রবণতা প্রতিরোধকল্পে, প্লেটোর ন্যায় শাসনদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন অবৈধ ঘোষণা করেনি। তবে, শাসক ও প্রশাসকদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্বহীনতা, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে নিম্মোক্ত পাঁচটি বিষয়ে নিয়মিত চর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপ হয়েছেঃ

১. *শু'রা* বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
২. *হিসাব* বা জবাবদিহিতার চেতনাবোধ জাগ্রত রাখা;
৩. প্রাত্যহিক *সালাত* বা পাঞ্জেগানা নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা;
৪. *আমালুস সালেহ* বা সৎকর্মে উৎসাহিতকরণ; এবং
৫. *আ'খেরাত* বা কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে পারলৌকিক জীবনে পুরস্কার ও শাস্তির অঙ্গীকার।

পরবর্তী আলোচনায় এসকল বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হল।

১. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে (*কুরআন* ও *সুন্নাহর* আলোকে) প্রয়োজনীয় আইন ও কর্মসূচী প্রণয়নকালে শাসক ও প্রশাসকদেরকে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেনঃ *ওয়া আমরুহুম শু'রা বাইনাহুম*, অর্থাৎ "(তোমরা) নিজেদের মধ্যে কর্ম সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে" (*সূরা শুরাঃ* ৩৮)। অপর সূরাতেও আল্লাহ্ বিশ্ববাসীগণকে কল্যাণকর কাজে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার উপদেশ দিয়েছেন এবং গোপন সিদ্ধান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,"ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট সমবেত হবে তোমরা" (*সূরা মুজাদালা* ঃ ৯)। শাসকদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবণতার ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তারা যেন পথনির্দেশিকা (অর্থাৎ *কুরআন* ও *সুন্নাহর* বিধান) পরিত্যাগ করে "খেয়াল-খুশীর" অনুসরণ না করে (*সূরা মায়িদাঃ* ৪৮) এবং "সীমা লংঘন" না করে, আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না (*সূরা মায়িদা* ঃ ৮৭)। এ ব্যাপারে জনগণকেও সজাগ করে বলা হয়েছেঃ *"ওয়ালা তুতিয়মান আগফালনা কালবাহু য়ান জিক্‌রিনা অত্তাবায়া হাওয়াহু ওয়া কানা আমরুহু ফুরুতা"* অর্থাৎ যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে (অর্থাৎ স্বৈরাচার) এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে(অর্থাৎ শাসনতন্ত্র বিরোধী) তুমি/তোমরা তার আনুগত্য করো না (*সূরা কাহাফঃ* ২৮)।

২. ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে, পৃথিবী এবং আকাশমন্ডলীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্ই হচ্ছেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। *কুরআনের* ভাষায়ঃ *"আনাল্লাহা লাহু মুলকুস সামা ওয়াতে ওয়াল আরধে"*, অর্থাৎ 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহেরই' (*সূরা বাকারাঃ* ১০৭)। সমাজে শাসক ও প্রশাসক হিসাবে যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন তাঁরা ক্ষমতার আমানতদার (Trustee) মাত্র [২২]।

www.amarboi.org

অতএব, সার্বভৌম আল্লাহ্‌র *খলীফা* বা প্রতিনিধি হিসেবে শাসক ও প্রশাসকগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রয়োগ করবেন আল্লাহ্‌ নির্ধারিত নিয়মে এবং এজন্য তাঁদেরকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগকর্তা, জনগণ এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র, কাছে জবাবদিহি করতে হবে (*সূরা বাকারা* ঃ ২০৩,২৮১ এবং *সূরা নিসাঃ* ৮৭)।

৩. ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর জন্য দিনে পাঁচ ওয়াকত *সালাত* বা নামাজ ফরয করেছে। প্রাত্যহিক নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিকর্তা ও মহান প্রভূ আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ, অতীত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ নির্দেশিত পথে চলার অঙ্গীকার করে থাকে। নামাজ নামক এই প্রাত্যহিক প্রশিক্ষণের শিক্ষা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপর আল্লাহ্‌ বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। *কুরআনে* আল্লাহ্‌ ৮২ বার *"আকিমুস সালাতা"* অর্থাৎ সর্বত্র নামাজ কায়েমের কথা বলেছেন। বাস্তব জীবনে *সালাত* কায়েমের উপকারীতা সর্ম্পকে আল্লাহ্‌ বলেনঃ *"ইন্নাস সালাতা তান্‌হায়ানিল ফাহ্‌সা'ই ওয়াল মুনকার"*, অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই *সালাত* (নামাজ) মানুষকে অন্যায় ও পাপকার্য থেকে বিরত রাখে' (*সূরা আনকাবুতঃ* ৪৫)।

৪. ইসলাম মানুষকে সমাজবোধ এবং সমাজের জন্য ত্যাগবোধে উজ্জীবিত হয়ে মানবকল্যাণ ও সৎকর্মে উদ্যোগী হবার জন্য বারংবার উৎসাহ প্রদান করেছে। *কুরআনে* বহুবার বলা হয়েছেঃ *"ইন্নাল্লাজিনা আমানু ওয়া য়ামিলুস সো আলিহ্যাত..."*, অর্থাৎ 'পৃথিবীতে যারা (আল্লাহ্‌) বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ন, তারাই সফলকাম এবং তারাই *শ্রেষ্ঠ*' (*সূরা ব্যায়িনা* ঃ ৭-৮)। *কুরআনে* এও বলা হয়েছে যে, যাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয় না এবং যারা মানুষের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেনা, তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্মপালন অর্থহীন (*সূরা বাকারা,* ২ ১৭৭; *সূরা মাউনঃ* ২-৭)। অপর এক সূরায় মুসলমানদের (বিশ্বাসীদের) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন ঃ *"কুনতুম খায়রা উম্মাতিন, উখরিয়াত লিন্নাসে ..."* অর্থাৎ 'তোমরাই *শ্রেষ্ঠ* দল। তোমাদের সৃষ্টি হয়েছে মানব কল্যাণের জন্য' (*সূরা আল-ইমরান,* ৩ ১১০। এভাবে ইসলাম আত্মকেন্দ্রীকতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উর্ধ্বে উঠে মানুষের মধ্যে সমাজবোধ জাগ্রত করার নির্দেশ দেয় এবং সমাজের জন্য ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে।

৫. সর্বশেষে, *কুরআন* ও *সুন্নাহ্‌র* আলোকে সমাজে ন্যায়বিচারের কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যাপারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শাসক ও জনগণের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার রয়েছে প্রভূ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে (*সূরা বাকারাঃ* ৮২; *সূরা কাহফঃ* ৩১-৩২)। আর যারা শাসক ও প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার করবেন, শেষ বিচারের দিনের কর্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের জন্য দোযখের অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারেও সর্তক করে দেয়া হয়েছে (*সূরা নিসা* ঃ ১২৩; *সূরা ফাতির* ঃ ৩৬-৩৭)।

www.amarboi.org

উপসংহার

দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়কদের মতে, সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার জন্য। "ন্যায়বিচার" সম্পর্কিত প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ- যেমন ঃ "আইনের শাসন", "প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান", "ধনী ও গরীবের মাঝে সম্পদের পুনঃর্বন্টন" ইত্যাদি একপেশে ও অসম্পূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচী, যেখানে আইন প্রণয়ন ও আইনের প্রয়োগ এবং উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজে "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, মানবজাতির জন্য সার্বভৌম আল্লাহ্ নির্ধারিত সংবিধান (*কুরআন* ও *সুন্নাহ্*) সম্পর্কে পরিমিত "জ্ঞানসম্পন্ন," 'সৎ' ও "প্রতিদান বিমুখ" (নিঃস্বার্থপর)" রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং "ন্যায়বিচারের" কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল (Committed) ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা। এজন্য প্রয়োজন শাসক, প্রশাসক ও জনগণের মধ্যে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। আর এই সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে "শিক্ষা", যা ইসলাম প্রতিটি নর-নারীর উপর *ফরয* ঘোষণা করেছে।

তথ্যসূত্র

১. *The Bangladesh Observer,* Dhaka September 20,1989.

২. ঐ।

৩. "Global Poverty Up: A Result of Debt and Environmental Decline", *The Bangladesh Observer*, Dhaka, November 27,1989.

৪. Professor Abdus Salam, "Ideals and Realities," lecture given at the Unversity of Stockholm on 23rd of September,1975.

৫. একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের জন্য, International Orgainzation for the Prevention of Nuclear War (IOPNW)-এর উদ্যোগে পশ্চিম জার্মানীর কোলন শহরে অনুষ্ঠিত পদার্থবিদ্দের আন্ত র্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত Professor Victor Sidel-এর বক্তৃতা, উদ্ধৃত করেছেন Farida Ignatius, "Newsletter from West Germany" in *The Bangladesh Times*, Dhaka, June 16,1986.

৬. বিগত ১৭ অক্টোবর (১৯৮৬) "বিশ্ব খাদ্য দিবস" উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে জাতিসংঘের তদনীন্তন মহাসচিব প্যারেজ দ্যা কুয়েলার এই হিসেব প্রদান করেছেন। দেখুন, *The Bangladesh Obserwer*, Dhaka, October,18,1986. তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,বর্তমান বিশ্বে ৮০ কোটি নারী, পুরুষ ও শিশু চরম দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে এবং এদের মধ্যে ৫০ কোটি দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছে। কুয়েলায়ের মতে, যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হচ্ছে, বর্তমান এর এক দিনের খরচ যদি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিতরণে ব্যবহৃত হতো, তাহলে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিরসনে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতো।

www.amarboi.org

৭. প্রফেসর ভিক্টর সিডেল, *ঐ* ।

৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুন নূর, "বিশ্ব পরিস্থিতি, মানব জীবন ও ধর্ম", বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সপ্তম সাধারণ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯ ও ২০ শে নভেম্বর, ১৯৮৬

৯. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা,২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ।

১০. দেখুন, *North –South : A Programme for Survival,* the Report of the Independent Commission on International Development Issues under the Chairmanship of Willy Brandt (London : Pan Books, 1980).

১১. *ঐ*, পৃঃ ২৪২, ২৫৪,২৯১ ।

১২. *ঐ*, ২৪,৪১-৪২,৭৬,২৮৫ ।

১৩. দেখুন United Nations, *Economic Survey of Asia and the Far East,* 1972 (Bangkok : ECAFE 1973) Tables 1-3 ; আবদুন নূর, "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন" *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, সংখ্যা ১৬,মে,১৯৮৬ ।

১৪. নব লোক-প্রশাসন" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, H. George Frederickson, "Towards a New Public Administration" in Frank Marini(ed), *Towards a New Public Administartion : A Minnow Brook Perspective* (Seranton : Chandler Publishing Company, 1972).

১৫. The Federalist, উদ্ধৃত করেছেন Carl J. Friedrick, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America,* Fourth Edition (New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co, 1968), পৃঃ ১০২ ।

১৬. *The Republic of Plato,* F.M. Cornford translation (Fair Lawn, N.J.: Oxford University Press, 1945).

১৭. Goverment of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law and Justice, *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh* (As modified up to 31st December, 1986), Proclamation (Amendment) Order No.1 of 1977, (23rd April, 1977),

১৮. M. Judd Harmon, *Political Thougth : From Plato to the Present* (New York : McGraw-Hill Book Company, 1946), পৃঃ ৩৪ ।

১৯. Carl J.Fredrick, *H,* পৃঃ ১০৩ ।

২০. Ernest Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle* (New York : Russell and Russell, Inc, 1959, পৃঃ ১১৭ ।

২১. *কুরআনে* হযরত মুসা (আঃ) কে চাকুরিতে নিয়োগের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "*ইন্না খায়রা মানিছতাজা যারতাল কাওয়িইয়ুল আ'মিন*", অর্থাৎ 'কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে "শক্তিশালী" ও বিশ্বস্ত' (*সূরা কাসাসঃ* ২৬) । মুসলিম গবেষকদের মতে, প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে "শক্তিশালী" শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্মদক্ষতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত

www.amarboi.org

যোগ্যতা; এবং "বিশ্বস্ত" শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নত নৈতিক চরিত্র, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায় বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা, দেখুন, Ibnomer Mohammed Sharfuddin, "Towards an Islamic Administrative Theory" in : *The American Journal of Islamic social Sciences*, vol.4.No.2,December 1987, পৃঃ ২৩৪ ।

২২. *The Speeches and Table-Talk of Prophet Muhammed (SM)*, chosen and translated by Stanley Lane-Poole (New Delhi : Kitab Bhavan, 1979), পৃষ্ঠ ১৬৫ ।

নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১. *North-South : Programme for Sorvival*, Report of the Independent Commission on International Development Issues Under the Chairmanship of Willy Brandt. London : Pan Books, 1980.

২. *কুরআনুল করীম*, ১ম,২য় ও ৩য় খন্ড, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ ।

৩. Aghnides, Nicolas P., *Mohammedan Theories of Finance*. Lahore : The Premier Book House,1961.

৪. Barker, Ernest, *The Political Thought of Plato and Aristotle*. New York : Russell and Russell Inc.,1959.

৫. Chien, Doh joon, *Eastern Intellectuals and Western Solutions : Follower Syndrome in Asia*, Delhi : Vikas Puhlishing Inc., 1975.

৬. Donohue, John, J. and John L. Esposite (eds.) *Islam in Transition : Muslim Perspectives*. New York: Oxpord University Press, 1982.

৭. Hassan, Zafar and C. H. Lai (eds) *Ideas and Realities : Selected Essays of Abdus Salam*. Singapore: World Scientific Publishing Co.,Pte. Ltd., 1984.

৮. Kabir, Humayun, *Science, Democracy and Islam*. London : George Allen and Unwin Ltd.,1955.

৯. Marini, Frank (ed.), *Towards a New Public Administration : A Minnobrook Perspective*, Seranton : Chandler Publishing Company, 1972.

১০. Rawls, John, *A Theory of Justice*. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1971.

১১. Skurski, Roger (ed.) *New Directions in Economic Justice*. Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1984.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

গ. লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতা

১০. লোক-প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ঃ আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি ১৩১-১৪৪
১১. প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা দমনে *অম্বুড্স্ম্যান* (ন্যায়পাল) ১৪৫-১৬৪
১২. লোক-প্রশাসনে নৈতিকতা ১৬৫-১৮১

www.amarboi.org

www.amarboi.org

অপরদিকে, সরকারি প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার তথা নাগরিকদের অধিকারে অন্যায়, অবৈধ বা অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন *রীট* ব্যবস্থা যেমন, হুকুমজারি (*Mandamas*), বন্দি প্রদর্শন (*Habeas Corpus*), উৎপ্রেষণ (*Certiorari*), কারণ দর্শাও (*Co-warranto*) এবং নিষেধাজ্ঞা (*Injunction*) প্রভৃতি।

এছাড়াও প্রশাসনের উপর অনানুষ্ঠানিক বা অতিরিক্ত শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনৈতিক দলসমূহ ও জনমত এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব ইত্যাদি।

প্রশাসনের উপর আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা

বলা হয়ে থাকে যে সরকার আসে ও যায়, কিন্তু আমলাতন্ত্র বা লোক-প্রশাসন টিকে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ ও সাংসদগণ এবং এমনকি, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের (স্থানীয় সরকার) প্রধান ও সদস্যগণ রাজনৈতিক ব্যস্ততা ও প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতার কারণে, দৈনন্দিন প্রশাসনের খুঁটি নাটি কাজের জন্য সরকারি আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। উপরন্তু, আমলাতন্ত্রকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংসদগণের উদাসীনতা এবং এমনকি, নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক রক্ষাকবচসমূহ (যেমন-ন্যায়পাল) উপেক্ষিত হবার কারণে, সরকারি ক্ষমতা কার্যকরভাবে আমলাতন্ত্রের কাছেই থেকে যায়। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের জনগণও সাংবিধানিকভাবে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অতটা সচেতন নয়। এসকল কারণে সরকারি আমলারাও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেন না। এ প্রসঙ্গে জার্মান পন্ডিত Max Weber বলেন, "In a modern state, the actual ruler is necessarily and unavoidably the bureaucracy." [১১]। উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং চাকুরির স্থায়িত্ব, কর্ম অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতিগত কারণে, জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহুবিধ বিষয়ে সরকারি আমলাগণ স্ববিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত (Administrative discretion) প্রদান করে থাকেন। গণতান্ত্রিক সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা দেয়া হলেও কিন্তু জনগণের সেবক হিসাবে পরিগণিত লোক-প্রশাসকদেরকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করার কোন কার্যকর কৌশল আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত লোক-প্রশাসন ব্যবস্থায় নেই।

পূর্বোল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সমষ্টিগত জবাবদিহিতার (Collective responsibility) আড়ালে এবং লোক-প্রশাসকদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা (Political neutrality) ও বেনামীর (Anonymity) ছদ্মাবরণে, সরকারি আমলাগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন [১২]। এর উপর আবার বাংলাদেশের মত নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে প্রচলিত

www.amarboi.org

ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দায়িত্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত *সিভিল সার্ভেন্টসদের* পেশাগত মান ও নৈতিক মূল্যবোধ তাঁদের মধ্যে এক ধরনের প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরা সচেতনভাবে নিজেদের কর্মের মূল্যায়ন নিজেরাই করেন এবং এভাবে তাঁরা সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে অবদান রেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

অপরদিকে,"পদসোপান তত্ত্বের" প্রবর্তকগণ সরকারি আমলাদের আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এই তত্ত্বের বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দায়িত্ববোধ পর্যাপ্ত নয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, সরকারি প্রশাসকগণ প্রশাসনকর্মে স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধী চেতনার সংঘাতে পড়েন [৭]। অতএব, আমলাদের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ নিশ্চিন্তকরণ এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম রোধকল্পে, কিছু বাহ্যিক শক্তিকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন [৮]।

সরকারি প্রশাসনের উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ

সরকারি প্রশাসন বা প্রশাসকদের উপর নিয়ন্ত্রণ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'ধরনের হতে পারে। প্রশাসনিক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্বের পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধঃস্তনের কার্যকলাপ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান; বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন প্রণয়ন; *রুলস অব বিজনেস; সেক্রেটারিয়েট ইন্সট্রাকশন* ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধির প্রয়োগ; হিসাব নিরীক্ষণ; অধঃস্তন কর্তৃক উর্ধ্বতনের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের পর পর কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং 'প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল' [৯] ইত্যাদি।

লোক-প্রশাসনের উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে, প্রশাসনিক সংগঠনের উপর আইন সভা ও বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ। একে শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণও বলা হয়ে থাকে। আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে সংসদে প্রশ্নোত্তর, বাজেট অনুমোদন ও অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং সংসদীয় কমিটি (Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates এবং Committee on Government Assurances) গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন। এছাড়াও রয়েছে 'ন্যায়পাল' [১০] প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত নাগরিকদের অভিযোগ পর্যালোচনা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা। আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল বিভাগীয় দপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসনে মূল্যায়নের সমস্যা

উৎপাদিত পণ্য বা সেবার পরিমান, গুণাগুণ, সময় অথবা লাভ খরচের মানদন্ডে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম মূল্যায়ন সম্ভবপর হলেও এসকল মানদন্ডে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত অলাভজনক সামাজিক সেবামূলক কর্ম যেমনঃ শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজ কল্যাণ ইত্যাদির মূল্যায়ন অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। এজন্য লোক-প্রশাসনে সরকারি আমলাদের নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে যাতে তাঁরা কর্তব্যকর্মে দায়িত্ববান থাকেন [৪]। এই প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার সবচাইতে বিস্তৃত ও কালজয়ী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন L.D.White. White-এর মতে, জবাবদিহি হচ্ছে, "সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত বিধিমালা ও পূর্ব দৃষ্টান্ত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগ আচরণ যার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের সরকারি কর্মের জন্য জবাবদিহি করা যায়" [৫]। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন লোক-প্রশাসনবিদ্ লোক-প্রশাসনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহি ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই আলোচনায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিকে প্রায় সমার্থক হিসাবে ধরা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারের ভূমিকা সম্প্রসারিত হবার সাথে সাথে, সরকারি নীতি প্রণয়ন ও নাগরিক জীবনে লোক-প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। এই পরিস্থিতিতে, একদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির প্রবণতা রোধ এবং অপরদিকে, নাগরিক সাধারণের সাথে আচরণে আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধকল্পে, লোক-প্রশাসনের উপর একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ। গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে, জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হবে দেশের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে, কিভাবে একটি সুসংবদ্ধ আমলাতন্ত্রকে বিস্তৃত পরিসরে অসংগঠিত জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে অথবা জনস্বার্থ পরিপন্থী কোন আচরণ থেকে বিরত রাখা যায়? এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে তত্ত্ববিদ্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বিষয়ক নানা বিতর্ক।

লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতার ব্যাপারে তাত্ত্বিক বিতর্কঃ 'যুক্তিবাদী তত্ত্ব' বনাম 'পদসোপান তত্ত্ব'

লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতার ব্যাপারে বহুল আলোচিত দু'ধরনের মতবাদের মধ্যে একটি হচ্ছে, "যুক্তিবাদী তত্ত্ব" (Rationalist theory);এবং অপরটি হচ্ছে,"পদসোপান তত্ত্ব" (Hierarchical theory) [৬]। "যুক্তিবাদী তত্ত্বের" বক্তব্য হচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাঁদের পেশাগত নৈতিকতা ও

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা : আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি*

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে অর্থলগ্নি সংস্থাসমূহের সমন্বয়কারী সংগঠন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশের উপর প্রকাশিত এক রিপোর্টে গভীর উদ্বেগের সাথে উল্লেখিত হয়েছে যে, "The government agencies are unresponsive to people's needs and the citizens lack effective means of obtaining redress when officials abuse their power..." [১]। আধুনিক বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল প্রকার দেশেই সরকারী নীতিসমূহ কার্যকর করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে একদল সুসংগঠিত কর্মী বাহিনী। লোক-প্রশাসন হচ্ছে পদসোপান ভিত্তিক সংগঠিত এসকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ কর্ম প্রক্রিয়া। এই কর্ম প্রক্রিয়ার চারটি প্রধান পর্যায়ক্রমের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে ঃ 'পরিকল্পনা প্রণয়ন', কর্মচারীদের 'সংগঠিতকরণ', 'পরিচালনা' ও 'মূল্যায়ন' [২]। পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় লোক-প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যথানিয়মে কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য (জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা জনগণের কল্যাণ) অর্জিত হচ্ছে কি? লোক-প্রশাসকগণ যথাযথভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন কি? জনগণ প্রশাসনের কাছ হতে প্রয়োজনীয় সেবা ও সরবরাহ পাচ্ছে কি? ইত্যাদি। এসকল বিষয় জানার জন্য লোক-প্রশাসনে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল পরিকল্পনা, সংগঠন ও নেতৃত্বে (কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকলে) প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসন চক্রকে সঙ্গতিপূর্ণ করে পুনরাবৃত্তি করা হয়। এমনকি, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনাকারী স্বয়ং আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রতি মুহূর্তে (মূল্যায়নের মাধ্যমে) তাঁর (পূর্ব) পরিকল্পনা রূপায়ণে রত (*আল-কুরআন*, ৫৫ঃ২৯)। Garry Dessler-এর মতে, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি ধাপ সন্নিহিত ঃ ১) কাজের মান নির্ধারণ; ২) উক্ত মানের বিপরীতে কর্ম পরিমাপ; এবং ৩) নির্ধারিত মান থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার সংশোধন [৩]। বক্ষ্যমান নিবন্ধে লোক-প্রশাসনকে জনমুখীকরণ বা জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি করার ব্যাপারে আধুনিক সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি, ইসলামী পদ্ধতিও তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

---

*সৌজন্যে: *জার্নাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন*, ভল্যুম ৪-৫,নং-১, ১৯৯৮-৯৯,পৃ.৭৬-৮৮।

www.amarboi.org

ন্যায়পাল আইনের উল্লিখিত ধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন। তদুপরি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক শব্দগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা নির্ধারিত না থাকায়, যে কেউ এর অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে জনস্বার্থ সংরক্ষক হিসেবে ন্যায়পালের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দকে ন্যায়পাল আইনের যে কোন ধারা কার্যকর করা হতে অব্যাহতি দিতে পারা সম্পর্কিত যে অনুবিধি রাখা হয়েছে (ধারা নং ১৫), তা সুষ্ঠুভাবে ন্যায়পালের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ন্যায়পাল যাতে দ্রুততার সাথে জনগণের অভিযোগসমূহের তদন্ত সম্পাদন ও সাফল্যজনকভাবে মামলার নিষ্পত্তি করতে পারেন, সেজন্য তাঁকে সহায়তা দিতে কিছু দক্ষ ও যোগ্য সহকারি নিয়োগের ব্যবস্থা বিদ্যমান আইনে রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাঁদের যোগ্যতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ন্যায়পালের জন্য যে ধরনের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও বারো কোটি জনগোষ্ঠীসম্পন্ন এদেশে দুই বা ততোধিক সহকারি ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হলে, মামলার চাপ এড়ানো সম্ভবপর হবে বলে বিশ্বাস।

অবশ্য ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হলেও যে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হয়ে যাবে বা রাতারাতি জনগণের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে, এমন প্রত্যাশা করা সঙ্গত হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি আমলাতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোক-প্রশাসকদের নৈতিকতা ও আচরণে জনসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো। তবে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, দীর্ঘদিনের বহু প্রত্যাশিত ন্যায়পাল পদে সবার আস্থাশীল ন্যায়বান কাউকে নিয়োগ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ন্যায়পাল যেন স্বাধীনভাবে তাঁর কাজ করতে পারেন তার পরিবেশ নিশ্চিত করা। কোনরূপ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপ বা আর্থিক নিয়ন্ত্রণ যেন ন্যায়পালের যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে, সে বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

উপসংহার

সম্প্রতি উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে লোক প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা হতে জনগণের রক্ষাকর্তা হিসেবে, সুইডেনের অনুকরণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ন্যায়পাল হচ্ছে সরকারের আইন বা শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা যিনি প্রশাসনিক কর্মের বিরুদ্ধে জনগণের কাছ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে, এর সমাধান নির্দেশ করেন। এশিয়া,আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বর্ধিতহারে সরকারের অংশগ্রহণের সাথে সাথে, একদিকে যেমন সরকারের উপর জনগণের নির্ভরশীলতা বেড়েছে, অপরদিকে ঘটেছে আমলাতন্ত্রের সম্প্রসারণ। উপরন্তু, উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ

www.amarboi.org

সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে [৪৩]। নতুবা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী (তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ন্যায়), সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পর্যায়ক্রমে ন্যায়পাল পদে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

ন্যায়পাল আইনের ২নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট সন্দেহাতীত সততার অধিকারী বলে পরিচিত এবং আইনগত 'অথবা' প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবেন। কিন্তু আইনগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রশাসনিকর দক্ষতার অধিকারী নাও হতে পারেন। আবার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারও আইনগত দক্ষতা নাও থাকতে পারে। ন্যায়পাল যেহেতু প্রশাসনিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনাপূর্বক সমস্যার আইনগত সমাধান নির্ধারণ করবেন, সেহেতু তাঁর আইনগত ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য। অতএব, ন্যায়পাল নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত হিসেবে আইনগত ও প্রশাসনিক দক্ষতার মাঝখানে যে 'অথবা' শব্দটি যোগ করা হয়েছে, তা পরিবর্তন করে তদস্থলে 'এবং' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। তদুপরি, সন্দেহাতীত সততার অধিকারী ধারণাটিকে বিভিন্ন সূচকের সাহায্যে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যায়িত করা প্রয়োজন।

বিদ্যমান আইনে ন্যায়পালের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ বছর [ধারা-৪(১)]। কিন্তু যেহেতু পার্লামেন্ট ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর, সেহেতু সংসদীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যায়পালের মেয়াদকালও পাঁচ বছর নির্ধারণ করা হলে, তা প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব পালনকে সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল করার ব্যাপারে সহায়ক হবে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কৃতির বিবেচনায়, ন্যায়পালকে পুনঃনিয়োগের ধারাটি রহিত করা প্রয়োজন।

ন্যায়পাল আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী, কোন তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ন্যায়পাল যে কোন সরকারি কর্মকর্তা অথবা যে কোন ব্যক্তি যিনি তাঁর বিবেচনায় তথ্য প্রদানে সক্ষম অথবা তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপস্থাপনে সক্ষম, তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও সাক্ষ্য প্রদান অথবা প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারবেন (উপধারা-১)। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, উল্লেখিত আইনের ৫নং উপধারায় পুনরায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অথবা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিঘ্নিত হতে পারে অথবা মন্ত্রীপরিষদের কার্যবিবরণী প্রকাশ পেতে পারে এমন কোন তথ্য সরবরাহ অথবা প্রশ্নের জবাব প্রদান অথবা দলিলাদি উপস্থাপন করতে পারবেন না। এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সরকারের সেক্রেটারী পর্যায়ের কর্মকর্তার হাতে যিনি ন্যায়পালের তদন্তে প্রত্যাশিত কোন তথ্য, জবাব অথবা সরকারি দলিলের অংশবিশেষ উল্লেখিত ধরনের কিনা সে ব্যাপারে সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। অনেকেই মনে করেন যে, এ ব্যবস্থাটি আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ন্যায়পালের ধারণার পরিপন্থী [৪৪]। সেক্রেটারি নিজেই আমলাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাঁর নিজস্ব অথবা গোষ্ঠীগত স্বার্থ (Corporate interest) অথবা রাজনৈতিক চাপের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। এজন্য সুশীল সমাজে সরকারি কর্মের স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার প্রয়োজনে

www.amarboi.org

(আইনগত ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (তিন বছর) ন্যায়পাল পদে নিয়োগ প্রদান করবেন। ন্যায়পাল লোক-প্রশাসন কর্তৃক অবিচার বা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন এমন কোন নাগরিকের কাছ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কোন মন্ত্রণালয়, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন। ন্যায়পাল ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে অভিযোগ পেশ করতে কোন জটিল আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ বা কোনরূপ ফি এর প্রয়োজন হয় না। কারও অভিযোগ উত্থাপন ছাড়াও সংসদীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে *Sou motu* অর্থাৎ ন্যায়পাল নিজস্ব উদ্যোগে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা বা দুর্নীতির ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন। এ জাতীয় যে কোন তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আওতায় দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা ন্যায়পালের থাকবে। এছাড়া তদন্ত অনুষ্ঠানকালে ন্যায়পাল যদি দেশের প্রচলিত আইনে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেন, তা সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশও পেশ করতে পারবেন।

তদন্ত শেষে ন্যায়পাল যে অপশাসন (Maladministration) বা প্রশাসকের কর্ম দ্বারা (অভিযোগকারী) নাগরিকের প্রতি অবিচার করা হয়েছে (বলে প্রমাণিত হয়), তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধনীর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ প্রাপ্তির এক মাস সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সেব্যাপারে লিখিতভাবে ন্যায়পালকে অবহিত করবেন। এছাড়াও ন্যায়পাল তাঁর কার্যাবলী সম্পন্নকরণ সম্পর্কিত একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক তা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদান করবেন যার উপর রাষ্ট্রপতির নোট সহকারে আলোচনার জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে। সংসদে এ জাতীয় আলোচনা ও পত্র-পত্রিকায় এর ব্যাপক প্রচারণা, সরকারি আমলাদেরকে সর্তক হতে এবং তাদের স্বেচ্ছাচারিতা, হয়রানি ও দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধে কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে বলে বিশ্বাস। এভাবে ন্যায়পাল অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে প্রশাসনিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ন্যায়পাল আইন ১৯৮০ ঃ কিছু অসঙ্গতি, কিছু সুপারিশ

বাংলাদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত আইনটি ১৯৮০ সালে প্রণীত হলেও আজ অবধি এটিকে সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি। উক্ত আইনের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "পার্লামেন্টের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগ প্রদান করিবেন।" এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দলীয় আনুগত্যের বিবেচনায় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে মনোনীত না করে ন্যায়পাল পদটিকে পার্লামেন্টে সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রদান করা সম্ভব হলে, জাতীয়ভাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে

www.amarboi.org

নিয়োগের ব্যাপারে সরকারগুলোর এত অনীহার কারণ কি? লেখকের মতে, তিনটি প্রধান কারণ এর জন্য মূলতঃ দায়ী। প্রথমত, রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের মধ্যে এ ব্যাপারে সদিচ্ছা বা প্রতিশ্রুতিশীলতার অভাব; দ্বিতীয়ত, সরকারি নীতি নির্ধারণে আমলাতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থান ও ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমলাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি; এবং তৃতীয়ত, অসংগঠিত জনসাধারণ কর্তৃক নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সুসংগঠিত উপায়ে চাপ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলিটবৃন্দ খুব একটা আগ্রহী না হওয়ার কারণ একটাই। আর তা হচ্ছে, উভয়ই স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ। ন্যায়পাল শুধু প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেই তদন্ত করার অধিকার রাখেন না, এম.পি.ও মন্ত্রীদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তদন্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সম্ভবত এজন্যই রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এলিটবৃন্দ মনে করেন যে, ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাংবিধানিক দায়িত্বটি কার্যকর করার প্রক্রিয়াকে যতই বিলম্বিত করা যায়, ততই তাঁদের জন্য মঙ্গলজনক। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী বিগত সরকারগুলি সম্পর্কে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "ন্যায়পালের নিয়োগ না দিয়ে তারা দেশবাসীর প্রতি অন্যায় ও অবিচার করেছেন" (দেখুন "ন্যায়পাল থাকলে দুর্নীতির ঘটনা কমে যেত", *প্রথম আলো*, ১৮ই মে, ২০০৩ ইংরেজী)। বিগত দু' দশকের রাজনৈতিক ধারা প্রক্রিয়ায় উল্লেখিত দু'ধরণের শাসক এলিটদের সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে নব্য ব্যবসায়ী এলিট শ্রেণী। সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে "জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক" বলে উল্লেখিত হলেও বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর সৃষ্ট সংস্কৃতিতে কালো টাকা ও পেশী শক্তিই হচ্ছে ক্ষমতা অর্জন ও ক্ষমতায় টিকে থাকার বাস্তব ভিত্তি।

তবে আশাপ্রদ অগ্রগতি হচ্ছে, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এসে কিছু কিছু মানবাধিকার সংগঠন ও জনস্বার্থ সচেতন চিন্তাবিদ-লেখক জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সংবিধানে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন। বাংলাদেশের বর্তমান লোক-প্রশাসনের অদক্ষতা, গতিহীনতা ও দুর্নীতির কথা উল্লেখপূর্বক সাম্প্রতিককালে বিদেশী অর্থলগ্নী সংস্থাসমূহও প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনে, ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে [৪১]। সরকারও ইদানিং ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানানো হচ্ছে [৪২]। সংবাদটি সত্য হলে তা হবে এদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ দেড় যুগেরও অধিককাল পূর্বে পার্লামেন্টে প্রণীত *The Ombudsman Act*, ১৯৮০-কে সময়োপযোগী ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য এর কিছু কিছু ধারায় পরিবর্তন আনার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

ন্যায়পাল আইনের সারকথা

১৯৮০ সালে প্রণীত ন্যায়পাল আইনের ১৮টি অনুচ্ছেদজুড়ে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সুপারিশক্রমে দেশের একজন সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন

www.amarboi.org

দীর্ঘসূত্রতার ভুক্তভোগী জনসাধারণের অভিযোগ শোনা, গ্রহণ করা বা প্রতিকারের ব্যবস্থা সাধারণত থাকে না। এমনকি, কোন আবেদন গৃহীত বা নাকচ হলে সে খবরটুকুও পাওয়া যায় না" [৩৪]।

জনগণের জন্য এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটিয়ে প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষে, অবিলম্বে ন্যায়পালের নিয়োগ প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া এর চতুর্থ রিপোর্টে সুপারিশ করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও কমিশনের রিপোর্টে ১৯৮০ সালে প্রণীত ন্যায়পাল আইনটিকে সংশোধন করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জনগণের 'হয়রানি' ও 'অসদাচরণ'কেও অপশাসন (Maladministration) হিসেবে বিবেচনা করার এবং এ বিষয়ে তদন্তকে ন্যায়পালের কার্যপরিধির আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে[৩৫]।

অপরদিকে, নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে অনেকটা স্বাধীন করা হলেও রাজনৈতিক চাপ ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের কারণে বিচারের রায়সমূহ প্রভাবিত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে [৩৬]। নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত নিম্ন আদালতসমূহে জনগণ অহেতুক হয়রানি, দীর্ঘসূত্রতা ও অবিচারের সম্মুখীন হচ্ছে বলে প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি জেলা সদরে অবস্থিত কোর্ট বিল্ডিংগুলো যেন Legal torture camp! সম্প্রতি প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টেই নব্বই হাজারেরও বেশি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। [৩৬] বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, নিম্ন আদালতের অবস্থা আরও করুণ [৩৭]! সুতরাং সচিবালয় ও আদালতের উপর মামলার চাপ কমাতে হলে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য, দেশে ন্যায়পালের নিয়োগ অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি Legislative Advocacy and Participation of the Civil Society (LAPCS) কর্তৃক দেশের ছয়টি বিভাগে কর্মরত আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী (ডাক্তার ও প্রকৌশলী) ও ব্যবসায়ীদের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দেশের শতকরা ৯৫.৮০ ভাগ শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক মনে করেন যে, সরকারি প্রশাসকদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং তাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায়পাল নিয়োগ করা প্রয়োজন। [৩৮] নূরুন্নবী চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটিও জরুরী ভিত্তিতে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম শুরু করার জন্য একটি প্রভিশনাল কাঠামো সুপারিশ করেছে [৩৯]।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আজ অবধি বাংলাদেশে ন্যায়পাল পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। একটি জাতীয় দৈনিকে আক্ষেপ করে মন্তব্য করা হয়েছে,"বর্তমান সরকার (১৯৯৬ সালের নির্বাচন উত্তর) ক্ষমতায় আসার পরপরই প্রশাসনে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল নিয়োগের অঙ্গীকার করেছিল। এই লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল... (কিন্তু) জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেও ন্যায়পাল নিয়োগকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি। ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি যেমন বাস্তবতার রূপ পায়নি, প্রশাসনে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও সেবামূলক মনোভাব প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও তেমনি রয়েছে 'অঙ্গীকার ঘোষণার বৃত্তে আবদ্ধ" [৪০]। প্রশ্ন হতে পারে, ন্যায়পাল

www.amarboi.org

আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে হাজার হাজার ফাইল এগুচ্ছে না... বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে পূর্ত মন্ত্রণালয় পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র একই অবস্থা। শিক্ষা,ভূমি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য, অর্থ, বস্ত্র, মৎস্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর ও অধিদফতরের প্রায় সর্বত্রই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ফাইল নড়ছে না বছরের পর বছর ধরে... অত্যন্ত সহজ একটি কাজ, তবুও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ঘূর্ণিপাকে অগ্রসর হচ্ছে না...এ কারণে সচিবালয়ে তদ্বিরকারীদের সংখ্যা বাড়ছে।" এছাড়াও সরকার কর্তৃক গঠিত, The Public Administration Reform Commission (PARC) কর্তৃক লোক-প্রশাসনকে গতিশীল ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া রিপোর্টেও উল্লেখিত হয়েছে যে, "...Ministries / Departments of Subordinate Organzations do not honour the citizens rights in this regard (Regarding necessary administrative decision or action within reasonable time on a letter to the government on any matter) causing physical and mental harassment and monetary losses to the people" [৩৩]।

PARC-এর নিরীক্ষা ও সুপারিশের উপর ভিত্তি করে রচিত নিম্মোক্ত সংবাদ বিবরণীতে বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ব্যবস্থায় জনগণের ভোগান্তি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক ঃ "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে অদক্ষতা, অবহেলা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব ও দুর্নীতি বর্তমানে যে স্তরে পৌঁচেছে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গীকারবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও স্বল্প মেয়াদে এর আমূল পরিবর্তনের আশা করা অবাস্তব। সচিবালয় থেকে শুরু করে প্রশাসনের সকল স্তরে অনেক ক্ষেত্রেই সেবার পরিবর্তে জনগণের ভাগ্যে জোটে হয়রানি ও অবর্ণনীয় কষ্ট ...ঔপনিবেশিক ধাঁচের প্রশাসনে এখনও আগের মতোই রয়েছে লাল ফিতার দৌরাত্ম... প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণের একটি প্রবণতা রয়েছে...অধিদফতর-পরিদফতর বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাজ মন্ত্রণালয়ে হচ্ছে; থানা অফিসের কাজ রাজধানীর সদর দফতর ছাড়া হয় না...আইন-বিধিগত দায়িত্ব পালনকারী স্তরে দায়িত্ব গ্রহণে অনীহাই এর কারণ। এ অবস্থায় একজন নাগরিক যে সেবা থানা পর্যায়ে পাওয়ার অধিকারী, তার জন্য তাকে জেলা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিদফতরের রাজধানীস্থ প্রধান কার্যালয়ে এমনকি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।

জনগণকে সবসময়ই নানা প্রয়োজনে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয় হতে শুরু করে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন অফিস ও সেখানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। আর তা করতে গিয়ে তারা পদে পদে যে বিব্রতকর অবস্থার মুখে পড়েন, কমিশনের রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ সরকারি অফিসেই কোন তথ্য ও সহায়তা কাউন্টার নেই। কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে জনসাধারণের কোন প্রশ্ন বা সাহায্য প্রার্থনাকে অনাকাঙ্খিত মনে করার এবং এধরনের চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করার প্রবণতা রয়েছে। সেবা হতে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই বঞ্চিত এবং অসহযোগিতা বা

www.amarboi.org

Ombudsman Act, 1980 নামে একটি আইন সংসদে পাশ করানো হয়। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে *বিএনপি* সরকারের উদ্যোগে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা এবং এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আনীত বিলের উপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তৎকালীন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান বলেছিলেন : "ন্যায়পাল যিনি হবেন, দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর তিনি আস্থাভাজন হবেন। এরকমের লোক আমরা ইন্‌শাল্লাহ্ খুঁজে বের করবো। Ombudsman এর arms যত wide হবে, তত লোক এর অধীনে আসবে। কোন মন্ত্রীও বাদ থাকবেন না, প্রধানমন্ত্রীও বাদ থাকবেন না। সংসদ সদস্য যে দিকেরই হোক—সবাই এর আওতায় আসতে হবে। এ ধরনের ইনষ্টিটিউশন থাকলে আমাদের ধারণা, অচিরেই আমাদের দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে"। ১৯৮০ সালের ২রা এপ্রিল বিলটি ধ্বনিভোটে সংসদে পাস হবার পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৭ই এপ্রিল তাতে সই করেন এবং ৯ই এপ্রিল তা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ১৯৮০ সালের ১৫ নম্বর আইন। উল্লেখ্য যে, পরের বৎসরই বিচারপতি সাত্তারের সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায়বিচার লাভের সুবিধার্থে প্রণীত হয় *The Administrative Tribunal Act, 1981*। এই আইনটি কার্যকর হলেও ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ এখনও অকার্যকর রয়েছে। এই আইনের এক নম্বর ধারার দুই উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে তারিখ নির্ধারণ করবে, সে তারিখ হতেই আইনটি কার্যকর হবে।

কিন্তু জিয়া, সাত্তার ও এরশাদ সরকার কেন এই আইনটি কার্যকর করেনি এবং কেনইবা বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এ ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা পালন করে চলেছে, তা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। পুনরায় নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দেশে গনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর, ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন *বিএনপি* সরকারের সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটি ন্যায়পালের কার্যধারা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন সফরে যায়। দুই সপ্তাহব্যাপী উক্ত সফরের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়পাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ এবং দেশে ফিরে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারের ভেতর থেকেই এর বিরোধিতা সৃষ্টি হওয়ায়, উদ্যোগটি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়।

সংসদে ন্যায়পাল সম্পর্কিত আইন পাশের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, ন্যায়পাল পদে নিয়োগ সম্পর্কিত সংবিধানের ধারাটি বাস্তবায়িত না হওয়াটা এদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অথচ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ন্যায়পাল পদটির গুরুত্ব অপরিসীম। নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিদিন গড়ে বিশ হাজার লোক ঢাকা সচিবালয়ে ধর্ণা দেয়। এর প্রধান কারণ হিসেবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে দায়ী করে বিগত ২৬ ডিসেম্বর (১৯৯৮) ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে চার কলামজুড়ে ব্যানার হেডিং-এ উল্লেখিত হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও কার্যকর হচ্ছে না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। হাজার হাজার ফাইল আটকে আছে"[৩২]। উক্ত সংবাদ শিরোনামের আওতায় লেখা হয়েছে, "(বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে)

www.amarboi.org

দীর্ঘ ষোল বছর পরও জানতে পারেননি তাকে চাকুরিচ্যুত করার কারণ [২৮], আর আদালতের রায় পাওয়ার পরও সোনালী ব্যাংকের বরগুনা কোর্ট বিল্ডিং শাখার গাজী নাসিরুদ্দীন আজও পুর্নবাসিত হননি তাঁর পূর্বপদে [২৯] ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার সঙ্কট ও সম্ভাবনা

এক দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমিতে রয়েছে শত বছরব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আজাদীর লড়াই, মুসলিম জাতীয়তাভিত্তিক ১৯৪৭ -এর ভারত বিভক্তি, ১৯৪৮-৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-৬৯-এর সামরিক শাসন বিরোধীগণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে, "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারক" প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে [৩০]। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে দীর্ঘকালীন ব্রিটিশ-পাকিস্তানি শাসনামলে গড়ে ওঠা জটিল প্রশাসনিক কাঠামো, বিধি-বিধান ও ঔপনিবেশিক মন-মানসিকাতাসম্পন্ন আমলাদের নিয়ে। স্বাধীনতাকে সুসংহতকরণের পাশাপাশি, দ্রুত দেশের সমৃদ্ধি অর্জন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার তথা লোক-প্রশাসনের দায়িত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় সেবা ও সরবরাহ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের উপর জনগণের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বহুবিধ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসকদের স্ববিচেনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত (Administrative Discretion) প্রদানের ক্ষমতা। এদের হাতে স্বাধীন দেশের নাগরিক সাধারণের মর্যাদা ও অধিকার কতদূর সংরক্ষিত হতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনা করেই, ১৯৭২, সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

আমাদের সংবিধানের ৭৭ (১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবে" [৩১]। ন্যায়পালের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সম্পর্কেও সংবিধানের ৭৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্ম সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবে, ন্যায়পাল সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন"। এছাড়াও ন্যায়পাল "তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে" [৭৭(৩)]।

কিন্তু স্বাধীনতাউত্তরকালের সরকারগুলো (এমনকি সংবিধান প্রণয়নকারী তদানীন্তন সরকারও) জনস্বার্থের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিক কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি। সংবিধান প্রণয়নের আট বছর পর, ১৯৮০ সালে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্ধারণের জন্য *The*

www.amarboi.org

কর্মকর্তা বা কর্মচারির সাথে, যিনি আবেদন বা অভিযোগ গ্রহণ করেন অথবা সেবা বা সরবরাহ প্রদান করে থাকেন। সরকারি আমলাতন্ত্রের মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার ও সমষ্টিগত বা সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রতি প্রশাসকদের আচরণে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায়। বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের পক্ষে অনেক সময় জটিল, ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘসূত্রতার জালে আবদ্ধ আইন-আদালতের আশ্রয় নেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। Hing Young Cheng -এর মতে, "আসলে কোর্ট পদ্ধতির আনুষ্ঠানিকতা এবং এর নিশ্চেষ্ট ভূমিকা প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অভিভাবকরূপে বিচার বিভাগের ভূমিকাকে প্রতিহত করে" [২৩]।

নিচের স্তরে অবস্থিত জনগণের সাথে সরকারি আমলাদের যে মিথস্ক্রিয়া হয়, তার উপর সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা খুবই কম হয়েছে বলতে হবে। লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি করার যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাতেও জনগণের সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারি আমলাদের যে মিথস্ক্রিয়া হয় তার প্রতিফলন ঘটে না। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক অবিচার থেকে নাগরিকদের রক্ষাব্যবস্থা (Citizen's defender) হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য নতুন কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আর এজন্যই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে প্রচলিত ন্যায়পালের প্রতি ক্রমশ উন্নয়শীল বিশ্বের দেশগুলোর আগ্রহ বেড়ে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ন্যায়পালকে সফলভাবে গ্রহণ করেছে ইসরাইল, ঘানা, মৌরিতানিয়া ও ফিজি। এক হিসাব মতে, ইসরাইলিদের মধ্যে প্রতি বিশ জনের মধ্যে গড়ে একজন প্রতি বছর ন্যায়পালের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে [২৪]। এ সকল অভিযোগ গ্রহণের একদিনের মধ্যেই প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। অধিকাংশ অভিযোগ দশদিন থেকে এক মাসের মধ্যে তদন্ত ও প্রতিকার করা হয় [২৫]। বাংলাদেশে ন্যায়পাল নেই। আর নেই বলেই ভিত্তিহীন অভিযোগে চাকরিচ্যুত দিনাজপুরের ফুলবাড়িয়া কলেজের অধ্যাপক জগন্নাথ দাস আজও সুবিচার পাননি [২৬], মুক্তিযোদ্ধা এমদাদুল হক (এককালের মহকুমা খাদ্য কর্মকর্তা) বারো বছর ধরে চেষ্টা করেও ফিরে পাননি তার সরকারি চাকরি [২৭], গণপূর্ত অধিদফতরের সহকারি সচিব আহমেদ

প্রথম আলো

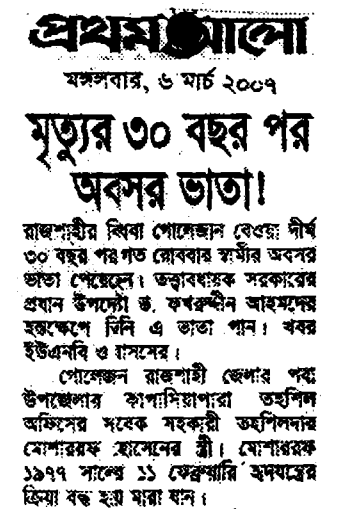

মঙ্গলবার, ৬ মার্চ ২০০৭

মৃত্যুর ৩০ বছর পর অবসর ভাতা!

রাজশাহীর বিধবা গোলেজান বেওয়া দীর্ঘ ৩০ বছর পর গত রোববার স্বামীর অবসর ভাতা পেয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের হস্তক্ষেপে তিনি এ ভাতা পান। খবর ইউএনবি ও বাসসের।

গোলেজান রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কাপাশিয়াপাড়া তহশিল অফিসের সাবেক সহকারী তহশিলদার মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী। মোশাররফ ১৯৭৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

গোলেজান তখন সব শর্ত পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে স্বামীর অবসর ভাতার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ের এক কেরানির দাবিকৃত ঘুষ দিতে না পারায় দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়েও তিনি সরকারি এই সুবিধা পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, গত ২ মার্চ দেশের একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিকে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ হলে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। গোলেজান ৪ মার্ চ [illegible] ভাতা পান।

বৃদ্ধি। একদিকে রয়েছে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব, এবং অপরদিকে, দ্রুত উন্নয়নের তাগিদ– পরিণতিতে ক্রমেই উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকার ব্যবস্থা সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে [২২]। পরবর্তীকালে এদের সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে ব্যবসায়ী এলিট শ্রেণীর। এসকল আমলা এলিট শ্রেণী তাদের উচ্চতর শিক্ষা, ঔপনিবেশিক শাসন আমলে জনগণের উপর প্রভুত্ব করার অভিজ্ঞতা ও মন-মানসিকতা এবং ভাষা ও আচার-আচরণে, জনজীবন বিচ্ছিন্ন পৃথক এক সমাজ। কিন্তু এরাই উন্নয়নশীল দেশসমূহে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান যেমন– প্রেসিডেন্ট, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ, পরিকল্পনা কমিশন, সচিবালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের প্রধান নির্বাহী পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। সুতরাং উন্নয়নমূলক জাতীয় সিদ্ধান্তসমূহ সবসময়ে এইসব মুষ্ঠিমেয় শাসক এলিট (Ruling Elite) শ্রেণীর স্বার্থেই যে প্রণীত হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ও উপেক্ষিত। সকল কর্মসূচিগুলো আমলাতান্ত্রিকভাবে ধারণাকৃত, আমলাতান্ত্রিকভাবে বাস্তাবায়িত এবং আমলাতান্ত্রিকভাবে মূল্যায়িত। লোকের জন্য লোক-প্রশাসন--এ কথাটি বক্তৃতা-বিবৃতিতে বার বার বলা হলেও, লোক বা জনগণ পড়ে আছে শুধু গ্রহণ প্রান্তে (Receiving end)।

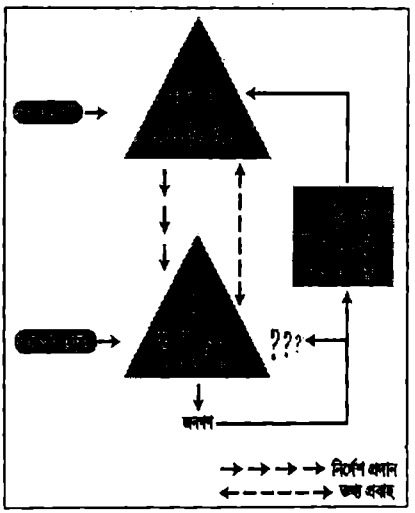

সমাজ বিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণাও কিন্তু উপরের স্তরের এইসব প্রশাসনিক এলিটদের আচরণ ও কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করেই রচিত। লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতার যে সাংবিধানিক বিধান রয়েছে, তাও উপরের স্তরের আমলাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করে। ফলে প্রশাসনিক পদসোপানের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত জনগণ থেকে তাদের সমস্যা ও দাবি সম্পর্কিত উপকরণ (Input) অথবা প্রশাসনিক কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া (Feedback) সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রান্তে পৌছানোর কোন পথই খোলা নেই। সমাজের ক্ষুদ্র মানুষটি যার ট্যাক্সের পয়সায় সরকারী আমলারা লালিত, লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় তিনি দারুণভাবে উপেক্ষিত। তার প্রতি সহানুভূতিশীল অথবা তার অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় এমন কোন ব্যবস্থা লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় নেই।

সত্যিকার অর্থে, জনগণের সাথে প্রাত্যহিক মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) হয় সর্বনিম্ন স্তরের আমলাদের সাথে। একজন নাগরিক সরকারে নিকট কোন বিষয়ে আবেদন বা অভিযোগ নিয়ে গেলে, তিনি প্রথমে মুখোমুখি হন সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিচের স্তরে অবস্থিত

www.amarboi.org

এবং এবিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৯৭৮ সালে কানাডার অটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে International Ombudsman Institute (IOI) যার কার্যক্রম এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও প্যাসিফিক, ইউরোপ এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জসহ উত্তর ও ল্যাটিন আমেরিকা-এই পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান (১৯৭২) এবং ১৯৭৩ সালে প্রণীত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী, ১৯৮৩ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশবলে *Wafaqi Mohtasib* নামে সে দেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিচারপতি সরদার মোহাম্মদ পাকিস্তানের প্রথম *মুহ্‌তাসিব* হিসেবে চার বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্তি লাভ করেন, যিনি তাঁর সময়কালে দেড় লক্ষাধিক অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টে পাঁচবার (১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৮৯) ন্যায়পাল (*লোকপাল*) প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিল উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি কর্তৃক বিল নিরীক্ষাধীন থাকা অবস্থায় পার্লামেন্টের বিলুপ্তি ঘটায়, আজ অবধি সে দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে সফল না হলেও, ভারতের ১০টি রাজ্যে (অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্রে, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ) *লোকায়ুক্ত* নামে লোক-প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে গণ অভিযোগ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান কার্যরত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও (৭৭ নং অনুচ্ছেদ) আইনসভা কর্তৃক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে, কিন্তু আজ অবধি নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক সংবিধানের উল্লিখিত ধারাটিকে কার্যকর করা হয় নি!

ন্যায়পালের প্রকারভেদ

ন্যায়পাল দু'ধরনের হতে পারেঃ "আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল" (Legislative Ombudsman) এবং "শাসন বিভাগীয় ন্যায়পাল" (Executive Ombudsman)। আইনসভা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হলে সেই ন্যায়পালকে "আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল" বলা হয়। এ ধরনের ন্যায়পাল তাঁর কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, নিউজিল্যান্ডের ন্যায়পাল। অপরদিকে, যে সকল ন্যায়পাল শাসন বিভাগ (অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) কর্তৃক নিয়োজিত হন এবং কার্যাবলীর জন্য শাসন বিভাগের নিকট দায়ী থাকেন, তাঁদেরকে "শাসন বিভাগীয় ন্যায়পাল" বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ার ন্যায়পাল।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে ন্যায়পালের গুরুত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেসব দেশের সরকারসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ক্রমবর্ধমানহারে সরকারের অংশগ্রহণের অর্থই হচ্ছে, সমাজ জীবনে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি বৃদ্ধি পাওয়া। আর এজন্য প্রয়োজন হয় আমলাতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা

www.amarboi.org

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সে সময়ে সক্রিয় *দিওয়ান-আল-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্ত কারী) এবং *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) প্রতিষ্ঠান দু'টি রাজা চার্লসের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে [১৯]। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে রাজা দ্বাদশ চার্লস রাজ কর্মচারীদের আইন বিরোধী ও নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসেবে, ইসলামী আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাব্যবস্থার আদলে Justiti Ombudsman (JO) এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য Consumer Ombudsman (KO) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন [২০]। পরবর্তীকালে রাজা গাসটাভ (King Gustava) ১৮০৯ সালে সরকারি প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার রিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক সংসদীয় প্রতিষ্ঠানটির সুইডিশ নামকরণ করেন Ombudsman, যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ন্যায়পাল। এভাবে ভিন্ন নামে হলেও ইসলামী লিগ্যাল সিষ্টেম হতে উৎসারিত জনস্বার্থ সংরক্ষণমূলক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাকে স্বদেশ এবং বিশ্বসমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য সুইডেন অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। প্রায় একশত বছরব্যাপী সুইডেনে ন্যায়পালের সফল কর্ম অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, পরবর্তীকালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অপরাপর দেশসমূহ যেমন ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে যথাক্রমে ১৯১৯, ১৯৫৫ এবং ১৯৬২ সালে এই জনস্বার্থ সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে। এতে উৎসাহী হয়ে কমনওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যান্ডই সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে 'সংসদীয় কমিশনার' (Parliamentary Commissioner) নামে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে যুক্তরাজ্যেও সরকারী প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য সেবা--প্রশাসনের এই তিন ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে তিনজন Parliamentary Commissioners-Parliamentary Commissioner for Administration, Parliamentary Commissioner for Local Administration and Parliamentary Commissioner for Health Services নিয়োগ করা হয়। ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের অপরাপর উন্নত দেশসমূহও এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে।

সরকারি প্রশাসনকে তার কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করা এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচার হতে নাগরিকদের প্রতিরক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে সাম্প্রতিককালে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এশিয়া তথা উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ইসরাইলই সর্বপ্রথম সফলভাবে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর করে। অষ্ট্রেলিয়াতে ১৯৭৩ সালে এই পদের সৃষ্টি করা হয়। প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে তাঞ্জানিয়া ১৯৬৬ সালে Permanent Commission of Enquiry প্রতিষ্ঠা করে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ন্যায়পালের অনুরূপ প্রকিউরেটর (Procurator) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয় যা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান (International Ombudsman Institute)-এর হিসাব মতে, ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের ১৯টি উন্নত এবং ১১টি উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সর্বমোট ৮৮টি সাধারণ আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল (Legislative Ombudsman) প্রতিষ্ঠা লাভ করে [২১]। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের প্রসার

www.amarboi.org

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করতেন সেসবের মধ্যে ছিল:[১৩]

০১. ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বসবাসকারী জনসাধারণের উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের নির্যাতনমূলক আচরণ;
০২. জনসাধারণের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অবিচার;
০৩. সরকারি ভাতা প্রদানে অনিয়ম:
০৪. অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সম্পত্তি পুনর্মুক্ত করার দাবি;
০৫. সুষ্ঠুভাবে আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ এবং অন্যায়কার্য প্রতিরোধ;
০৬. সংঘাতে লিপ্ত উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ ও বিবাদের মীমাংসা; এবং
০৭. সুষ্ঠুভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন ইত্যাদি।

দিওয়ান-আল-মাজালিম-এর দায়িত্ব শুধু অভিযোগ শ্রবণ ও তদন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিকারের রায় কার্যকর করার ক্ষমতাও এর ছিল। এটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের অপেক্ষা না করেই স্বীয় উদ্যোগে তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। জার্মান পন্ডিত Grunebaum তাই, *দিওয়ান-আল-মাজালিমকে, মাজালিম কোর্ট* বলে অভিহিত করেছেন[১৪]। এছাড়াও *মাজালিম* খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদান করতেন[১৫]। একবার খলিফা আল-মামুনের উপস্থিতিতে জনৈক বিধবা কর্তৃক *খলিফা* পুত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিধবার উপস্থিতিতেই খলিফা পুত্রের বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করা হয়[১৬]।

দিওয়ান-ই-মাজালিম ছাড়াও ইসলামী প্রশাসনে জনস্বার্থ প্রতিরক্ষামূলক অপর যে প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ছিল তাকে বলা হত *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক)। *হিস্‌বার* দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বলা হত *মুহ্‌তাসিব*। *মুহ্‌তাসিবের* অবস্থানটি ছিল *কাজী* (নির্বাহী বিভাগ হতে স্বাধীন বিচারক) ও *মাজালিম* (আপীল আদালত)[১৭]-এর মাঝামাঝি। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও সমাজ জীবনে দুর্নীতি প্রতিরোধই ছিল এর প্রধান কাজ। *মুহ্‌তাসিব* ও *মাজালিম* নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাগত নৈতিকতা ছাড়াও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্পর্কিত ইসলামী মূল্যবোধের দ্বারাও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হতেন[১৮]। কিন্তু কালক্রমে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসনের বদলে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভের পর, জনস্বার্থ প্রতিরক্ষাকারী *মাজালিম* ও *হিস্‌বা* প্রতিষ্ঠানদ্বয় অবহেলিত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে (১৮০৯ সালে), ইউরোপের সুইডেনে আধুনিক ন্যায়পালের সূত্রপাত ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে (১৭১৩ খ্রীঃ) সুইডেন রাশিয়ার সাথে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস (King Charles XII) তুরস্কে নির্বাসন যাপন করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে সুইডেনে সরকারি কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন Chancellor of Justice (JK) নামক রাজার মনোনীত একজন প্রতিনিধি। দীর্ঘ বার বছরকাল তুরস্কে অবস্থানকালে, অটোমান

www.amarboi.org

মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রশাসনে নাগরিকদের অভিযোগ তদন্ত করে *খলিফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রিপোর্ট প্রদানের জন্য *দিওয়ান-আল-মাজালিম* নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। প্রাথমিকভাবে *মাজালিম* ছিল জনগণের জন্য সর্বোচ্চ আপীল আদালত যা সাধারণত *খলিফা* কর্তৃক পরিচালিত হত। হযরত (সা:) সিপাহ্ সালার খালিদ ইব্নে ওলীদের বিরুদ্ধে জুত্মা ট্রাইবের উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন[৭]। জনৈক বেদুইনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা ওমর ফারুক (রাঃ) গাসান প্রদেশের গভর্ণর জাবাল ইব্নে আল-আইহাম এবং জনৈক মিশরীয় নাগরিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের গভর্ণর আমর ইব্নে আল-আসের পুত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন[৮]। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) তাঁর প্রশাসনিক চিঠিতে মিশরের গভর্নর মালিক ইব্নে হারিসকে নির্দেশ করেছিলেন, "...অন্যান্য কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় তুমি দরিদ্র ও মজ্লুমদের জন্য বরাদ্দ করে রাখ এবং তোমার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা কর। এ শ্রুতির সময় আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি তাদের সাথে দয়া, সৌজন্য ও সম্মানের সাথে ব্যবহার কর। তোমার সরকার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তারা যেন খোলাখুলিভাবে এবং নিঃসঙ্কোচে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে, তার স্বার্থে তোমার কর্মচারী, সৈনিক বা প্রহরীকে ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে দিও না। এটা (ন্যায়ানুগ ও ইনসাফ ভিত্তিক) প্রশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, 'ঐ সব শাসক ও ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করতে পারে না যাদের কারণে দরিদ্র ও দুঃস্থদের অধিকার শক্তিমানদের হাত থেকে রক্ষিত হয় না' ... যখনই তুমি অনুভব করবে যে, তোমার অফিসাররা জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি অতটা সচেতন বা আগ্রহী নয়, তখনই তুমি নিজেই এতে আপন মনোযোগ নিবদ্ধ করবে... তুমি কোনক্রমেই নিজেকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না"[৯]।

উমাইয়া বংশের চতুর্থ *খলিফা* আব্দ আল-মালিকের শাসনামলে তিনি একটি দিবস নির্ধারিত করেছিলেন জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য যেটা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খলিফা ওমর ইব্নে আবদুল আজীজ ও তাঁর পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন যাবত অনুসৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে, *খলিফা* কর্তৃক *কুরআনের* নির্দেশ অনুযায়ী (৩৬: ২১; ২৮: ২৬) ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে মাজালিম পদে অধিষ্ঠিত করা হত[১০]। ইতিহাসে এমন নজিরও রয়েছে যে, আব্বাসীয় *খলিফা হারুন-আল-রশীদ* কর্তৃক নিয়োগকৃত জাফর নামক একজন *মাজালিম* একদিনে প্রায় এক হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছিলেন[১১]। *মাজালিমকে* সহযোগিতা করার জন্য ছিল জনগণের অভিযোগ লিপিবদ্ধকারী করণিক, *ফকীহ্* (আইনের ব্যাখ্যাকারী) ও আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গ। সৈয়দ আমীর আলীর বর্ণনামতে, আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামলে *দিওয়ান-আল-ফিল-মাজালিম* অর্থাৎ অভিযোগ তদন্ত দপ্তর বলে একটি পৃথক বিভাগই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল[১২]। Reuben Levy-র বিবরণ অনুযায়ী, *দিওয়ান-ই-মাজালিম* যে সকল

www.amarboi.org

"লোক-প্রশাসনের" সংজ্ঞা দেয়া দুরূহ ব্যাপার। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্যও রয়েছে। কারও মতে, সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই লোক-প্রশাসনের কাজ। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে শুধু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও লোক-প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আসলে লোক-প্রশাসন পুরো সরকারি কর্মকান্ডকে নিয়েই আবর্তিত। এর পরিধি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে, সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়ন এবং এমনকি, মূল্যায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সংগঠন কাঠামো, কার্যাবলী ও নিয়ম-নীতির এক সমন্বিত কর্মকান্ড। এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য মানুষ ও সম্পদের সংগঠন ও পরিচালনা এবং মূল্যায়ন কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত[৪]।

এখানে অবাক হবার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশের লোক-প্রশাসন কর্মকান্ডে অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় 'লোক' অর্থাৎ জনগণের কোন উপস্থিতি নেই। সমস্ত কার্যগুলো পরিচালিত হয় স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত এবং পদসোপানের ভিত্তিতে সংগঠিত বেতনভুক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে। এই অবস্থা পর্যালোচনা করে জনৈক সমাজ বিজ্ঞানী বাংলাদেশের লোক-প্রশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "বাংলাদেশের লোক-প্রশাসন লোকের জন্য, কিন্তু লোকের দ্বারা নয়"[৫]। এই দৃশ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত কাঠামোগত (পদসোপান ও নির্ধারিত নিয়ম-নীতি ভিত্তিক) কর্ম প্রক্রিয়া।

ইংরেজিতে Ombudsman-কে বাংলায় 'ন্যায়পাল' বা জনস্বার্থ সংবেদশীল মহাপর্যবেক্ষক বলা হয়। সুইডিশ Ombud হতে Ombudsman শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের হয়ে কথা বলেন বা অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। আধুনিক অর্থে, ন্যায়পাল হচ্ছে সরকার (আইন বিভাগ অথবা শাসন বিভাগ) কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা যিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের কাছ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং অভিযোগ সমর্থিত হলে এর সমাধান নির্দেশ করেন[৬]। এজন্য ন্যায়পালকে অনেক সময় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা হতে নাগরিকদের প্রতিরক্ষাকারী (Citizen's defender) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, আইনসভা বা শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত হলেও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ন্যায়পাল আইনসভা বা সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন। এজন্য নিরপেক্ষতার স্বার্থে ন্যায়পাল সাধারণত বিচার বিভাগীয় বিচারকদের মধ্য হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা হতে নাগরিকদের প্রতিরক্ষার জন্য এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত হয় ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

www.amarboi.org

প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা দমনে অম্বুড্‌জম্যান (ন্যায়পাল)*

ভূমিকা

পাশাপাশি দু'টি সংবাদ– "সরকারী চাকুরীতে অবসর গ্রহণের দীর্ঘ আঠার বছরেও পেন্‌শনের টাকা তুলতে পারেনি আজহার আলী"; এবং "টেলিফোন বিভাগে আবেদনের পঁচিশ বৎসর পর জনৈক ব্যক্তির টেলিফোন লাভ"– এ' দু'টি ভিন্ন ধাঁচের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা হতে প্রকাশিত দু'টি জাতীয় দৈনিকে [১]। প্রথমটি বাংলাদেশের নৈমিত্তিক ঘটনা, এবং দ্বিতীয়টি পাকিস্তানের। উভয় দেশই দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক জোট *সার্কের* (SAARC) সদস্য এবং পূর্বতন ব্রিটিশ কলোনী। উভয় দেশেই দীর্ঘদিন ধরে সামরিক ও বেসামরিক এলিট শ্রেণী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয় ঘটনায় পাকিস্তানি নাগরিক আবেদনের পঁচিশ বছর পর টেলিফোন লাভে যে সফল হয়েছেন, তা শুধু ন্যায়পালের (Ombudsman) কারণে। শুধু তাই নয়, আবেদনকারী যে এতদিন ধরে (দীর্ঘ পঁচিশ বছর) হয়রানির শিকার হয়েছেন, দুশ্চিন্তা ও সময়ের অপচয় ঘটেছে, এর জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩১২ মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্যও ন্যায়পাল টেলিফোন বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করেছে। বাংলাদেশে যেহেতু ন্যায়পাল নেই, তাই খাদ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পরিদর্শক আজহার আলীকে দীর্ঘ আঠারো বছর যাবত পেন্‌শনের টাকার জন্য প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে অবশেষে পুঞ্জীভূত হতাশা, ক্ষোভ ও গ্লানি মাথায় নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে [২]। এছাড়াও পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী, প্রতিদিন গড়ে বিশ হাজার লোক ঢাকা সচিবালয়ে ধর্ণা দেয় [৩]। এত অধিক সংখ্যক লোক কি কারণে সচিবালয়ে ধর্ণা দেয়, তাদের মধ্যে কে কতদিন ধরে ধর্ণা দিয়ে আসছে, এবং এভাবে কতজন সমাধান পাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর কোন প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবের কারণে জানারও উপায় নেই। বক্ষ্যমান নিবন্ধে ন্যায়পাল কি, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ বাংলাদেশের মত একটি সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব কতখানি, এবং কিভাবে এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মৌল ধারণাসমূহের সংজ্ঞা

আলোচনা শুরুর পূর্বে "লোক-প্রশাসন" ও "ন্যায়পাল" --এ দু'টি ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। নিম্নে এ দু'টি ধারণার সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হল।

---

*সৌজন্যে : ডঃ তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি* (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০০) (নিবন্ধের শিরোনাম পরিবর্তিত এবং আংশিক সংশোধিত)।

www.amarboi.org

ব্যক্ত করেছেন। ইতোপূর্বে H.J.Laski এবং D.C.Carbett নির্বাহী কর্মকর্তাদের ব্যাপারে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, যেহেতু তারাই বাস্তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন এবং যেহেতু মন্ত্রীগণ সাধারণতঃ তাদের পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করেন, অতএব, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দাবি হচ্ছে, আমলাদেরকেই সরাসরি আইন পরিষদের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা প্রয়োজন।

১৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Muhammad *Al-Buraey, Administrative Development : An Islamic Perspective* (London: KPI, 1985), পৃ: ২৫০ এবং একই পুস্তকের ১৮নং পাদটীকা, পৃ: ২৯০।

১৭. *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক)-এর এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Al-Shaykh al-Imam Ibn Taymia, *Public Duties in Islam,* translated by Muhtar Holland and introduced by Khurshid Ahmed (Leicester, U.K.:Islamic Foundation, 1982).

১৮. *দিওয়ান-ই-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Reuben levy, *The Social Structure of Islam* (London: Cambridge University Press, 1979), পৃ: ৩৪৮-৪৯।

১৯. Ibn Khaldun, *The Muqaddima : An Introduction to History,* translated by Franz Rosenthal (Princeton, New Jersy: Princeton University Press, 1967), পৃ: ১৭৮-৭৯।

২০. Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sultaniyeh,* বিংশতম অধ্যায়। আরও দেখুন, মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ: ৯৪-৯৫।

২১. Naim Nusair, "The Islamic External Critics of Public Administration : A Comparative Perspective", i*n The American Journal of Islamic Social Sciences* (July 1985).

২২. *ঐ*।

২৩. হযরত আলী (রাঃ), *একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি,* শামসুল আলম সম্পাদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ: ২৩-২৫।

২৪. Reuben Levy, *ঐ*, পৃ: ৩৪৮-৩৪৯।

২৫. E.Von-Grunebaum, *Islam: Essays in the Nature and Growth of the Cultural Tradition,* Second Edition (London: Routledge, 1969), পৃ: ১৩৩।

২৬. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London: Christophers, 1961), 1961), পৃ: 284, S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration* (Karachi : S.M.Khurshid Iman, 1976), পৃ: 5-6।

২৭. S.A.Q.Husaini, *Arab Administration,* Sixth Edition (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1970), পৃ: 191।

২৮. Al- Mawardi, *Al- Ahkamus Sultar 'yeh,* উদ্ধৃত করেছেন Naim Nusair, *পূর্বোক্ত*।

www.amarboi.org

২. Stephen P. Robbins, *The Administrative Process: Integrating Theory and Practice* (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1979), পৃ: ৫৫ ।

৩. Garry Dessler, *Organization Theory* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1980), পৃ: ১৯০ ।

৪. Stephen P. Robbins, পৃ: ১৯-২০ ।

৫. L.D.White, *Introduction to the Study of Public Administration*, 1949, পৃ: ১৪৫ ।

৬. Peter Self, *Administrative Theories and Politics*, Second Edition (New Delhi:S.Chand and Company Ltd.,by Arrangement with George Allen and Unwin Ltd.,1977), পৃ.২২৭ । এছাড়াও দেখুন, Carl J. Friedrich, "Public Policy and the Nature of Administrative Responsibility", in Friedrich and Mason(eds.) *Public Policy* (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1940); এবং Herbert Finer, "Administrative Responsibibility in Democratic Government", in *Public Administration Review* (1941),p.335-50.

৭. Peter M. Blau, R.G Francis Ges R.C.Stone তাদের পরিচালিত সমীক্ষায় উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন । বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Peter M. Blau, *The Dynamics of Bureaucracy*; R.G.Francis and R.C.Stone, *Service and Procedure in Bureaucracy*, উদ্ধৃত করেছেন Michael J. Hill, *The Sociology of Public Administration* (New York: Crane, Russak and Company,Inc.,1972) পৃ.৭৯ ।

৮. Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy: A Comparative Perspective* (New York: Longman,1978),পৃ.২০২ ।

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের *সংবিধান* (অনুচ্ছেদ-১১৭) ।

১০. ঐ (অনুচ্ছেদ-৭৭) । 'ন্যায়পাল'-এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "নাগরিক প্রতিরক্ষা ও ন্যায়পাল ঃ বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল বিশ্ব", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২১ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৮৬ ।

১১. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organisation*, উদ্ধৃত করেছেন ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, "গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান", *লোক-প্রশাসন সাময়িকী*, ঢাকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ.৬ ।

১২. সরকারি আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অকার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Ali Ahmed, *Basic Principles and Practices of Administrative Organization: Bangladesh* (Dacca: NILG, 1981),c,,. 175-76 ; ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, "গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান", *লোক-প্রশাসন সাময়িকী*, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ: ৫-১০ ।

১৩. ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *ঐ*, পৃ: ৬ ।

১৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "লোক-প্রশাসনে নৈতিকতা" *প্রশাসন সমীক্ষা*, ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৭ ।

১৫. স্বনামধন্য লোক-প্রশাসনবিদ Milton J. Esman লেখকের উপস্থিতিতে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অর্থনীতি ও প্রশাসন' অনুষদে প্রদত্ত এক সেমিনারে এজাতীয় মতামত

www.amarboi.org

'পদসোপান তত্ত্ব' লোক-প্রশাসনে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন একক ব্যবস্থা কোথাও পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি। প্রশাসনের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বা-এর সুষ্ঠু জবাবদিহিতার জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত উভয়বিধ ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের একটি বড় অসম্পূর্ণতা হচ্ছে, গণতন্ত্রে যখন বলা হয় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং যে জনগণকে সেবা প্রদানের নামে লোক-প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত, সেই জনগণের কাছে আমলাদেরকে সরাসরি জবাবদিহি করার কোন *মেকানিজম* বা কার্যকর ব্যবস্থা আধুনিক লোক-প্রশাসনে নেই। দেশের সকল কর্মকান্ডের হোতা হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রী পরিষদের সমন্বিত দায়িত্ববোধ এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে, সরকারি কর্মকর্তাগণ জনগণের কাছে জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। অতএব, যতদিন লোক-প্রশাসকদেরকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করার কোন উপায় সংযোজিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত লোক-প্রশাসনের মাধ্যমে জনস্বার্থ সংরক্ষণ অনেকাংশে প্রত্যাশাই থেকে যাবে।

বর্তমান নিবন্ধে লোক-প্রশাসনে জবাবদিহির ব্যাপারে আধুনিক ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা হচ্ছে ত্রি-মুখী ঃ ক) অধঃস্তন কর্তৃক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতনের নিকট জবাবদিহি করা; খ) সরাসরি মক্কেল বা জনগণের নিকট জবাবদিহি করা (সাপ্তাহিক *জুম্মার* নামাজের সমাবেশ ও বার্ষিক *হজ্জের* সম্মেলনে জনতা ও প্রশাসকদের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে); এবং গ) শেষ বিচারের দিন মহান প্রভূ আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করার চেতনা প্রসূত আচরণের মাধ্যমে।

এছাড়াও ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দুর্নীতি রোধের জন্য ছিল *দিওয়ান-ই-মাজালিম* ও *আল-হিস্‌বা* নামক দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক সমাজ বিশেষতঃ বাংলাদেশের মত মুসলিম প্রধান দেশসমূহে ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাঠামো ও দৃষ্টিভংগী প্রভাবিত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্থবহ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে, ইসলামী ব্যবস্থাপত্র থেকে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে অতীতের তুলনায় অনেক বেশী।

তথ্যসূত্র

১. দেখুন বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির উপর বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা প্রতিবেদন, *Government That Works: Reforming the Public Sector,* উদ্ধৃত হয়েছে *The Independent* (Weekend Supplement),7 June,1996। উক্ত রিপোর্টে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনে অনুকূল সাড়া দিতে পারে এমন একটি জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

অতএব, আল্লাহ্‌র বিধান ও রাসূল (সা:)-এর তরীকা অনুযায়ী জীবনাচরণই হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র মিশন।

ইসলামী প্রশাসনে জাতীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পবিত্র আমানত (Trustee) হিসাবে বিবেচিত। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, এই পবিত্র আমানতকে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে (*তাবরানী*)। হযরত (সা:) বলেছেন, "যে শাসক/প্রশাসক জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন কিন্তু তাদের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলেন না, তিনি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবেন না"। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত প্রশাসকদেরকে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আন্তরিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। এটা শুধু সাংগঠনিক প্রয়োজনে নয়, এটা ধর্মীয় বিধানও বটে (*বোখারী*)। রাসূল (সা:) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ এটা ভালবাসেন যে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করে, সে যেন তা *ইহ্‌সান* অর্থাৎ যথাযথভাবে সম্পাদন করে"(*বায়হাকী*)।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, সার্বভৌম প্রভূ আল্লাহ্‌র *খলিফা* (প্রতিনিধি) হিসাবে সরকারি প্রশাসকগণকে তাদের কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, যার ভিত্তিতে তারা পরজীবনে পুরস্কৃত বা দন্ডিত হবেন (*আল-কুরআন, সূরা বাকারা*, ২ঃ২৮১; ৪ঃ৮৭)। *কুরআনে* ৩৪৮ বার শেষ বিচারের দিবসের জবাবদিহি বা পার্থিব জীবনের *হিসাব*-নিকাশের ব্যাপারে মানবজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে।

শাসক-প্রশাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, "*ওয়া সুলতানোল আদিল জিল্লুল্লাহে ফিল্ আরধে*", অর্থাৎ 'ন্যায়বিচারক শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়াস্বরূপ'। অতএব, রাসূল (সা:)-এর সর্তককারী বাণী হচ্ছে, "যে সকল প্রশাসক পৃথিবীতে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, তারা ছাড়া পরকালে বাকীদের জীবন হবে অবমাননাকর" (*ইব্‌নে তাইমিয়া*)। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাত্রিযাপন করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এই চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে যে, 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন এবং সিনাই পর্বতের পাদদেশে কোন মেষপালকও যদি অভূক্ত থাকে, তাহলে সেজন্য খলিফাকে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে'।

উপসংহার

আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসকগণ জনস্বার্থ সংরক্ষণে কতদূর যত্নবান তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে প্রচলিত মতবাদসমূহের মধ্যে 'যুক্তিবাদী মতবাদ' লোক-প্রশাসকদের পেশাগত মান উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে,

www.amarboi.org

উমাইয়া বংশের চতুর্থ *খলিফা* আবদ আল-মালিকের শাসনামলে তিনি একটি দিবস নির্ধারিত করেছিলেন জনগণের অভিযোগ শ্রবণের জন্য যেটা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খলিফা ওমর ইব্নে আবদুল আজীজ ও তাঁর পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন যাবত অনুসৃত হয়েছিল।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে, খলিফা কর্তৃক ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে *মাজালিম* পদে অধিষ্ঠিত করা হত। *মাজালিমকে* সহযোগিতা করার জন্য ছিল জনগণের অভিযোগ লিপিবদ্ধকারী করণিক, *ফকীহ্* (আইনের ব্যাখ্যাকারী) ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যা অনেকাংশে আধুনিক মোবাইল (ম্যাজিস্ট্রেট) কোর্টের সাথে তুলনীয়। Reuben Levy-এর মতে, *মাজালিম* যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করতেন সেসবের মধ্যে ছিল ঃ

১. ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণের উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের নির্যাতনমূলক আচরণ;
২. জনসাধারণের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অবিচার;
৩. সরকারি ভাতা প্রদানে অনিয়ম;
৪. অন্যায়ভাবে দখলিকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার দাবি;
৫. সুষ্ঠুভাবে আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ এবং অন্যায়কার্য প্রতিরোধ;
৬. সংঘাতে লিপ্ত উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ ও বিবাদের মীমাংসা; এবং
৭. সুষ্ঠুভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন, ইত্যাদি [২৪]।

দিওয়ান-আল-মাজালিম -এর দায়িত্ব শুধু অভিযোগ শ্রবণ ও তদন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিকারের রায় কার্যকর করার ক্ষমতাও এর ছিল। এটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের অপেক্ষা না করেই স্বীয় উদ্যোগে (*Suo moto*) তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। Grunebaum তাই *দিওয়ান-ই-মাজালিম-কে "মাজালিম কোর্ট"* বলে অভিহিত করেছেন [২৫]। এছাড়াও *মাজালিম, খলিফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তার কার্যকলাপ সম্পর্কিত নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করতেন [২৬]। ইসলামের ইতিহাসে এমন নজিরও রয়েছে যে, আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক নিয়োগকৃত জাফর নামক একজন *মাজালিম* একদিনে প্রায় এক হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছিলেন [২৭]। একবার খলিফা আল-মামুনের উপস্থিতিতে, জনৈক বিধবা কর্তৃক খলিফাপুত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে খলিফা পুত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিও কার্যকর করা হয় [২৮]।

কিন্তু কালক্রমে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসনের বদলে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠালাভের কারণে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী *মাজালিম* ও *হিস্বা* প্রতিষ্ঠানদ্বয় অবহেলিত হতে থাকে।

গ) ইসলামী আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে *আখিরাত* বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কর্তৃক পার্থিব জীবনের *হিসাব* গ্রহণ। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র *খলিফা* বা প্রতিনিধি।

www.amarboi.org

নির্দেশ হচ্ছে ঃ "*আমি ইহা দিগকে* (মু'মিনদিগকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা *সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য হইতে নিষেধ করিবে (সূরা হাজ্জ,২২ঃ ৪১)*। অতএব, *আদল* বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে, সমাজে '*আমল বিল্ মারুফ*' এবং '*নেকী আনিল মুনকার*' (অর্থাৎ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ) ইসলামী প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । সমাজের সংশোধন ও নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে অসাধুতা ও দুর্নীতিমূলক অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষে, *মুহ্তাসিব* অপরাধীকে ডেকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেয়া হতে শুরু করে, বেত্রাঘাত, অর্থদন্ড, নির্বাসন, সাময়িকভাবে ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি যে কোন একটি বা একাধিক শাস্তি প্রয়োগ করতে পারতেন (কিন্তু অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যুদন্ড দেবার অধিকার *মুহ্তাসিবের* ছিল না। এসব ছিল শুধুমাত্র *খলিফা* বা *কাজীর* এখতিয়ারাধীন)।

দিওয়ান-ই-মাযালিম

হিস্বা ছাড়াও ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণের প্রতিরক্ষামূলক *দিওয়ান-আল-মাজালিম* নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। *মাজালিম* ছিল জনগণের জন্য সর্বোচ্চ আপীল আদালত যা সাধারণতঃ *খলিফা* কর্তৃক পরিচালিত হত। হযরত (সা:) সিপাহ্সালার খালিদ-ইব্নে-ওলীদের বিরুদ্ধে জুত্মা ট্রাইবের উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন [২১]। জনৈক বেদুইনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা ওমর (রাঃ) গাসান প্রদেশের গভর্নর জাবাল ইব্নে আল-আইহাম ও জনৈক মিশরীয় নাগরিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের গভর্নর আমর ইব্নে আল-আসের পুত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন [২২]। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর প্রশাসনিক চিঠিতে মিশরের গভর্নর মালিক ইব্নে-হারিসকে নির্দেশ করেছিলেন, "অন্যান্য কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় তুমি দরিদ্র ও মযলুমদের জন্য বরাদ্ধ করে রাখ এবং তোমার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ শুনার ব্যবস্থা কর। এ শ্রুতির সময় আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি তাদের সাথে দয়া, সৌজন্য ও সম্মানের সাথে ব্যবহার কর। তোমার সরকার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তারা যেন খোলাখুলিভাবে এবং নিঃসংকোচে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে, তার স্বার্থে তোমার কর্মচারী, সৈনিক বা প্রহরীকে ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে দিওনা। এটা (ন্যায়ানুগ ও *ইনসাফ* ভিত্তিক) প্রশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক । আমি নবীজী (সা:)-কে বলতে শুনেছি, 'ঐ সব সরকার ও ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করতে পারেনা, যাদের কারণে দরিদ্র ও দুঃস্থদের অধিকার শক্তিমানদের হাত থেকে রক্ষিত হয় না'... যখনই তুমি অনুভব করবে যে, তোমার অফিসাররা জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি অতটা সচেতন বা আগ্রহী নয়, তখনই তুমি নিজেই এতে আপন মনোযোগ নিবদ্ধ করবে ... তুমি কোনক্রমেই নিজেকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না" [২৩]।

www.amarboi.org

এভাবে দ্বীনের প্রচারের সাথে সাথে, সমাজে জনস্বার্থ বিরোধী তৎপরতাকেও কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে প্রথম *মুহ্তাসিব* হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সাথে সাথে প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তৃত হলে, মদীনায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে এবং মক্কায় হযরত সাঈদ বিন আল-আস (রাঃ)-কে *মুহ্তাসিব* হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে *মুহ্তাসিবের* দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয় এবং ইসলামী সভ্যতার পতনের পূর্ব পর্যন্ত, ইসলামী শাসনাধীন বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা নামে *মুহ্তাসিব* পদটি চালু ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাগদাদের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল পদটি চালু ছিল *মুহ্তাসিব* নামে। উত্তর আফ্রিকায় এটি ছিল *সাহিব আল সুউক*, তুরস্কে ছিল *মুহ্তাসিব আগাজী* এবং ভারতবর্ষে *কোতোয়াল* নামে।

ইসলামী প্রশাসনে *মুহ্তাসিবের* অবস্থানটা ছিল অনেকটা *কাজী* ও *মাজালিমের* (আপীল আদালত) মাঝামাঝি। প্রতিটি শহরে বাজার পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগকৃত *মুহ্তাসিবের* কাজ ছিল সহকারী সহযোগে নিয়মিতভাবে (কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও গোপনে) শহর প্রদক্ষিণ করা। পরিদর্শনকালে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কারচুপি করা বা অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থাৎ দেশের নাগরিকগণ ইসলামী *শরীয়া* অনুযায়ী আচরণ করছে কিনা, তাও প্রত্যক্ষ করা হত। ইব্নে খাল্দুনের বর্ণনা অনুযায়ী, বাজার পরিদর্শন ছাড়াও *মুহ্তাসিব* নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করতেন ঃ

১ জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে প্রতিহতকরণ;
২. মুঠে ও নাবিককে খুব ভারী বোঝা বহনে নিষিদ্ধকরণ;
৩. দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে জনগণের চলার পথে বিপদ্জনক ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার জন্য বাড়ির মালিককে নির্দেশ প্রদান;
৪. শিক্ষকগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক নির্যাতন পরিহারের পরামর্শ প্রদান; এবং
৫. বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ বা অন্য যে কোন বিষয়ে জনগণ প্রতারিত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি [১৯]।

আল-মাওয়ার্দীও *মুহ্তাসিবের* দায়িত্ব হিসেবে বেশ কিছু মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন [২০]। মোটের উপর, জনস্বার্থ সম্পর্কিত যে কোন বিষয় *মুহ্তাসিবের* নজরে আসত বা তাঁকে রিপোর্ট করা হত, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি, সমাজকে পরিশুদ্ধকরণের ব্যাপারে দ্বীনী দায়িত্ব পালনে *আল-হিস্বার* ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *কুরআনের*

www.amarboi.org

প্রশাসন ব্যবস্থা বা কার্যক্রমের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপনে উৎসাহিত করতেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ তথায় দাঁড়িয়ে জনগণ উত্থাপিত সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন [১৬]। এতে জনগণের মধ্যে প্রশাসনের উপর তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি হত এবং সরকারি আমলাগণও জনগণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ্যে জবাবদিহি করার চেতনায় প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগে সর্তক থাকতেন। এ জাতীয় একটি ঘটনায় একবার স্বয়ং খলিফা ওমর (রা)-কেই ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করার জন্য জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

ইসলামী প্রশাসনের মূল লক্ষ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশিকা ও রাসূল (সা:)-এর আদর্শের অনুসরণে সমাজে *ইনসাফ* প্রতিষ্ঠা করা। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেনঃ *"আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ করছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে"* (*সূরা নাহল*, ১৬ঃ ৯০); এবং *"আমি* (আল্লাহ্) *রাসূলদের* (পথপ্রদর্শক) প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ (পথ-নির্দেশিকা) *যাতে মানুষ* (সমাজে নিজেদের মধ্যে) *'ন্যায়বিচার' কায়েম করে"* (*সূরা হাদীদ*, ৫৭ঃ ২৫)।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতিলাভের কারণে পরবর্তীকালে প্রশাসনের মাধ্যমে 'জনস্বার্থ সংরক্ষণ' ও 'নাগরিক প্রতিরক্ষা' ব্যবস্থা হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। এর একটি ছিল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অসাধুতা রোধ, ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা প্রতিরোধক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান প্রতিপালন তদারকি প্রতিষ্ঠান *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক); [১৭] এবং অপরটি হচেছ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচছাচারিতা সম্পর্কিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ, তদন্ত ও দ্রুত প্রতিকার বিধানের জন্য *দিওয়ান-আল-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) [১৮]। এ দু'টি ছিল যথাক্রমে নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। নিম্নে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হল।

আল-হিস্‌বা

আল-হিস্‌বার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাকে বলা হত *মুহ্‌তাসিব*। মদীনায় ইসলামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার পর, রাসূলে করীম (সা:) প্রথমদিকে এ জাতীয় দায়িত্ব পালনের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বাজার পরিদর্শন করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে ওজনে কারচুপি, ক্রেতা সাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ ও দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। কখনও কখনও মওজুতদারীর বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। একদা বাজার পরিদর্শনকালে রাসূল (সা:) এক খাবার বিক্রেতাকে শুক্‌না গমের ভেতর ভেজা শষ্য লুকিয়ে ক্রেতা সাধারণকে প্রতারণা করার জন্য কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

www.amarboi.org

তুমি উপেক্ষা করিও না ; তুমি (অন্যের প্রতি) *সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়*" (*সূরা কাসাস*, ২৮ঃ ৭৭)। সাথে সাথে, আল্লাহ্ মানুষকে সার্বক্ষণিকভাবে এই দোয়া করার উপদেশ দিয়েছেন যে, "*হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে* (পরকালে) *অগ্নি যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর*" (*সূরা বাকারা*, ২ঃ২০১)।

তাওহীদ, *রিসালাত* ও *আখিরাত* হচ্ছে ইসলামী জীবনাচরণের মৌলিক ভিত্তি। এই বিধানের উপর ভিত্তি করে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উদ্যোগে সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকামী একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও এর বিস্তারিত প্রশাসন ব্যবস্থা। মহানবী (সাঃ) -এর প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই বইয়ে সংকলিত ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহি পদ্ধতি

রাসূল (সাঃ) প্রবর্তিত ইসলামী সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং পরবর্তীতে *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজের জন্য তিনভাবে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ঃ ক) অধঃস্তন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করা; খ) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা; এবং গ) শেষ বিচারের দিন মহান প্রভূ আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ চেতনাবোধ সমুজ্জ্বল রাখার মাধ্যমে। নিম্নে এই ত্রি-মুখী জবাবদিহির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হল।

ক) ইসলামী প্রশাসনে স্তর ভিত্তিক কর্তৃত্ব কাঠামো অনুমোদিত। *কুরআনে* আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন ঃ "*হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মান্য কর, তাঁর রাসূলকে মান্য কর এবং আনুগত্য কর তাদের যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে*" (*সূরা নিসা*, ৪ ঃ ৫৯)। অতএব, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাগণ পদক্রম অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ, কার্যবিবরণী পাঠানোর মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ দায়ী থাকতেন *আল-ওয়ালী* বা প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে। অনুরূপভাবে, প্রাদেশিক গভর্নরগণ দায়ী থাকতেন *খলিফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। অপরদিকে, *খলিফা* ও *ওয়ালীগণ* পরিদর্শনের মাধ্যমে অধঃস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। *খলিফা* একই সাথে সরকার ও রাষ্ট্রের প্রধান হলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন *মজলিশ-ই-শুরা* বা পরামর্শদাতা পরিষদের ।

খ) ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল *খলিফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণকে তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হত। খলিফা ওমর ফারুক (রাঃ) সাপ্তাহিক জুমার নামাজের সমাবেশে এবং বার্ষিক হজ্বের মহা সম্মেলনে জনগণকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় কর্মরত প্রশাসক,

www.amarboi.org

রয়েছে, *অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট* এবং *গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস*, ১৯৭৯-এর মত উপনিবেশিক শাসন আইন যা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে অবাধ সংবাদ প্রবাহের মত অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সরকারি আমলাদেরকে তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করা সম্ভবপর হয় না। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক লোক-প্রশাসনবিদ্ এমন মন্তব্যও করেছেন যে, "বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রই কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক, না সংসদ, না রাষ্ট্রপতি, না মন্ত্রী -- কেহই আমলাতন্ত্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রক নন। ফলে আমলাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণহীন" [১৩]। তাই কোন কোন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞের মতে, লোক- প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যাপ্ত নয়। এটাকে কার্যকর করার জন্য প্রশাসকদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে, সাম্প্রতিককালে লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার পাশাপাশি, তাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন [১৪]।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি আমলাদের জন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য "পদসোপান তত্ত্ব" ও "যুক্তিবাদী তত্ত্বের" যৌথ প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু এর পরও আজ অবধি যে জটিল সমস্যাটির উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি সেটি হচ্ছে, *সিভিল সার্ভেন্টসদেরকে* কিভাবে সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করা যায়? সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, তারা প্রায়শঃই আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি করেন এবং জনগণের অসুবিধা ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তাই কোন কোন আধুনিক লোক-প্রশাসনবিদ্ মনে করেন যে, লোক- প্রশাসকদের মাধ্যমে 'লোকস্বার্থ সংরক্ষণ' নিশ্চিত করতে হলে তাদের ব্যাপারে *ক্লায়েন্টস* বা সেবা গ্রহীতা জনগণের মতামত যাঁচাই করা প্রয়োজন [১৫]।

ইসলাম ও জবাবদিহি

ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় উপরিউক্ত উভয়বিধ ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভূ একমাত্র আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও রাসূল (সা:)-এর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিমালা সম্বলিত মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশনা ও বাস্তব উদাহরণ। পরলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করার সাথে সাথে, ইসলামে রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক মঙ্গল ও উন্নতির সুস্পষ্ট পথ নিদের্শনা। *কুরআনে* বলা হয়েছে ঃ *"আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তা দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর, ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে*

www.amarboi.org

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন প্রেসিডেন্ট, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ, পরিকল্পনা কমিশন, সচিবালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে সামরিক ও বেসামরিক আমলা এলিট (Bureaucratic Elite) শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। এতে জনগণের কোন অংশগ্রহণ নেই। সবকিছুই আমলাতান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত হয় এবং আমলাতান্ত্রিককভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবায়িত হয়। অসচেতন ও অসংগঠিত জনগণ পড়ে আছে শুধু গ্রহণ প্রান্তে। জনগণের সমস্যা, চাহিদা ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোরও কোন উপায় নেই।

এমতাবস্থায় জনগণের সাথে প্রাত্যহিক মিথস্ক্রিয়ায় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচার সম্পর্কিত জনগণের অভিযোগ তদন্ত করা এবং তার দ্রুত প্রতিকারের জন্য ন্যায়পালের মত জনস্বার্থ সংবেদনশীল একটি প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ থাকা (৭৭ নং অনুচ্ছেদ) সত্ত্বেও বাস্তবে এর অনুপস্থিতিতে প্রতিদিন গড়ে বিশ হাজার লোক ঢাকার সচিবালয়ে ধর্ণা দেয়। এই সংখ্যা যারা রাজধানীতে গিয়ে সচিবালয়ে ধর্ণা দেবার ক্ষমতা রাখে, তাদের। গ্রাম বাংলার নিরক্ষর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের সচিবালয়ের ফটক পর্যন্ত পৌঁছারও সাধ্য নেই, তাদের সংখ্যা কিন্তু এর চাইতে অনেকগুণ বেশি। অতএব, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" এবং "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য" শীর্ষক সাংবিধানিক কথাগুলোর [যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ৭ (১) এবং অনুচ্ছেদ ২১(১)] যথাযথ রূপায়নে ন্যায়পালের ভূমিকা অপরিহার্য।

সম্প্রতি Transparency Internationalও আশা প্রকাশ করেছে যে, আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ ও নাগরিক অধিকার প্রতিরক্ষায় বাংলাদেশে সহসা ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হবে। এ জন্য প্রয়োজন সচেতন জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রে দাবি উত্থাপন বা চাপ সৃষ্টি করা। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, প্রচার মাধ্যম ও চিন্তাবিদ-লেখকগণ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়া হাইকোর্টও নির্দেশ জারির মাধ্যমে (নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচনের ন্যায়) এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারকে বাধ্য করতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয় *দৈনিক জনকণ্ঠে*, জুন ১১, ১৯৯৮; এবং দ্বিতীয় সংবাদটি প্রকাশিত হয় *দৈনিক বাংলায়*, সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৮৫।

২. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, নভেম্বর ৩,১৯৯৮।

৩. দেখুন "Mad Rush to Sectt", *The Daily Star*, September 24. 1996.

৪. Stephen P. Robbins প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে প্রধানতঃ চারটি কর্মকান্ডের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এ চারটি হচ্ছেঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান ও মূল্যায়ন। দেখুন Stephen P. Robbins, *The Administrative Process* (New Delhi: Prentice-Hall of India Pvt.Ltd.1978), পৃ.১৫-২০।

www.amarboi.org

৫. M.Anisuzzaman, *Bangladesh Public Administration and Society* (Dhaka: Bangladesh Books International Ltd. 1979), পৃ. ৯০,১০২।

৬. Donald C. Rowat, "The Suitability of the Ombudsman Plan for Developing Countries", in *International Review of Administrative Sciences* L. (1984), পৃ.২০৭।

৭. Naim Nusair, "The Islamic External Critics of Public Administration : A Comparative Perspective", in *The American Journal of Islamic Social Sciences* (July 1985)।

৮. *প্রাগুক্ত*।

৯. হযরত আলী (রা), *একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ.২৩-২৫।

১০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Muhammad Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KPI Ltd, 1985), পৃ.২৫১-২৫৭।

১১. দেখুন S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration* (Karachi: S. M. Khurshid Imam, 1976), পৃ.৩-৬।

১২. দেখুন Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London: Christophers, 1961), পৃ.২৮৪।

১৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (London: Cambridge University Press, 1979), পৃ.৩৪৮-৪৯।

১৪. E. Von-Grunebaum, Islam : *Essays in the Nature and Growth of the Cultural Tradition,* Second Edition (London: Rontledge, 1969), পৃ.১৩৩।

১৫. দেখুন Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London: Christophers,1961) পৃ.২৮৪; S.M.Imamuddin, *Arab Muslim Administration* (Karachi: S.M. Khurshid Imam, 1976), c,,. 5-6।

১৬. Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sultaniyeh,* উদ্ধৃত করেছেন Naim Nusair *পূর্বোক্ত*।

১৭. *আল-হিস্‌বা* -এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Al-Shaikh al- Imam Ibn Taimia, *Public Duties in Islam*, translated by Muhtar Holland (Leicester: Islamic Foundation, 1982)।

১৮. কুরআনে মোমিনদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম" (*আল-ইমরান ঃ ১০৪,১১০*)।

১৯. দেখুন D.R.Saxena, *Ombudsman* (Lokpal): *Redress Of Citizen's Grievances in India* (New Delhi: Deep and Deep Publications, 1987), c.36; ÒThe office of Ombudsman in Pakistan", *The Bangladesh*

www.amarboi.org

Observer, Dhaka, September 27, 1998; এবং Ruma Sultana, "The ombudsman Qustion", in The *Daily Star*, Dhaka, July 10, 2007।

২০. D.R. Saxena, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২,৪৯ এবং M.S.Azad, "Ombudsman : It's Necessity in Bangladesh", *The Bangladesh Observer* (Friday Observer Magazine), Dhaka, September 18.1998 ।

২১. দেখুন *Ombudsman and other Complain-Handling Systems Survey*, Vol.X1, July 1, 1982-June 30,1983(Edmonton: International Ombudsman Institute), পৃ. ১১৩।

২২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, H.E. Goodnow, *The Civil Service of Pakistan: Bureaucracy in a New Nation* (Lahore: Oxford University Press, 1969), পৃ.৩-২২।

২৩. Hing Young Cheng, "The Ombudsman System in Evolution. Can It Be Adopted in Commonwealth Countries"? (Carleton University, Unpublished M.A. Thesis, 1967), পৃ.৩৪।

২৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Gerald Caiden, "Ombudsman in Developing Democracies : Comment", in *International Review of Administrative Sciences* L (1984), পৃ.২২৩।

২৫. *প্রাগুক্ত*।

২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, জানুয়ারি ৩, ১৯৮৬।

২৭. *প্রাগুক্ত*।

২৮. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ২১জুলাই, ১৯৯৩।

২৯. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা জানুয়ারি ৩, ১৯৮৬।

৩০. ১৯৭০ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ১৯৭১সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার আম্রকাননে দ্রুত সমবেত হয়ে স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন, তাতে বাংলাদেশের জনগণের জন্য "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" ও "সামাজিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল। দেখুন, Ministry of External Affairs, New Delhi, *Bangladesh Documents*, Vol, 1, September, 1971,পৃ.২৮১-৮২।

৩১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৮৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), অনুচ্ছেদ ৭৭, পৃ.৬২।

৩২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

৩৩. দেখুন "PARC Recommendations Submitted to PMO : Steps for Dynamic, Accountable Administration", *The Daily Star*, Dhaka, November 11,1998.

৩৪. এই তথ্য উদ্ধৃত করেছেন, নাজমুল হুদা শামীম, "বাংলাদেশে ন্যায়পাল এবং আমাদের প্রত্যাশা", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

৩৫. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

www.amarboi.org

৩৬. Bangladesh legal Aid and Services Trust, " Legislative Advocacy for the Establishment of the Officer of Ombudsman in Bangladesh", *Occasional Paper-3* (Mimeograph), Dhaka, 1998. পৃ.২২। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু বিগত ৩ মার্চ, ১৯৯৯ ইংরেজি সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে জানান যে, ১৯৯৮সালের ৩১ডিসেম্বর পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৯৮ হাজার ৯শ ৭২টি। এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে ৯৫ হাজার ৫৯৮টি এবং আপীল বিভাগে রয়েছে ৩ হাজার ৩৭৮টি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা মার্চ ৪, ১৯৯৯।

৩৭. বিভিন্ন সময়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬৪টি জেলার আদালত সমূহে বর্তমানে সাড়ে সাত লাখেরও বেশি দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন রয়েছে। দেখুন, নাজমুল হুদা শামীম,"আদালতে মামলাজট", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা জানুয়ারি ১৮,১৯৯৭। বিচারাধীন এ সকল মামলার সাথে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের করা হচ্ছে হাজার হাজার মামলা। অথচ এই বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন মাত্র সাতশ' -এর মত বিচারক। ফলে দিনের পর দিন যেমন বাড়ছে মামলাজট, তেমনি বাড়ছে জনগণের দুর্ভোগ, অর্থের অপচয় ও হয়রানি।

৩৮. দেখুন Bangladesh Legal Aid and Services Trust, *প্রাগুক্ত*।

৩৯. দেখুন "PARC for Immediate Functioning of the office of Ombudsman", *The Daily Star*, August 30,1996।

৪০. দেখুন *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

৪১. দেখুন, "WB Suggests Immediate Appointment of Ombudsman" *The Daily Star*, Dhaka, August 23,1996; The World Bank, "Government That Works", উদ্ধৃত করেছেন Manzoor Hasan, "Ombudsman : A Component of National Integrity", *The Daily Star*, Dhaka, April, 16, 1997 Ges ÒWorkshop on World Bank Report Concludes", *The Daily Star*, December 6, 1997.

৪২. দেখুন বিগত ২৯ শে মার্চ, ১৯৯৮ ইংরেজি ঢাকায় অনুষ্ঠিত "Towards Establishment of the Office of Ombudsman in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তব্য, "Ombudsman Soon to Ensure Accountability", *The Daily Star*, Dhaka, March 30, 1998.

৪৩. উল্লেখ্য যে, সুইডেনের ন্যায়পাল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ হতে ৪৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন। এই ৪৮ সদস্য বিশিষ্ট ন্যায়পাল নির্বাচনী কমিটিটি সুইডিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দল হতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠন করা হয়।

৪৪. দেখুন, A.H. Monjural Kabir, "The Ombudsman Act, 1980 : A Critical Review", *The Daily Star*, September 13, 1998; Zakir Hossain, "The Ombudsman for Bangladesh", *Law Vision*, No.3. December, 1996.

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসনে নৈতিকতা*

ভূমিকা

"লোক" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জনগণ। কিন্তু প্রশাসনিক পরিভাষায় ইংরেজিতে প্রচলিত "Public" বা বাংলায় "লোক" শব্দটি সরকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে Public Service Commission-বাংলায় 'সরকারী কর্ম কমিশন'। আর প্রশাসন শব্দের অর্থ হচ্ছে, নির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যক্তির সমন্বিত বা কাঠামোগত কর্ম প্রক্রিয়া। এই অর্থে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সংগঠন ও কার্য পদ্ধতি, আন্তঃবিভাগীয় কর্ম যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং বহুবিধ বিধি- বিধানের সংমিশ্রণ।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত লোক-প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা করা হতো যে, এটি একটি মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) বিজ্ঞান। "দক্ষতা" ও "ব্যয় সংকোচনের" সাথে সরকারি আইন বা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত নীতিসমূহের বাস্তবায়নই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের কাজ। কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, লোক-প্রশাসন শুধু নীতি বাস্তবায়নই করে না, নীতি প্রণয়নের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়াও রয়েছে বহুবিধ ব্যাপারে প্রশাসকদের স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা। এই প্রেক্ষিতে লোক-প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নটি হচ্ছে, সরকারী চাকরির লক্ষ কি? এ ব্যাপারে আজ বিশ্বব্যাপী যে বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করেছে তা হলো, আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের উদ্দেশ্য প্রধানত তিনটি ঃ ১) জনস্বার্থ সংরক্ষণ; ২) আইনের শাসন কায়েম; এবং ৩) সরকারি কর্মে জনমতের প্রতিফলন ঘটানো [১]। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সরকারি চাকরির মূল লক্ষ হচ্ছে জনকল্যাণ বা জনসেবা [২]। তাই সরকারী কর্মচারিদেরকে বলা হয় *সিভিল সার্ভেন্টস্* বা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিভাষায়, "সুশীল সেবক"। অতএব, আধুনিক রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানহারে লোক-প্রশাসনের কর্মপরিধি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, কিভাবে লোক-প্রশাসনকে জনসেবার লক্ষে পরিচালিত করা যায়, সেটাই আজ লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের চিন্তা ও গবেষণার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত ও সুপারিশসমূহের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি।

প্রবন্ধটি মোট চারভাগে বিভক্ত। ভূমিকার পর "খ" অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে লোক-প্রশাসনকে জনস্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ করার ব্যাপারে প্রশাসনিক জবাবদিহির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের মতামত। আধুনিক সমাজে স্থানীয় প্রয়োজন ও সমস্যার জটিলতা ইত্যাদি কারণে, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসকদের স্ববিবেচনা

---

* সৌজন্য : *প্রশাসন সমীক্ষা*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৭।

www.amarboi.org

প্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগের কতিপয় নক্শা বা উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে "গ" অনুচ্ছেদে। "ঘ" অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে লোক-প্রশাসকগণ যাতে তাদের ক্ষমতা ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং জনস্বার্থেই প্রয়োগ করেন, সেজন্য তাদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক চিন্তা-ভাবনা। আর প্রশাসনিক নৈতিকতার সার্বজনীন ভিত্তি হিসেবে ধর্মের গুরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে "ঙ" অনুচ্ছেদে। সর্বশেষে, আলোচনার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে "চ" অনুচ্ছেদে।

প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব (Administrative Responsibility)

লোক-প্রশাসন যাতে জনস্বার্থে বা সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে অধিকাংশ লোক-প্রশাসনবিদ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহিতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, প্রশাসন প্রক্রিয়ায় কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংযোজিত হলে তা প্রশাসন কর্মকে জনস্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে সাহায্য করবে। এদের মধ্যে Carl J. Friedrick ও Norton Long -এর অভিমত হচ্ছে, লোক-প্রশাসকদের পেশাগত প্রতিশ্রুতিশীলতা এবং জন প্রতিনিধিত্বশীল এলিট ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের গণতন্ত্র বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করবে [৩]। Charles Hyneman ও Hermon Finer বিশ্বাস করেন যে, আইন বিভাগীয় নিরীক্ষণ হচ্ছে প্রশাসনের উপর একটি পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ[৪]। J.D Lewis ও L. Von Misses -এর মতামত হচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমলাদের আচরণকে জনস্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ করা সম্ভব [৫]। Henry J. Abraham-এর মতে, "ন্যায়পালই" [৬] হচ্ছে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতা প্রতিরোধ করার উপযুক্ত মাধ্যম[৭]। Dwight Waldo, John M. Pfiffner এবং Robert Presthus--এর যুক্তি হচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণই জনস্বার্থ কার্যকর করার উপায় [৮]। Gordon Tullock এবং Harold Wilensky আমলাতান্ত্রিক তথ্যাবলী প্রচারের মাধ্যমে এটাকে জনস্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ করে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন [৯]। K. C. Davis মনে করেন যে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা প্রশাসনের জনস্বার্থ বিরোধী প্রবণতাকে প্রতিহত করবে [১০]।

কিন্তু এসকল বক্তব্যের একটি প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে, বক্তাগণ লোক-প্রশাসনকে একটি মূল্য নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে চিন্তা করেছেন যার কাজ হচ্ছে মূলতঃ সরকারী নীতির বাস্তবায়ন। তাদের পরামর্শগুলো অনেকটা প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ভুল সংশোধনের কৌশল মাত্র। এতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে সেটি হচ্ছে, নীতি প্রণয়ন বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথেও যে লোক-প্রশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এবং এসব সিদ্ধান্তকে জনস্বার্থে নিবেদিত করার পর্যাপ্ত নৈতিক পথ নির্দেশিকা উপরোল্লিখিত পন্ডিতদের বক্তব্যে অনুপস্থিত [১১]। উপরন্তু, উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের সমষ্টিগত জবাবদিহিতার আড়ালে (Collective Accountability) এবং সরকারি

www.amarboi.org

আমলাদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও বেনামী থাকার (Anonymity) ছদ্মাবরণে, লোক-প্রশাসকগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাহ্যিক বা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি আমলাদের দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। তাই কোন কোন লোক-প্রশাসনবিদ্ প্রশাসকদের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি বা নৈতিকতাবোধের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Herbert A. Simon চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত *Administrative Behavior* বইতে দেখিয়েছেন যে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে মূলত: একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া [১২]। পদসোপানের ভিত্তিতে সংগঠিত সরকারী আমলারা এখানে সার্বক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার লক্ষে প্রতি বৎসর ১০০ টি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যদি একটি সরকারী নীতি প্রণীত হয়, তাহলে সেই নীতিকে কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্ধারণ, স্কুল ঘরের নক্শা প্রণয়ন, ঠিকাদার নির্বাচন এবং শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বহু ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব পড়ে মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপর। Simon এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লোক-প্রশাসনের সনাতনী মূল্যবোধ অর্থাৎ "দক্ষতা' ও "ব্যয়সংকোচন" ছাড়াও সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের দ্বারাও কর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হন [১৩]। Simon এর পূর্বে Harold Laswell এবং Chester I. Bernardও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন [১৪]।

সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদ্যা গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কখন ও কখন তাদের ব্যক্তিগত (বা গোষ্ঠীগত) আবেগ ও যৌক্তিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন। এ জাতীয় অভিমত একথাই প্রমাণ করে যে, প্রশাসকগণ অনেক সময় বিতর্কিত নীতি প্রণয়ন অথবা জনস্বার্থ বিরোধী বা নৈতিকতা বিবর্জিত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন। তাই প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার সাথে সাথে, প্রশাসকদের দায়িত্বসচেতনতা ও নৈতিকাবোধের বিষয়টি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চাশের দশকে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত *Standards and Techniques of Public Administration* নামক গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটা দেশের সরকার ও প্রশাসনের গুণগত মান অনেকাংশে নির্ভর করে লোক-প্রশাসকদের "সততা" ও "ন্যায়পরায়ণতার" উপর [১৫]।

প্রশাসনিক স্ববিবেচনা (Administrative Discretion)

আধুনিক সমাজে স্থানীয় প্রয়োজন ও সমস্যার জটিলতা ইত্যাদি কারণে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসকদের উপর অনেক জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ব্যাপারে তা প্রয়োগের জন্য আইনের কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকে না। এসব ব্যাপারে প্রশাসকদেরকে অনেক সময় নিজেদের বিবেক ও

www.amarboi.org

বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্তকে প্রশাসকদের স্ববিবেচনা (Discretion) বলা হয়। Michael J. Hill-এর মতে, "স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত দেবার পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ পূর্ব নির্ধারিত দিক নির্দেশনা ছাড়াই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রয়োজন বোধ করেন অথবা তারা এ ব্যাপারে অনুমতি প্রাপ্ত হন" [১৬]। বিষয়টাকে সহজ করার জন্য নিম্নে নক্শার আকারে বাংলাদেশের কয়েকটি উদাহরণ সংযোজিত করা হলো।

(*নক্শা-১*) "বিটিটিবি" কর্তৃপক্ষ মাত্র পাঁচটি টেলিফোন সেট সংযোগ প্রদানের জন্য যদি ৫০ টি আবেদন পত্র গ্রহণ করে থাকেন এবং সকল আবেদনকারীই যদি টেলিফোন পাবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে থাকেন, তাহলে ৫০ জনের মধ্যে কোন পাঁচজনকে টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হবে তা "বিটিটিবি" কর্তৃপক্ষের স্ববিবেচনার ব্যাপার। (*নক্শা-২*) বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধির (Criminal Procedure Code) আওতায় পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বেশ কিছু ব্যাপারে স্ববিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উক্ত কার্যবিধির ৫৪ নং ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে, পুলিশ রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহে যে-কোন নাগরিককে গ্রেফতার করে জামিন ছাড়াই ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত আটক করে রাখতে পারে। (*নক্শা-৩*) খ-এর বিরুদ্ধে ক-এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেট খ -এর বিরুদ্ধে সমন জারি (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাদীকে স্বশরীরে আদালতে হাজির হয়ে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব প্রদানের নির্দেশ) করতে পারেন অথবা সরাসরি খ -এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারেন। এটা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্পূর্ণ স্ববিবেচনা [১৭]। (*নক্শা-৪*) অনেক সময় দেখা যায়, মামলার ধারা বলে জামিনযোগ্য কোন মামলায় ধৃত আসামীর পক্ষে জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়, আবার মামলার ধারা বলে জামিনের যোগ্য নয় এমন আসামীও জামিন পেয়ে যেতে পারে।

নক্শায় বর্ণিত উপরের উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, প্রশাসকদের নিজস্ব বিবেচনা প্রশাসন কর্মকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। Peter M. Blau, R.G. Francis এবং R.C.Stone তাদের পরিচালিত সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, *সিভিল সার্ভেন্টসগণ* প্রশাসন কর্মে স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় দু'টি পরস্পর বিরোধী চেতনার সংঘাতে পড়েন। এগুলোর একটি হচ্ছে, জাতীয় স্বার্থ বা জনগণের সেবা কর্মকে উন্নত করা এবং অপরটি হচ্ছে, প্রশাসকদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি [১৮]।

প্রশাসনে নৈতিকতা (Ethics in Administration)

এটা প্রত্যাশিত যে, উপরের উদাহরণগুলিতে পুলিশ, *ম্যাজিস্ট্রেট* অথবা *বিটিটিবি'র* কর্মকর্তাগণ তাঁদের স্ববিবেচনা প্রদানের ক্ষমতা ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং জনস্বার্থেই প্রয়োগ করবেন। এর অর্থ হচ্ছে, জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রশাসকগণ যেটা ভাল বা উচিত বলে মনে করবেন, সেটাই করবেন এবং যেটা মন্দ বা অনুচিত, সেটা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের অনুকূলে হলেও পরিহার করবেন। এখানেই নৈতিকতার

www.amarboi.org

প্রশ্নটি জড়িত। প্রশাসনে স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি যেহেতু প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের পরিবর্তে বহুলাংশে প্রশাসকদের মন বা বিবেচনা, সেহেতু নৈতিকতা বা ন্যায়-অন্যায় বোধের বিষয়টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত 'নৈতিক' শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়, নীতি+ইক অর্থাৎ নীতি সম্বন্ধীয়। নীতি মানে বিবেকের বিচার, ভাল-মন্দ যাচাই। তাৎপর্যের দিক থেকে নীতি মানে ন্যায়, নীতিশাস্ত্র মানে ন্যায়শাস্ত্র, নীতিবান মানে ন্যায়বান [১৯]। নৈতিকতার ইংরেজী প্রতিশব্দ "Ethics" গ্রীক "Ethos" থেকে উৎসারিত, যার অর্থ হচ্ছে ভাল ও মন্দ, উচিত ও অনুচিত সম্পর্কিত ধারণা বা দার্শনিক আদর্শ [২০]। John Uhr-এর মতে, 'ন্যায়বিচারই' (Justice) হচ্ছে নৈতিকতার হৃদয় [২১]। Justice-এর গ্রীক প্রতিশব্দ Dikeia অর্থ প্রচলিত প্রথা, আইন ও শুদ্ধবিচারে সঠিক এবং ন্যায় [২২]। একজন ন্যায়বান ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যার আচরণে সকল নৈতিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে। ন্যায়বান শব্দের ল্যাটিন ধারণা হচ্ছে Virtue অর্থাৎ নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন পূণ্যবান ব্যক্তি [২৩]। অতএব, Ethics বা নৈতিকতা সমাজ ও সংগঠনে মানুষের আচরণে ভাল ও মন্দের একটা নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করে।

সাম্প্রতিককালে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারী কর্মের পরিধি সম্প্রসারিত হবার সাথে সাথে, লোক-প্রশাসকদেরকে আয়কর ও শুল্ককরসহ বিভিন্ন কর আদায়, শিল্প নিয়ন্ত্রণ, *টেন্ডার* প্রদান বা ঠিকাদার নিয়োগ, ব্যবসায়ের পারমিট ও লাইসেন্স বন্টনসহ অপরাপর অর্থনৈতিক লেন-দেন সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ক্রমবর্ধমানহারে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এসকল কর্মকান্ডে স্বজনপ্রীতি ও ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের মনোভাব পরিহার করে, সম্পূর্ণ সততা ও ন্যায়ের সাথে দায়িত্ব পালন, সুশাসন ও উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অপরদিকে, প্রশাসকদের বিরুদ্ধে যে সকল সাধারণ অভিযোগ উত্থাপিত হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে স্বজনপ্রীতি, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি ও অযথা নাগরিকদের হয়রানি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিলম্বিতকরণ ও অবৈধভাবে অর্থ (ঘুষ) আদায়, ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহার, অফিসের রেকর্ড পরিবর্তন ও তহবিল তসরূপ ইত্যাদি [২৪]। মক্কেলদের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত লাভ, কর ফাঁকি ও অবৈধ সুবিধা আদায়ের লক্ষে আমলাদেরকে ঘুষ প্রদানের প্রবণতাও প্রশাসনিক দুর্নীতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Gunner Myrdal-এর মতে, পরিবার ও গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতি আনুগত্যশীল সনাতনী সমাজে সরকার ও প্রশাসনের উচ্চতর পদে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে "ঘুষ" দেওয়া হয় "উপহারের" আকারে [২৫]। এসব সমাজে "ঘুষ" দুর্নীতি বলে নিন্দিত হলেও উপহার প্রদান ও গ্রহণ হচ্ছে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌজন্যবোধের পরিচায়ক। তাই প্রশাসকদের মধ্যে অফিসের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা রোধকল্পে, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে জনগণের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে[২৬]। এ ব্যাপারে লোক-প্রশাসকদের জন্য সতর্ককারী একটি ঘটনা হচ্ছে, সপ্তম শতাব্দীতে মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার বনু জারয়ান

www.amarboi.org

গোত্রের আবদুল্লাহ্ বিন লাইতাইকে জনগণের কাছ থেকে *জাকাতের* অর্থ আদায়ের জন্য *আমীল* নিয়োগ করেছিলেন। আদায়কৃত জাকাত সামগ্রী রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে জমা দেয়ার সময় আবদুল্লাহ সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে বলেছিলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! এর একভাগ হল জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত *জাকাত*, আর বাকী একভাগ লোকেরা আমাকে উপহার হিসাবে দিয়েছে"। একথা শুনে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, "তুমি সরকারী কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়ে যদি বাড়ীতে বসে থাকতে, তাহলে কি লোকেরা তোমাকে এসব উপহার দিত"? একথা বলে নবী করিম (সাঃ) সমস্ত উপহার সামগ্রী *জাকাতের* সাথে *বায়তুলমালে* জমা করার নির্দেশ দেন এবং পরদিন সমাবেশ ডেকে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য জনগণের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন[২৭]। এরই সাথে সংযুক্ত হয়েছে রাসূল (সাঃ)-এর একটি সতর্ককারী *হাদীস* ঃ "কাউকে কোন দায়িত্বে নিয়োগ করা হলে তাকে আমরা বেতন-ভাতা দেব। এর পর সে যদি কিছু গ্রহণ করে তাহলে সেটা হবে বিশ্বাস ভঙ্গের (Breach of trust) কাজ" [২৮]। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপর *হাদীসটি* হচ্ছে ঃ "ঘুষখোর, ঘুষদাতা আর দু' জনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সবাই সমপর্যায়ের গুনাহ্গার" (*আহলে সুনান*)।

১৯৮৮ সালে সংকলিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৮৭ সালে জরিপকৃত ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং শতকরা ২৬ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল [২৯]। রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে, সরকারী কর্মকার্তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯৮৫ সালে মাত্র শতকরা ২৯ ভাগ সরকারি কর্মকর্তা দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে শতকরা ৭৩ ভাগে উন্নীত হয়েছিল। কেন এরূপ হয় ? ইউ, এস, এইডের অর্থানুকুল্যে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত এক "জন প্রশাসন দক্ষতা জরিপ" রিপোর্টে, নৈতিকতার নীচু মানকেই বাংলাদেশে লোক-প্রশাসনের অব্যবস্থা ও অদক্ষতার জন্য মূলত দায়ী করা হয়েছে [৩০]।

অতএব, আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের কর্ম পরিধির সম্প্রসারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসকদের স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, প্রশাসকদের মধ্যে নৈতিকাবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে খুব বেশী। O.P. Dwivedi-এর মতে, লোক-প্রশাসনে নৈতিকতার সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন সরকারি কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতাকে এমনভাবে ব্যবহার করেন বা করেন বলে মনে হয়, যা সাধারণ স্বার্থ বা জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় অথবা যা সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী [৩১]। Kernaghan-এর মতে, সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণে উচ্চ মানের নৈতিকতার প্রতিফলনই হচ্ছে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখার ভিত্তি [৩২]। তাই সরকারি আমলাগণ যাতে তাদের কর্ম ও আচরণে কাংখিত সততা ও নৈতিকতার মান বজায় রাখেন, এজন্য ইদানিং লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে "নৈতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ

www.amarboi.org

পাঠ্যসূচী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রাসেলস-এর 'আন্তর্জাতিক প্রশাসন বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের *সিভিল সার্ভেন্টসদের* অনুসরণের জন্য *Public Service Ethics* নামে একটি পূর্ণাংগ পুস্তকও প্রকাশ করেছে (পরিশিষ্ট-ক)[৩৩]। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণও এক সেমিনারে মিলিত হয়ে দেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিগুলির মূল পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা কোর্স অন্তর্ভূক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন [৩৪]। ইতোপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০০ তারিখে আয়োজিত সেমিনারে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লোক-প্রশাসন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন, তাতে "নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক জীবন ও উদাহরণ বিশেষ করে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ পাঠ্য তালিকায় আসা উচিত" বলে অভিমত প্রকাশ করেন [৩৫]।

নৈতিকতা ও ধর্ম (Ethics and Religion)

লোক-প্রশাসকদের আচরণে নৈতিকতা অর্থাৎ ভাল ও মন্দ এবং উচিত ও অনুচিতের পার্থক্য নিরূপণের মাপকাঠি বা চালিকাশক্তি কি হবে? নৈতিক মূল্যবোধের কোন আত্মনিরপেক্ষ মানদন্ড না থাকলে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এমনকি, একই জাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দল বা ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য একজন পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে যা উচিত, একজন সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে তা অনুচিত। জনগণের সাথে আমলাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, এব্যাপারেও উভয় পক্ষের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী এবং মানুষের নিয়ত পরিবর্তনশীল পছন্দের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং যখনই আমরা স্বীকার করি যে, উচিত ও অনুচিত এবং ভাল ও মন্দ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থ নির্ভর এবং সামাজিক প্রথা ও পরিবেশজাত পরিবর্তনশীল ধারণা মাত্র, তখনই এগুলি আর আমাদের কর্মে ব্যবহারের জন্য নির্ভরশীল দিশারী হতে পারে না। অতএব, মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে ভাল ও মন্দের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ঐক্যমত অর্জনের সর্বজনীন ভিত্তি হচ্ছে, মানব নিরপেক্ষ অতিমানবীয় নৈতিক বিধান যা শুধুমাত্র "ধর্ম" থেকেই পাওয়া সম্ভব [৩৬]।

বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ বিশেষ মতবাদ যাই হোক না কেন, প্রতিটি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তরতম সত্য হচ্ছে প্রথমত, মানুষের মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা যে, এই পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্ব ও ঘটনা একটি সজ্ঞান, সৃজনশীল ও সর্বব্যাপী শক্তি অর্থাৎ একটি ঐশী অভিপ্রায়ের ফল। দ্বিতীয়ত, এই অনুভূতি যে সেই অভিপ্রায়ের সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। শুধুমাত্র এই উপলব্ধি এবং প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করেই মানুষকে ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে [৩৭]।

এধরনের একটি বিশ্বাস না থাকলে, নৈতিকতা সম্পর্কে মানুষের সকল ধারণাই অনিবার্যরূপে ধোঁয়াটে ও সুযোগ-নির্ভর হয়ে উঠবে। পরিণতিতে, উচিত এবং অনুচিত

www.amarboi.org

প্রত্যয়টি আপেক্ষিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনানুসারে এই শব্দ দু'টো যথেচ্ছ ব্যবহারের বিষয় হয়ে উঠবে। এদিকে মানুষের প্রয়োজনগুলি আবার ক্রম পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের অধীন। কাজেই এই প্রক্রিয়ায় স্থায়ী মানদন্ড কোন নৈতিকতার নির্ধারণ সম্ভব হতে পারে না।

কিন্তু ধর্ম ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নৈতিক মূল্যবোধের একটা রূপের সংগে মানুষের চিন্তা ও আচরণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, লোক-প্রশাসকদের স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি বা পারস্পরিক বিদ্বেষের প্রভাবমুক্ত থাকা এবং কামনা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আইনের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা রোধকল্পে, মানবজাতির জীবনদর্শন *কুরআনের* নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমরা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন, আল্লাহ্ উভয়ের যোগ্যতার অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা (অন্যের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত) পেঁচানো কথা বল, অথবা (স্বজনপ্রীতির কারণে) পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন" (সূরা নিসা ঃ ১৩৫);

"হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় /সত্য সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন (ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের) প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদিগকে কখনও সুবিচার করার ব্যাপারে প্রভাবিত না করে। সুবিচার করবে। এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন" (সূরা মায়িদা ঃ ৮);

"(তোমরা) ন্যায়সংগতভাবে পরিমাপ করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না" (সূরা হুদ ঃ ৮৫); এবং

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) করেছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে"(সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৬)।

উপরিউক্ত নির্দেশাবলীতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে শাসক ও প্রশাসকদের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে ওয়েবারীয়ান আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এসকল নীতিমালা সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় মানবতার ঐহিত্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। *কুরআন* যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার নয়, বরং জাতি-ধর্ম, স্থান-কাল নির্বিশেষে এটা সমগ্র বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশিকা, উপরিউক্ত আয়াতসমূহ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। যারা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী অথবা সংশয়বাদী বা তথাকথিত উদার চিন্তার অধিকারী, তাদেরও এব্যাপারে কোন

www.amarboi.org

দ্বিমত থাকার কথা নয়। প্রশাসকদের আচরণে নৈতিকতার মান উন্নত করার লক্ষে এজাতীয় ধর্মীয় অনুশাসন লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সূচীতে অন্তর্ভুক্তির ফলে, যদি তাদের আচরণে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেটাই হবে জনস্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থের জন্য মঙ্গলকর। উল্লেখ্য যে, *কুরআনের* উপরিউক্ত নির্দেশাবলীর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছিল রাসূল (সাঃ) ও *খোলফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে সপ্তম শতাব্দীর মদীনা রাষ্ট্রে যেখানে মুসলমান ছাড়াও খ্রিস্টান, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সকলের জন্য সমান নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা।

ধর্ম প্রশাসকদের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা হচ্ছে সার্বভৌম আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে পবিত্র আমানত। যথাযথভাবে অর্থাৎ সততা ও নিষ্ঠার সাথে এবং মানব কল্যাণার্থে এই দায়িত্ব পালন শুধু সংগঠনের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় নয়, এটা ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। এজন্য তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও শেষ বিচারের দিন প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এজাতীয় অনুভূতি ও চেতনা প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রশাসকদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করবে। এজন্য সাম্প্রতিককালে লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে [৩৯]। Ferrel Heady তার তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষায় লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণে ধর্মীয় শিক্ষার কতিপয় ইতিবাচক ফলাফল তুলে ধরেছে। Heady -এর মতে, সুইজারল্যান্ডের আমলারা খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা (বিশেষতঃ প্রটেস্ট্যান্ট দর্শন) দ্বারা প্রভাবিত বলে, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অধিকতর সচেতন [৪৯]। অপরদিকে, চাইনিজ সরকারি কর্মকর্তারা কনফুসিয়াস দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জনগণের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় সদাচরণের ব্যাপারে অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর মনোযোগী [৪০]। Heady-এর উপরিউক্ত সমীক্ষায় Dwight Waldo এবং Carl J. Friedrick-এর বক্তব্যই সমর্থিত হয়েছে যে, কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সামঞ্জস্যতা সত্ত্বেও বিশেষ সংস্কৃতিতে আমলাতন্ত্রের আচরণ উক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয় [৪১]। এদের একটিতে পরিবর্তন সাধিত হলে অপরটিতেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য [৪২]।

উপসংহার

আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের প্রধান লক্ষ হচ্ছে জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা জনগণের কল্যাণ সাধন। সাম্প্রতিককালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান-হারে লোক-প্রশাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, লোক-প্রশাসন যাতে জনস্বার্থে পরিচালিত হয় সেজন্য বিভিন্ন পন্ডিতবর্গ লোক-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ বা প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতিতে মন্ত্রী পরিষদের সমষ্টিগত দায়-দায়িত্বের আড়ালে এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও বেনামীর (anonymity) ছদ্মাবরণে, লোক-প্রশাসকগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। তাই কারো কারো মতে, লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি পর্যাপ্ত নয়।

www.amarboi.org

উপরন্তু, লোক-প্রশাসন শুধু একটি মূল্য নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নয়। লোক-প্রশাসন আজ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃত। সরকারি নীতি বাস্তবায়নের সাথে সাথে, নীতি প্রণয়নেও লোক-প্রশাসকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়াও রয়েছে বহুবিধ ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদের স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা। তাই কোন কোন লোক-প্রশাসনবিদ্ প্রশাসকদের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির ব্যাপারে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি বা "নৈতিকতাবোধ" জাগ্রত করার উপর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি কর্মকর্তাগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রশাসনের সনাতনী মূল্যবোধ অর্থাৎ "দক্ষতা" ও "ব্যয়সংকোচন' ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কোন কোন গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সরকারি আমলাগণ তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিশেষতঃ স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদা দু'টি পরস্পর বিরোধী তাড়নার মধ্যে সংঘাত অনুভব করেন। এগুলির একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ এবং অপরটি হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ বা জনকল্যাণ। যেহেতু এটা প্রত্যাশিত যে, সরকারি কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, শুধু জনস্বার্থেই পরিচালিত হবেন এবং যেহেতু প্রশাসকদের স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে তাদের নিজস্ব বিবেক-বিবেচনা, সেহেতু তাদের নৈতিকতা বা ন্যায়-অন্যায় বোধের বিষয়টি প্রশাসন প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। অতএব, লোক-প্রশাসনকে জনস্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ রাখার প্রয়োজনে, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার সাথে সাথে, প্রশাসকদের নৈতিকতাবোধের প্রশ্নটি আজ প্রশাসন প্রক্রিয়ার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, লোক-প্রশাসকদের আচরণে নৈতিকতা অর্থাৎ ভাল ও মন্দ এবং উচিত ও অনুচিতের পার্থক্য নিরূপণের মাপকাঠি কি হবে? নৈতিক মূল্যবোধের কোন আত্মনিরপেক্ষ মানদন্ড না থাকলে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এবং এমনকি, একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল বা ব্যক্তির কাছে এব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আর যখনই উচিত ও অনুচিত এবং ভাল ও মন্দ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীস্বার্থ নির্ভর হয়ে পড়ে, অথবা সামাজিক প্রথা ও পরিবেশজাত পরিবর্তনশীল ধারণায় পর্যবসিত হয়, তখন আর এগুলি মানুষের কর্মে ব্যবহারের জন্য নির্ভরশীল দিশারী হতে পারে না। অতএব, মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে ভাল ও মন্দের ব্যাপারে মানুষের অনুসরনীয় সর্বজনীন ভিত্তি হচ্ছে অতিমানবীয় নৈতিক বিধান যা শুধুমাত্র "ধর্ম" থেকেই পাওয়া সম্ভব।

ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নৈতিক মূল্যবোধের একটা রূপের সাথে মানুষের চিন্তা ও আচরণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই সাম্প্রতিককালে লোক-প্রশাসকদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে, লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, যার ইতিবাচক ফলাফল দেখা দিয়েছে আধুনিক বিশ্বের চীন ও সুইজারল্যান্ডে।

www.amarboi.org

তথ্যসূত্র

১. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *A Handbook of Public Administration: Current Concepts and Practices with Special Reference to Developing Countries,* বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ: ১৮।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৬, ২৪।

৩. Carl J. Friedrick and Taylor Cole, *Responsible Bureaucracy* (Cambridge : Harvard University Press, 1932); Norton Long, *The Polity* (Chicago : Rand McNally, 1962).

৪. Charles S. Hyneman, *Bureaucracy* (New York : Harper and Row , 1950); Herbert Finer, "Administrative Responsibility in a Democratic Government," *Public Administraion Review* 1 (Summer 1949.) : 335- 350.

৫. J.D. Lewis, "Democratic Planning in Agriculture", in *American Political Science Review* 35 (April - June 1941) : 232-249, 454-469; L. Von Misses, *Bureaucracy* (New Haven, Conn. : Yale University Press, 1944).

৬. প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ ও নাগরিকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে "ন্যায়পালের" উৎপত্তি, সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : আবদুন নূর, "লোক-প্রশাসনে ন্যায়পাল ঃ বাংলাদেশ ও উন্নয়শীল বিশ্ব", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ২১,আগষ্ট ১৯৮৬। উল্লেখ্য যে, আধুনিক ন্যায়পালের উৎস হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর সুইডেনকে (১৮০৯) ধরা হলেও, সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রশাসনেও নাগরিকদের অভিযোগ তদন্ত করে রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফার কাছে রিপোর্ট প্রদানের জন্য *দিওয়ান-আল-মাজালিম* নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। *খলীফা* একজন বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে *মাজালিম* পদে নিয়োগ করতেন। দেখুন, Muhammed Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London: KPI Limited , 1985),পৃ: ২৫১-২৫৭।

৭. Henry J. Abraham, "A People's Watchdog Against Abuse of Power", in *Public Administration Review* 20 (Summer 1960) : 152-157.

৮. Dwight Waldo, "Development of a Theory of Democratic Administration", in *American Political Science Review* 46 (March 1952) : 81-103; John M. Pfiffner and Robert Presthus, *Public Administration*, 5th ed (New York : Ronald Press, 1967).

৯. Gordon Tullock, *The Politics of Bureaucracy* (Washington, D.C., : Public Affairs Press, 1965); Harold L. Wilensky, *Organizational Intelligence : Knowledge and Policy in Government and Industry* (New York : Basic Books, 1967).

১০. K.C. Davis, *Administrative Law* (St. Paul. West Publishing, 1951).

১১. Nicholas Henry, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৩২।

www.amarboi.org

১২. Herbert A. Simon, *Administrative Behavior : A Study of Decision-Making Process in Administrative Organization* (New York : Frcc Press, 1947).

১৩. Nicholas Henry, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৩২।

১৪. Harold Lasswell, *Psycopathology and Politics* (New York : Viking 1930); Chester 1. Bernard, *The Functions of the Executive* (Cambridge: Harvard University Press, 1938).

১৫. United Nations, *Standards and Techniques of Public Administration with Special Reference to Technical Assistance for Under developed Countries* (NewYork, 1931) : আরও দেখুন, Muzaffar Ahmed Chowdhury, *The Civil Service in Pakistan*, 2nd Editon (Dhaka : National Institute of Public Administration, 1969), পৃ: ২১৮ এবং A.N. Shamsul Hoque, *Administrative Reforms in Pakistan* (Dhaka : National Insitute of Public Administration, 1970), পৃ: ৩৮।

১৬. Michael J. Hill, *The Sociology of Public Administration* (New York : Crane, Russak and Company Inc. 1972), পৃ: ৬২।

১৭. এক্ষেত্রে দন্ডবিধির (*Penal Code*) "সাধারণ ব্যতিক্রম" (General exceptions) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেট (সরল বিশ্বাসে) কোন ভুল করে থাকলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। এ ছাড়াও *Judicial Officials Protection Act*-এর আওতায় বিচারকের কোন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বৈষয়িক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১৮. Peter M. Blau, *The Dynamics of Bureaucracy* ; R.G. Francis and R.C. Stone, *Service and Procdure in Bureaucracy*, উদ্ধৃত করেছেন Michael J. Hill, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৭৯।

১৯. মঈন-উদ্-দীন আহমেদ খান, "অধুনা নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ", *ইসলামী ঐতিহ্য* ১ (জুন ১৯৮৫)।

২০. *Encyclopedia Britanica* , Vol, 6, পৃ: ৯৭৬।

২১. John Uhr, "Ethics and Public Service", *Australian Journal of Public Administration* 67 (June ,1988), পৃ: ১১০।

২২. Denis Goulet, "Overcoming Injustice : Possibilities and Limits," in : Roger Skurski (ed), *New Directions in Econimic Justice* (London : University of Notre Dame Press, 1983), পৃ: ১৩৯।

২৩. ঐ।

২৪. Muzaffar Ahmed Choudhury, *The Civil Service in Pakistan*, 2nd Edition (Dhaka : National Institute of Public Administration, 1969), পৃ: ২৮৫; A.N. Shamsul Hoque, *Administrative Reforms in Pakistan* (Dhaka : National Institute of Public Administration, 1970), পৃ: ২৩৯।

www.amarboi.org

২৫. Gunnar Myrdal, *Asian Drama : An Inquiry Into the Poverty of Nations,* Abridged by Seth S. King (New York : Vintage Books , 1972), পৃ: ২০৫।

২৬. Government of the People's Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division, *The Government Servants (Conduct) Rules,* 1979, Article 5 ; O. P. Dwivedi, *Public Service Ethics* (Brussels : International Institute of Administrative Sciences, 1978), পৃ: ৩৪ ; এবং Muzaffar Ahmed Choudhury, *প্রাগুক্ত,* পৃ: ২৮৩।

২৭. *সহিহ্ মুসলিম,* উদ্ধৃত করেছেন মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, "মহান রাষ্ট্রনায়ক রসুলে করীম (সা:)," *মাসিক আল বালাগ* (৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা), পৃ: ২১।

২৮. আবু দাউদ, উদ্ধৃত করেছেন Muhammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত,* পৃ: ২৪৫।

২৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বাৎসরিক প্রতিবেদন,* ১৯৮৮, সারণী ৬, পৃ:২১।

৩০. দেখুন "সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষায়, বেসামরিক কর্মকর্তারা নিম্ন পর্যায়ে", *সাপ্তাহিক সন্দীপ,* ৮-১৪ ই জানুয়ারী, ৯০ ঢাকা।

৩১. O.P. Dwivedi, *Public Service Ethics* (Brussels : International Institute of Administrative Sciences, 1978), পৃ: ৮।

৩২. W.D.K. Kernaghan, *Ethical Conduct : Guidelines for Government Employees* (Toronto, 1978), পৃ: ১।

৩৩. O.P. Dwivedi, *Public Service Ethics* (Brussels : International Institute of Administrative Sciences, 1978); P.H, Douglas, *Ethics in Goverment,* 1953; এবং John Uhr, "Ethics and Public Service", in *Australian Journal of Public Administration* 67 (June 1988);

৩৪. আরও দেখুন বিগত ১৮ই মার্চ, ২০০৬ তারিখে North South University-এর Ethics and Knowledge Club এর উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারের কার্যবিবরণী; এবং "Eithics in Core Curricula Can Crub Corruption", in *The Daily Star,* Dhaka, মার্চ ১৯, ২০০৬।

৩৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (সম্পাদিত), *বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন চর্চা,* সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

৩৬. দেখুন Muhammed Asad, *The Principles of State and Governmet in Islam,* শাহেদ আলী অনূদিত (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ: ৮; আরো দেখুন Stephen M. king, "Religion, Spirituality and the Workplace : Challenges for Public Administration", in *Public Administration Review,* Vol. 67, No. 1, Jan.-Feb. 2007 pp. 103-114.

৩৭. মানুষের আচরণে ভাল ও মন্দ এবং উচিত ও অনুচিত -এর পার্থক্য নিরূপণকারী সর্বজনীন ভিত্তি হিসাবে ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Muhammed Asad, *প্রাগুক্ত,* পৃ: ১-২১।

www.amarboi.org

৩৮. O.P. Dwivedi, *Public Service Ethics* (Brussels : International Institute of Administrative Sciences, 1978).

৩৯. Ferrel Heady, *Public Administration: A Comparative Perspective*, 3rd ed. (New York : Marcel Dekker, Inc.,1984).

৪০. Farrel Heady, H; চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের (৫৫১-৪৭৯ খ্রিঃ ঃ পূঃ) মতে, প্রতিরক্ষা ও খাদ্য সংস্থান ছাড়াও সরকারের একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণের বিশ্বাস অর্জন। কেননা জনগণের আস্থা ছাড়া কোন সরকার টিকতে পারে না। কনফুসিয়াসের মতে, কোন জাতীয় দুর্দিনে প্রয়োজনবশত সেনাবাহিনী এবং এমনকি, খাদ্যও বাদ দেয়া যাবে, কিন্তু জনগণের আস্থাকে কখনও অবহেলা করা যাবে না। সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন নির্ভর করে সরকারী কর্মকর্তাদের অন্তর্নিহিত উৎকর্ষতা অর্জন ও সংযত অচরণের উপর। দেখুন, *H. G Creel, Chineese Thought from Confucious to Mao-Tse Tung*, উদ্ধৃত করেছেন : মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, "লোক-প্রশাসনে জবাবদিহির প্রশ্ন ঃ তাত্ত্বিক বিচারে", *লোক-প্রশাসন সাময়িকী* (তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮৬), পৃঃ ২-৩।

৪১. D.Waldo, *The Study of Public Administration* (New York : Radom House, 1985), পৃঃ ১০ এবং Carl J. Friedrick, *Constiutional Government and Democracy*, 4th Editon (Boston : Blaisdell Publising Company, 1968), পৃঃ ৪৭০।

৪২. D. Waldo, ঐ।

পরিশিষ্ট–ক

PROPOSED CODE OF CONDUCT AND GUIDELINES FOR PUBLIC SERVICE ETHICS*

This Code is not a restrictive and punitive device. Its main purpose is to guide public officials so that they may avoid conduct which, although not necessarily illegal, may undermine the integrity and effective performance of their services. This Code lays down general principles upon which more specific provisions may be built as required by individual circumstances.

General Principles of Conduct

A. *A public office is a public trust.* All public employees, like other citizens , are subject to the laws of the nation. Their private activities must not be such as might bring discredit upon their positions and disrepute upon their government.

B. *The first duty of a public employee is to give his undivided attention*

*O.P. Dwivedi, *Public Service Ethics* (Brusscls : International Institute of Administrative Sciences, 1978), pp.31-35.

www.amarboi.org

to the public service at all times and on all occasions when that service has a claim upon him.

C. *Every employee* on accepting government employment assumes a special duty *to be fair and impartial in his dealings with the public,* and must completely subordinate his self-interest to public service in all circumstances in which there might be, or appear to be, the possibility of any conflict of interest.

D. The reputation of the government depends in large measure upon the conduct of public employees and what the public believes about such conduct. It is therefore, of fundamental importance that *justice should manifestly and undoubtedly be seen to be done.*

E. *Every employee should avoid* any action which might result in, or create the appearance of (i) *using public office for private gain;*

(ii) giving improper preferential treatment to any group or person ; (iii) impeding government efficiency ; (iv) making government decisions outside official channels; or (v) affecting adversely the confidence of the public in the integrity of the public service.

F. *Every public employee is the servant of the State and not of an individual superior* but owes a duty to the latter in the proper carrying out of all legal orders. If for any reason an employee feels impelled, because of his conscience, to question orders from superiors, he should, if possible, first express his concern to them, and then seek guidance from established mechanism, if any.

G. *Public employees shall not indulge in provincialism, discrimination, favouritism, victimization, or willful abuse of their authority* to harass subordinates and the public.

H. *Public employees should* at all times seek to ensure that public *resources are administered in the most effective and efficient manner.*

Suggested Guidelines

1. Laws, Regulations, and Orders

Every employee shall ensure that he has an adequate understanding of laws, regulations, and decrees pertaining to his department, and shall administer them to the best of his ability and with fairness to all. It is the duty of the supervisor to make these available to his subordinates.

2. Public Duty and Loyalty

Every employee is ultimately responsible to the State through the established mechanism and should act in a manner so as to promote the full confidence of the public in the integrity of the public service. He should do a full day's work for a full day's pay. He should do nothing

www.amarboi.org

which would create in the mind of the ordinary citizen a lack of confidence in the honest and impartial administration of the service, and should not give any grounds for the impression that he can be improperly influenced in the performance of his duties. The primary loyalty of a public employee must be to his country, through the institutions of government, and not to any individual person.

3. Conflict of Interest

A public employee shall not:

(a) engage in any transaction or have a financial or other personal interest which is incompatible with the discharge of his official duties;

(b) place himself in a position where he is under obligation to any person who might benefit from special consideration or favour on his part or who might seek any kind of preferential treatment;

(c) engage in any outside work or undertaking that interferes with the performance of his duties as a public employee, or which misuses the information acquired during the course of his official duties;

(d) unless specifically authorized to do so, use or allow the use of government property of any kind for activities not related to his official work; and

(e) participate in any decision on an application for a loan, grant, license, award or contract from his relatives.

৪. Declaration of Pecuniary and Other Interests

All public employees, unless exempted, shall declare any business, commercial, or financial interest to be recorded in a register maintained by their departmental head or other statutory agency designed for that purpose. This information shall be filed upon entering the service and shall be updated regularly. An employee should also avoid any impropriety by orally disclosing his interests before participating in any decision upon which they might have a bearing. Whenever a doubt arises as to the right or ethics of participating in such decisions, the doubt should be resolved by not participating.

৫. Acceptance of Outside Employment on Leaving Government

Any employee holding a managerial position shall obtain government permission before accepting, within a stated period after separation from public service, offers of employment from business or other private concerns which are in financial relationship with the department or agency of government in which that employee has worked. Any employee who is contemplating such outside employment and who is in any doubt as to whether he needs permission should seek advisory opinion from the central personnel agency or other appropriate body.

www.amarboi.org

6. Disclosure of Confidential Information

A pubic employee shall not disclose to any member of the public, either orally or in writing, any confidential information acquired by virtue of his government position, unless he has received official permission. He shall not, unless legally obliged to do so, disclose any information which may be injurious to national security or to the interests of individuals, groups or organizations. Such restriction is applicable even after retirement or resignation.

7. Public Comment

A public employee shall not engage in public criticism of governmental or departmental policy. He shall refrain from expressing publicly his personal views on matters of political controversy or on government policy. However , speeches , lectures , articles and conference papers may be given , subject to prior permission being obtained.

8. Political Activity

A public employee's political activity must not be such as to impair public confidence in the performance of his official duties.

9. Acceptance of Gifts and Entertainment

A public employee shall not solicit or accept,directly or indirectly, any gift, gratuity, favour, entertainment , loan or anything of monetary value from any person (Exceptions are, for example, acceptance of unsolicited advertising material, gifts between relatives and friends, and conventional hospitality).

10. Relationship with the Public

Every public employee in his dealing with the public should observe in his official duty the highest standards of morality. It is his duty to serve the public with fairness, respect, dignity, and proper courtesy. All public service employees should be committed to the maintenance of order, the attainment of efficiency , and the enactment of good government. They should endeavourer to discourage any form of public inconvenience caused by work stoppage or other work-inhibiting actions.

11. Disciplinary Action

Any employee who willfully disregards the Guidelines is liable to appropriate disciplinary action.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন

১৩. শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৫-১৯৭
১৪. আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতি ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৯৯-২০৯

www.amarboi.org

www.amarboi.org

শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত কর।
-আল-কুরআন, ২৬ ঃ ৮৩

ভূমিকা

আধুনিক অর্থে, মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ অর্থাৎ উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে মানুষের কারিগরি দক্ষতা বা ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধিকরণ [১]। উদাহরণস্বরূপ, জনাব আবদুল করিম একজন মানুষ বা মানব। কিন্তু তিনি যখন মাটিকে প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে লোহা আহরণ বা মাটির তলদেশে সঞ্চিত পেট্রোলিয়াম উত্তোলন ও এগুলোকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার প্রযুক্তি বা দক্ষতা অর্জন করেন, তখন তিনি পরিণত হন মানব সম্পদে। অনুরূপভাবে, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, বিচারক, প্রশাসক, আইনবিদ ও শিক্ষক ইত্যাদি সবাই মানব সম্পদ। এবং শিক্ষা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে উপরিউক্ত পরিবর্তন ক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। তাই শিক্ষাকে অভিহিত করা হয় জাতীয় অগ্রগতির চাবিকাঠি হিসাবে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর নীতি ও মূল্যায়ন শাখার সহকারী পরিচালক প্রফেসর Ryokichi Hirono-র মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দু'টি ঃ ১) মানুষের দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতা বা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি; এবং ২) ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও আবেগের শৃংখলা (Emotional discipline) সৃষ্টি বা চরিত্র গঠন[২]।

সমাজে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় বহুবিধ উপকরণের। এ সকল উপকরণ সৃষ্টি হয় মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আর এজন্য প্রয়োজন হয় ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির। অপরদিকে, সমাজের উৎপাদিত সম্পদকে সমাজে বসবাসকারী সকলের মধ্যে সমতা, ন্যায় ও মানবিক বিবেচনার ভিত্তিতে বিতরণের জন্য মানুষের মধ্যে সততা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও অপরের জন্য ত্যাগের অনুভূতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বিকাশের প্রয়োজন হয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্যাণমুখী সমাজ গড়তে হলে মানুষকে হতে হবে একই সাথে উৎপাদনক্ষম ও মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন। একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato)। তাঁরই সার্থক উত্তরসূরি Aristotle-এর মতে, শিক্ষার মাধ্যমে

---

*সৌজন্যে : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪ (সংশোধিত)।

www.amarboi.org

মানুষ যখন পরিশোধিত হয়, তখন সে হয় প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু *নমোচ* (সততা) ও *ডাইকে* (ন্যায়বোধ)বিবর্জিত মানুষ হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট [৩]।

অতএব, মানুষের জন্য শিক্ষা হচ্ছে একটি লক্ষ্য ভিত্তিক প্রক্রিয়া । তাই যে কোন জাতির শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনার চালিকা শক্তি হিসাবে একটি আদর্শিক ভিত্তি বা অনুপ্রেরণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসংগে বর্তমান শতকের চমকপ্রদ বস্তুগত অগ্রগতি ও পাশাপাশি চরম দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে, বিশ্বের মানবজাতিকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে উইলী ব্রান্ড (Willy Brandt) কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছেঃ"পৃথিবীর নতুন জেনারেশনের জন্য শুধু অর্থনৈতিক সমাধানই যথেষ্ট নয়, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আদর্শেরও প্রয়োজন। তাদের মানবিক মর্যাদা,পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধ, সততা, দয়া ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন" [৪]।

অতএব,জনকল্যাণকর সমাজ গঠনে শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তিনটি উপাদান পরিলক্ষিত হয়: প্রথমত, দৈহিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ (যেমন সততা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও ত্যাগের অনুভূতি ইত্যাদি); এবং তৃতীয়ত, শিক্ষার একটি আদর্শিক প্রেষণা (Ideological motivation) প্রয়োজন যার লক্ষ হচ্ছে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণ সাধন। উপরিউক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি, আলোচ্য প্রবন্ধে সেটাই তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

ইসলাম ও শিক্ষা

ইসলাম হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব এবং রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত জীবন ব্যবস্থা। *কুরআনের* বর্ণনা অনুযায়ী, মানুষকে "পদার্থ" (মাটি,পানি, অগ্নি ও বায়ু ইত্যাদি) থেকে তৈরীর পর, এর মাঝে আল্লাহ্‌র পবিত্র "রূহ" (আত্মা) সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে (*সূরা আন্‌'আম*, ৬ ঃ২; এবং *সূরা হিজর*, ১৫ঃ ২৮-২৯)। এভাবে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র *খলীফা* হিসাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রাসূল (সা:)-এর প্রদর্শিত নিয়মে ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা (*সূরা বাকারা*, ২ঃ ৩০; *সূরা আ'রাফ*,৭ঃ ২৭-২৯; *সূরা হাদীদ*, ৫৭ ঃ ২৫; এবং *সূরা আলে 'ইমরান*, ৩ ঃ ১১০)।

মানুষকে তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইসলাম প্রতিটি নর-নারীর উপর শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন *ফরজ* ঘোষণা করেছে (*ইব্‌নে মাজাহ*)। সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত *রাসূল* (পথ প্রদর্শক) হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর উপর নাযিলকৃত *কুরআনের* প্রথম আয়াতেই *ইক্‌রা* বা 'পড়া' ও 'লিখার' মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে(*সূরা 'আলাক*, ৯৬ ঃ

www.amarboi.org

১-৫)। পরবর্তীতে, *রাসূল* (সা:) তাঁর অনুসারীদেরকে জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে এমন তাগিদও দিয়েছেন যে, "যেখান থেকেই পার জ্ঞান আহরণ কর" (*ইমাম গাযালী*) [৫] এবং "জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও।" সুতরাং ইসলামে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামের প্রতিটি অনুসারী *ইবাদতের* সময় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেনঃ *"হে প্রভু! আমার ইলম (জ্ঞান) বৃদ্ধি করে দাও"* (*সূরা তা'হা*, ২০ ঃ ১১৪)।

সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনের বহুমুখী চাহিদা ও আচরণের মধ্যে কারণগত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষের জীবন প্রবাহকে ব্যক্তিগত বা দৈহিক, গোষ্ঠীগত বা সামাজিক এবং আভ্যন্তরীন বা মনস্তাত্ত্বিক-এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন [৬]। ইসলামেও মানুষের জীবন বিকাশের ধারা প্রবাহকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরকে বলা হয়েছে *নফ্‌সে আম্মারা* (প্রবৃত্তির তাড়নার পর্যায়), যেখানে মানুষ প্রাণীকুলের অন্যান্য জীবদের ন্যায় দৈহিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি) মেটানোর তাড়নায় আচরণ করে। মানব জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয়েছে *নফ্‌সে লাউয়ামা* (আত্মজিজ্ঞাসা বা সচেতনতার পর্যায়), যেখানে মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ভাল-মন্দের বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানব জীবনের সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয়েছে *নফ্‌সে মুত্‌মাইন্না* (আত্মসন্তুষ্টির পর্যায়), যেখানে মানুষ দয়া ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে সৎ ও কল্যাণমূলক কর্ম সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয় [৭]।

মানুষের জীবন বৃত্তের উপরিউক্ত তিনটি পর্যায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীসমূহে নিম্নোক্ত তিনটি মাত্রা (Dimension) সংযোজিত হয়েছে ঃ

১. আল্লাহ্‌র প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাশিকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টি;

২. বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার (Observation and analysis) মাধ্যমে এসবের পশ্চাতে সক্রিয় চিরন্তন সত্যের (Ultimate truth) উপলব্ধি; এবং

৩. পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি হিসাবে নির্ধারিত ভূমিকা পালনার্থে মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় আত্মিক বা খোদায়ী গুণাবলীর বিকাশ।

ইসলামী সমাজে মানুষের চিন্তা ও কর্মের প্রধান উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী (*কুরআন*) ও *রাসূল* (সা:)-এর আদর্শ (*সুন্নাহ*)। শিক্ষা সম্পর্কিত ইসলামের উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে নিম্নে *কুরআনের* বক্তব্য তুলে ধরা হল।

www.amarboi.org

১. শিক্ষা ঃ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে

মানুষের জীবনের প্রাথমিক স্তরে (*নফ্‌সে আম্মারা*) পৃথিবীতে বেচেঁ থাকা ও স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় বহুবিধ উপকরণের। *কুরআনে* আল্লাহ্ বলছেনঃ *"সেই তিনি যিনি* (আল্লাহ্) *তোমাদের* (মানুষের) *জন্য পৃথিবীতে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন"* (*সূরা বাকারা*, ২ঃ২৯)। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সকল নিয়ামতকে মানুষের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের পক্ষ থেকে কিছু অতিরিক্ত প্রচেষ্টার । ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং এগুলোকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সকল ধরনের উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। *কুরআনে* আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

"পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং এতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতভাবে, এবং এতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের (মানুষের) *জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও"* (*সূরা হিজ্‌র*, ১৫ ঃ ১৯-২০);

"তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যদ্বারা তোমরা অলংকৃত হও" (*সূরা নাহ্‌ল* ১৬ ঃ ১৪);

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন?" (*সূরা লোকমান*, ৩১ ঃ ২০; আরও দেখুন *সূরা নাহ্‌ল*, ১৬ ঃ ১২-১৪; *সূরা হাজ্জ*, ২২ঃ ৬৫ এবং *সূরা জাছিয়া*, ৪৫ঃ ১২)।

এসকল আয়াত থেকে তিনটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় ঃ

১. আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমুদয় সম্পদের সৃজনকারী হচ্ছেন আল্লাহ্;

২. এ সকল সম্পদরাশি প্রদান করা হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষ বা মানবজাতির প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য; এবং

৩. এ সকল আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাশিকে ব্যাবহার উপযোগী করার জন্য ইসলাম মানুষকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা অর্জনে উৎসাহিত করেছে। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে কুরআনের তাগিদ,*"নামায সমাপনান্তে তোমরা বাইরে* (কর্মক্ষেত্রে) *ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ* (নিয়ামত) *অনুসন্ধান কর"* (*সূরা জুমু'আ*, ৬২ ঃ ১০); এবং *"ওয়ামাই*

www.amarboi.org

য়ুতিয়াল হেকমাতা ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাছিরা", অর্থাৎ যাকে বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে (*সুরা বাকারা*, ২ঃ২৬৯)।

মুসলিম সমাজের একাংশের মধ্যে এ জাতীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জন বলতে শুধু ধর্মীয় বা *শরীয়তের* জ্ঞানকে বোঝান হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত রাসূল (সা:)-এর *হাদীসসমূহ* (যেমন, 'যেখান থেকেই পার জ্ঞান আহরণ কর' এবং 'জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও' ইত্যাদি) এবং বিশেষ করে, বদরের যুদ্ধবন্দী *কাফিরদের* মুক্তিপণ হিসাবে জনপ্রতি দশজন মুসলিম বালক-বালিকাকে পড়া-লেখা শিক্ষা দেবার ঘটনা, উপরিউক্ত বক্তব্যের সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে। আসলে ইসলাম মানুষের মানসিক বিকাশ ও কর্মদক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনে (মানব কল্যাণকামী) যে কোন শিক্ষাকেই গ্রহণীয় করেছে।

অপরদিকে, এক শ্রেণীর মুসলমানদেরকে এমন কথাও প্রচার করতে দেখা যায় যে, মানুষের ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত। সুতরাং ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ্ বলছেনঃ *"লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা'সা 'আ"* অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যতীত মানুষের কিছুই প্রাপ্য নেই (*সূরা নজম*, ৩৩ঃ ৩৯); এবং *"আল্লাহ্ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়" (সূরা রা'দ* ১৩ঃ ১১)। এসকল আয়াতে ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা/ পরিশ্রমের ব্যাপারে মানুষের প্রতি তাগিদ রয়েছে।

আমরা যদি আজ সমকালীন বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদই আজ পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নতির প্রধান উপাদান। অপরদিকে, প্রাকৃতিক সম্পদ বা পূজির স্বল্পতা নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মানব সম্পদের অভাবই মুসলিম বিশ্বের জাতিসমূহের স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, মুসলিম বিশ্বে প্রতি দশ লক্ষ মানুষের তুলনায় যে পরিমান বিজ্ঞানী রয়েছে তা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির তুলনায় শতকরা ৪৬ভাগ কম; মুসলিম দেশগুলিতে মাত্র ৪৫,১৩৬ জন গবেষক বিজ্ঞান ও উন্নয়ন গবেষণায় নিয়োজিত যার তুলনায় ক্ষুদ্র ইসরাঈল রাষ্ট্রেই গবেষণারত ৩৪,৮০০ জন বিজ্ঞানী যেদেশের জনসংখ্যা প্রায় পাকিস্তানের করাচী শহরের সমতুল্য; জাপানে গবেষণারত আছে চার লক্ষাধিক বিজ্ঞানী ; বিশ্বে প্রতি বৎসর যত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় তাতে মুসলমানদের অবদান এক শতাংশেরও কম[১]। শিক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে *কুরআনে* বারংবার তাগাদাসত্ত্বেও সমকালীন বিশ্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরাপর জাতিসমূহের পাশাপাশি মুসলমানদের লজ্জাকর অবস্থানের চিত্র নিম্নের সারণিদ্বয়ে তুলে ধরা হল।

www.amarboi.org

সারণি-১

বিশ্বের জাতিসমূহের তুলনায় *মুসলমানদের শিক্ষার হার*

শিক্ষার হার / বিশ্বের জাতি সমূহ	শিক্ষার হার	বিদ্যালয়ে ৩-১৯ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীদের শতকরা হার	২৫ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি তাদের শতকরা হার
সকল জাতি	৬৫	৫৮	৬১
শিল্পোন্নত জাতিসমূহ	৯৮	৭৬	৩
তৃতীয় বিশ্বের জাতি সমূহ	৫৯	৫১	৬৪
মুসলিম জাতি সমূহ	৩৮	৪৩	৭৭

উৎস ঃ Ghulam M.Haniff, " Muslim Development at Risk :The Crisis of Human Resources," in *The American Journal of Islamic Social Sciences* VOL.9, No.4, Winter 1992.

সারণি-২

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহের তুলনায় *মুসলমানদের অবস্থান চিত্র*

শিক্ষার হার / বিশ্বের জাতি সমূহ	২০-২৪ বৎসর বয়সের উচ্চ শিক্ষার্থীদের শতকরা হার	বৈজ্ঞানিক-প্রকৌশলীর হার (দশ লাখের মধ্যে)
বিশ্বের সকল জাতি	১৩	৭,১২৭
শিল্পোন্নত জাতিসমূহ	৩৫	১৩,৮২৪
তৃতীয় বিশ্বের জাতি	১১	৬,৬৯১
মুসলিম জাতি সমূহ	৬	৩,৫৯৩

উৎস ঃ Ghulam M. Haniff, *প্রাগুক্ত।*

www.amarboi.org

২. শিক্ষা ঃ জীবন ও জগতের চরম ও অবিমিশ্র সত্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যম

মানব জীবনের প্রাথমিক বা দৈহিক প্রয়োজন (খাদ্য,বস্ত্র, বাসস্থান, ইত্যাদি) মিটানোর পর মানুষ জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (*নফসে লাউয়ামা*) উন্নীত হয়। অর্থাৎ তার সামনে হাজির হয় সামাজিক ও মানসিক চাহিদা। এই স্তরে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনে যে সকল প্রশ্ন জাগরিত হয় তা হচ্ছে তার স্রষ্টা কে ? বিশ্ব জগতের সৃষ্টি রহস্য কি? পারিপার্শ্বিক ঘটনা-প্রবাহের পেছনে মূল চালিকা শক্তি কি? স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কি সম্পর্ক? ইত্যাদি।

কোন শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না যে কে তার মা। মাতৃস্তন্য পান করার মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে তার মা কে? তেমনি বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে রাখা অফুরন্ত সম্পদ ভোগের মাধ্যমে মানুষের চেতনায় উদ্ভাসিত হয় এগুলির সৃষ্টিকারীর কথা। ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে, একমাত্র মহান আল্লাহ্ই (*তাওহীদ*) হচ্ছেন বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, পরিচালক, সংরক্ষক ও সর্বময় কর্তা। এই চরম সত্যটি উপলব্ধির জন্য আল্লাহ্ মানুষকে গভীরভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্ম রহস্য ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য বারংবার উৎসাহিত করেছেন। *কুরআনের* ৭৫০টির মত *আয়াত* বা এর এক-অষ্টমাংশ জুড়ে রয়েছে গবেষণা ও অনুসন্ধান বিষয়ক নির্দেশাবলী।

পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর পরিচালিত গবেষণা। প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে *কুরআনের* নির্দেশ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুন:জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে" (*সূরা বাকারা*, ২ঃ১৬৪);

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবসও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধ শক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য" (সূরা আলে'ইমরান,; ৩ঃ১৯০);

"যারা দাঁড়িয়ে,বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে "হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র" (সূরা আলে 'ইমরান,; ৩ঃ১৯১);

"পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ...আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (সূরা 'আনকাবুত,; ২৯ঃ২০);

www.amarboi.org

"তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর আমি যখন এতে বারি বর্ষণ করি, তখন তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; ইহাই তো প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সর্ব বিষয়ে শক্তিমান" (সূরা হাজ্জ,; ২২ঃ ৫-৬);

"আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড হতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তি ব্যক্ত করার জন্য আমি এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও" (সূরা হাজ্জ,; ২২ঃ৫);

"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদিগের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ঃ ৭৮)।

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রকৃতি জুড়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর মহান ক্ষমতার কথাই বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এই চরম সত্যটি উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা এবং আবহাওয়াবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন। বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলীর মতেঃ "আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের জন্য *কুরআনের* কতিপয় আয়াত বুঝতে সহায়ক হয়েছে যেগুলির অর্থ কিছুদিন পূর্বেও আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব ছিল" [৯]।

গভীর অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে উপলব্ধির পর, স্বভাবতই মানুষের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এবং তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি জাগরিত হয়, মানুষ কামনা করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও করুণা। জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণার ব্যাপারে *কুরআনের* এসব আয়াতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগে জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-রাজী, আল-বেরুনী, আল-জাজারি, আল ফারাবী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মুসলিম জ্ঞান সাধক বিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন, যা আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। তাঁরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, জ্ঞান আহরণ এবং বস্তু পৃথিবীর পদ্ধতিগত পর্যালোচনা চরম সত্য আল্লাহকে অনুধাবন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য অতীব প্রয়োজন [১০]।

www.amarboi.org

৩. শিক্ষা ঃ মানবিক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যম

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যবোধ জাগ্রত হওয়ার পর, মানুষ তার জীবন বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে (*নফসে মুতমাইন্না*) উন্নীত হয়। সে জানতে আগ্রহী হয় পৃথিবীতে তার কি করণীয়। *কুরআনে* বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র *খলীফা* হিসাবে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য (*সূরা বাকারা*, ২ঃ ৩০)। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

"হে বনি আদম !... বল! আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার" (*সূরা আ'রাফ*,৭ঃ২৯);

"আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে" (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ঃ ৯০);

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎকার্যে নিষেধ করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করবে' (সূরা আলে 'ইমরান, ৩ঃ১১০); এবং

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ; তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে," (সূরা বায়্যিনা; ৯৮ঃ ৭-৮)।

কুরআনের উপরিউক্ত *আয়াত*সমূহে পৃথিবীতে মানুষের "বিশ্বদর্শন" সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র *খলীফা* হিসাবে পৃথিবীতে মানুষের মিশন হচ্ছে সামাজিক আচরণ বা লেন-দেনের ক্ষেত্রে "ন্যায়বিচারের" নীতি অনুসরণ ও "মানুষের কল্যাণ" সাধন করা; এবং "সৎকার্যের নির্দেশ" প্রদান করা ও "অসৎকর্মে নিষেধ" করা। আর এই মহান দায়িত্ব পালনের পথ নির্দেশিকা বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহ্‌র *কুরআন* ও *রাসূলের* (সা:) আদর্শ। *কুরআনে* তাই বলা হয়েছে ঃ *"আমি যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছি ন্যায় নীতির কিতাবসহ যাতে মানুষ সমাজে ন্যায়বিচার কায়েম করে" (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)*। মানুষকে এও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে এ সকল দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মানুষকে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে (*সূরা হাদীদ*, ২ঃ২৮১)। ইসলাম আরও বিশ্বাস করে যে পার্থিব জীবনই মানুষের জন্য শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে আর এক দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবন, যে জীবনের কল্যাণ নির্ভর করছে পার্থিব জীবনের কর্মমূল্যায়নের উপর। এটাই হচ্ছে সমাজে শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামের আদর্শিক অনুপ্রেরণা বা দিকদর্শন। সংক্ষেপে, মানুষের জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হল।

www.amarboi.org

সারণি-৩
মানুষের জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম

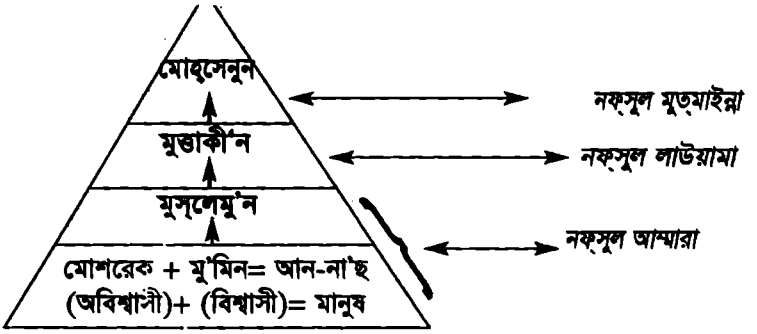

উৎস : *আল-কুরআন*, আল্লামা ইউসুফ আলী অনূদিত, ২৪ ঃ ৬২; ২৬ ঃ ৯০; ২ঃ ১৮৯; ৩ঃ১৪৪ এবং ২৩ঃ ১-১১ ।

সারণি-৪
ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ভূমিকা

জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম		মানুষের তাড়নার/ চেতনার পদবিন্যাস	শিক্ষাক্রম	
পর্যায়ক্রম	নাম		উদ্দেশ্য	শিক্ষা সম্পর্কিত কুরআনের নির্দেশাবলী
প্রাথমিক পর্যায়	*নফসে আম্মারা* (প্রবৃত্তির তাড়না)	জৈবিক তাড়না (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানও চিকিৎসা ইত্যাদি)	বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান/দক্ষতা অর্জন	২ঃ২৯; ১৫ঃ১৯-২০: ১৬ঃ১২-১৪; ৩১ঃ২০; ৪ঃ৩২-৩৩; ২২ঃ৬৫; ৪৫ঃ১২-১৩; ২ঃ২৬৯; ৬২ঃ১০; ৫৩ঃ৩
দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক পর্যায়	*নফসে লাউয়ামা* (আত্ম জিজ্ঞাসা)	মানসিক চেতনা বা বিবেকবোধ (জীবন ও জগৎ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা)	চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি	২ঃ১৬৪; ৩ঃ১৯০-১৯১ ২৯ঃ২০ঃ২২ঃ৫-৬; ১৬ঃ৭৮
তৃতীয় ও সর্বোচ্চ পর্যায়	*নফসে মুত্মাইন্না* (আত্ম সন্তুষ্টি)	আত্মিক সচেতনতা (দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত)	আত্মিক বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ	২ঃ ৩০; ৭ঃ ২৯; ১৬ঃ৯০; ৩ঃ১১০; ৯৮ঃ৭-৮;৫৭ঃ২৫ ২ঃ২৮১

উৎসঃ উপরিউক্ত টেবিলটি লেখক কর্তৃক মানুষের আচরণ সম্পর্কিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানী Abraham H. Maslow এবং *কুরআনের* বর্ণনা কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরীকৃত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Second Edition (New York : Harper and Row, 1970) এবং *The Holy Qur'an* translation and commentary by A. Yusuf Ali (Britwood Maryland: Amana Corp.,1983).

www.amarboi.org

উপসংহার

উপরের আলোচনা ইসলামের বিশ্বদর্শন এবং সমাজে মানুষের প্রত্যাশিত ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে। *কুরআনের* বর্ণনানুযায়ী, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বস্তু (অর্থাৎ মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু ইত্যাদি) হতে এবং পরবর্তীতে তাতে ঐশী আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়েছে। অতএব, ইসলাম এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা সুপারিশ করে যাতে বস্তু ও আত্মার সমন্বিত বিকাশের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি হিসাবে তার দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ইসলামী শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে *তওহীদ* যা সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতিজগৎ, প্রাণীকূল ও মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত একটি প্রশস্ত কর্ম কাঠামো প্রদান করে।

কুরআনের বর্ণনামতে, মানুষের জীবন বিকাশের ধারা প্রবাহ তিনটি পর্যায়ে বিকশিত হয়ঃ ১) *নফ্‌সে আম্মারা* (প্রবৃত্তির তাড়নার স্তর); ২)*নফ্‌সে লাউয়ামা*(আত্ম-জিজ্ঞাসার স্তর); এবং ৩) *নফ্‌সে মুত্‌মাইনা* (আত্মিক বিকাশের স্তর)। মানুষের জীবন বিকাশের এই তিনটি পর্যায়ের সমান্তরালে ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তিনটি মাত্রা নির্দেশ করে ঃ

১. আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রাশিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য কারিগরি দক্ষতা অর্জন;

২. বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতির ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সবের পশ্চাতে সক্রিয় চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি; এবং

৩. পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি হিসাবে নির্ধারিত ভূমিকা পালনার্থে প্রয়োজনীয় আত্মিক বিকাশ বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ।

পৃথিবীতে মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু আল্লাহ্‌র *খলিফা* বা প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রাসূলের (সাঃ) আদর্শের ভিত্তিতে পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণ সাধন। তাকে এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের সহযোগীতায় যুগে যুগে আল্লাহ্‌ নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন ন্যায়-নীতির কিতাবসহ যার সর্বশেষ রূপ হচ্ছে *কুরআন* ও মহানবীর *সুন্নাহ্‌*।

উপরন্তু, মানুষকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের জীবন চক্র শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরও মানুষের জীবন অব্যাহত থাকে, সকল মানুষকে শেষ বিচারের দিন প্রভুর সামনে কর্মের জবাবদিহি করতে হবে, এবং এই কর্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে পারলৌকিক জীবনে মানুষকে পুরস্কৃত করা হবে অথবা শাস্তি পাবে। এটাই হচেছ শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের আদর্শিক অনুপ্রেরণা।

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা হচ্ছে একটি লক্ষ্যমুখী ও মূল্যবোধসম্পন্ন প্রক্রিয়া। এটা শুধু লক্ষ নয়, লক্ষ অর্জনের মাধ্যম মাত্র। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে

www.amarboi.org

প্রার্থনা করেছেন ঃ "আমরা সেই জ্ঞান থেকে পানা চাই, যেটা কোন কল্যাণ বহন করে না" [১১]। সুতরাং ইসলাম সেই শিক্ষাকেই স্বীকৃতি দেয় যেটা মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয় এবং যেটা মানুষকে সৎ, ন্যায়বান ও কল্যাণকামী আচরণে উদ্বুদ্ধ করে [১২]। মোট কথা হচেছ, ইসলাম মানুষের জন্য সেই জ্ঞানকে প্রাধান্য দেয় যেটা মানুষের *তাক্ওয়া* (আল্লাহ্ সচেতন ও পরিমর্জিত আচরণ) অর্জনে সহায়ক এবং যা মানুষকে *মোহসেনীন* (মানব উন্নয়নের সর্বশেষ স্তর) পর্যায়ে উন্নীত হতে সাহায্য করে (*কুরআন*,২ঃ১৭৭, ১৮৯; ৩ঃ১১৪; ২৩ঃ১-১১; ৬ঃ১৬২)। *তাক্ওয়া* একটি নৈতিক নীতিবোধ যা মানুষকে আল্লাহ্ সচেতনতায় তুলনামূলকভাবে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ পরিহার এবং ভাল ও পূণ্যকাজে প্রণোদিত করে। আল্লাহ্ প্রত্যাশা করেন যে, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হউক। মানুষ আচরণে এই নৈতিক মান বজায় রাখতে পারে *ঈমাম-বিল- আল্লাহ্* (আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস) এবং *আমল-আল-সালেহ* (জনকল্যাণকর সৎকর্ম) এর মাধ্যমে।

উপরিউক্ত আলোচনা মহানবীর (সা:) একটি *হাদীসে* সুন্দরভাবে উপাস্থাপিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ ঈমানের সৌন্দর্য তখনই উপলব্ধি করতে পারে যখন তার মধ্যে নিম্মোক্ত তিনটি জ্ঞান / আচরণ সমন্বিত হয় ঃ

১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা;
২. আল্লাহ্র জন্য মানুষের প্রতি ভালবাসা; এবং
৩. আগুনের প্রতি ভয়ের ন্যায় পাপকর্মের প্রতি ঘৃণাবোধ [১৩]।

তথ্যসূত্র

১. *Budapest Statement on Human Resource Development in a Changing World*, New York, UNDP, 1987, p. 10-25, For details about human resource development, see khadija Haq and Uner Kirdar, *Human Development:The Neglected Dimension* (Islamabad : North-South Ronnd Table, 1986).

২. Ryokichi Hirono, "Human Resource Development and Mobilization in t he Asia-Pacific Region", in *Technology and Development*, No.2,1989,p.5.

৩. *The Politics of Aristotle*, translated by Ernest Barker (London : Oxford University Press, 1961),pp.120-121.

৪. *North-South:A Progromme for Survival*, the Report of the Independent Commission on International Development Issues under the Chairmanship of Willy Brandt (London; Pan Books, 1980),p.12,

৫. *Al-Hadith*, Imam Ghazali's *Ihya Ulum-al-Din*, Vol.1, p.14.

www.amarboi.org

৬. মানুষের প্রয়োজন ও আচরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং প্রয়োজন সমূহের পদক্রমিক বর্ণনার জন্য দেখুন, Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Second Edition (New York : Harper and Row, 1970).

৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Dr.Moinuddin Ahmad khan, *Political Crisis of the Present Age: Capitalism, Communism and What Next?* (Chittagong: Baitush Sharaf Islamic Research Centre, 1990),p.47.

৮. দেখুন, Ghulam M. Haniff, "Muslim Development at Risk: The Crisis of Human Resources", in *The American Journal of Islamic Social Sciences*,Vol. 9,No. 4, Winter 1992.

৯. Maurice Bucaille, *The Bible, The Quran and Science*. translated from French to English by Alastair D. Pannell and the Author (Indianapolis: American Trust Publication, 1979),p.251.

১০. M.A.Kazi, "The Pursuit of Scientific Knowledge in Islam", in *Islamic Thought and Scientific Creativity*, Vol,1.January-March, 1990.

১১. *ইবনে মাজাহ্*, সং ২৫ ।

১২. একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিলেনঃ *"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা ইলমান না ফিয়ান ওয়া রিজক্বান আইয়েবান ওয়া আমালান মুসতাক বিলান,"* অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণ দানকারী জ্ঞান, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল করার সাহায্য কামনা করছি', দেখুন ইবনো আবাদল বার, *জা'মিউ বায়ানিল ইলমে*, ১ম খন্ড, পৃ.১৬২, উদ্ধৃত করেছেন ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্, *মহানবীর (সাঃ) যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা*, অনুবাদ, আ.ক.ম.আবদুল কাদের (চট্টগ্রাম ঃ শাহীন প্রকাশনী, ১৯৮৯),পৃ. ৫৫ ।

১৩. *Sahih Bukhari*, quoted by Dr. Serajul Haque, *Imam Ibn Taimiyah (R) and His Projects of Reform*, translated in Bengali by Dr.Muhammad Mujibur Rahman (Dhaka : The Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p.167.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতি
পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*

বাংলাদেশে দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র

সাফল্যের সংবাদে কে না উল্লসিত হয়! কিন্তু জাতীয় জীবনে এমন কিছু নেতিবাচক সাফল্য আসে যা জাতিকে বিষন্ন করে। আমাদের জাতীয় জীবনে সাফল্য সম্পর্কিত এমনতর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা *টান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল* (টিআই)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে। বিগত ১৮ অক্টোবর, ০৫ বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত'দুর্নীতির ধারণা সূচক' (সিপিআই) এই প্রতিবেদনে পঞ্চম বারের মত বাংলাদেশকে বিশ্বে দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থানকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯-১০-০৫)। চৌদ্দ কোটি মানুষের ললাটে দুর্নীতির কলঙ্ক তিলক এঁকে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম হতে পারার গ্লানি বড়ই বেদনাদায়ক। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে । এ দেশে বিগত তিন দশকে আমাদের যা কিছু প্রশংসনীয় অর্জন-- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জামানত ছাড়াই উন্নয়নমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বা গ্রামীণ ব্যাংক, ডাইরিয়া প্রতিরোধী *ওরসেলাইনের* আবিষ্কার, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, এবং নারী শিক্ষা ও রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের প্রসার ইত্যাদি সবকিছুই যেন ম্লান করে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী আমাদের এই কলঙ্কময় উপস্থাপনের মাধ্যমে। একবার নয়, পর পর পাঁচবার দুর্নীতিবাজ জাতি হিসাবে এই পরিচিতি, সারা বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, হুমকির সম্মুখীন করেছে জাতীয় অস্তিত্বকে। বিগত ৯ ডিসেম্বর, ২০০৫ *টিআই* কর্তৃক জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনের আলোচনায় বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সমালোচিত হয়েছে জাতিসংঘ প্রণীত দুর্নীতি বিরোধী সনদে (Resolution No 58/4 of 31st October, 2003) বাংলাদেশের সই না করার বিষয়টি। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর হতে সনদে অনুসমর্থনকারী ৩০টি দেশে সনদটি কার্যকর হয়েছে।**

---

* ১৬ এপ্রিল, ২০০৬ ইংরেজি Center for Policy Studies (CPS), Dhaka কর্তৃক "দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সামাজিক আন্দোলন" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ (সংশোধিত)।

** সুখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফ্‌তেখার আহমেদ চৌধুরী ২০০৭ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের সদর দফতর গিয়ে দুর্নীতি বিরোধী সনদে সই করেছেন।

www.amarboi.org

তবে যে বিষয়টা একজন সচেতন নাগরিককে উদ্বিগ্ন করেছে সেটি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের এহেন লজ্জাকর ও বিপর্যস্ত চিত্র উন্মোচিত হবার পরও বিষয়টা পর্যালোচনার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ হতে কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হল না, বিরোধী দলের পক্ষ হতেও আসল না সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিকারী কোন প্রতিবাদী কর্মসূচী, গোল টেবিল আলোচনায় বসলেন না সুশীল সমজের বুদ্ধিজীবীগণ, এবং পালিত হল না কোন মানব বন্ধন কর্মসূচী সামাজিক সংগঠন বা *এনজিওদের* পক্ষ হতে! আমরা জগৎবাসীর সামনে নব প্রজন্মের জন্য কি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছি? আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কি এক অনিশ্চিত ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎই না রচনা করেছি!

টি.আই. রিপোর্ট ছাড়াও কে না জানে বাংলাদেশের সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় অব্যাহত দুর্নীতির কথা ? সরকারী অফিস-আদালত যেমন ভূমি প্রশাসন, কাস্টমস ও কর সংগ্রহ ব্যবস্থা, পুলিশ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন, *টেন্ডার* বা সরকারী প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগ এবং এমনকি, শিক্ষা বিভাগ ও কোর্ট-কাচারির সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি ও স্বেচছাচারিতার অপ্রতিরোধ্য দাপট! একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে পরিচালিত এক জনমত জরিপের উপর ভিত্তি করে রচিত, *"বাংলাদেশ ঃ ইমপ্রুভিং গভর্নেন্স ফর রিডিউসিং পোভার্টি"* শীর্ষক প্রতিবেদনেও প্রশাসনে কর্তব্যবোধের অভাব, অদক্ষতা, দুর্নীতি, সরকারী সেবার নিম্নমান এবং এবং জনগণকে সেবা প্রদানের ব্যাপারে প্রশাসনের অমনোযোগ ইত্যাদির এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে (বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো*, ১০-০১-০৩)। অতি সম্প্রতি, *ডিসিসিআই*-এর উদ্যোগে "বাংলাদেশ ভিশন-২০২১" শীর্ষক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, "দেশ বর্তমানে যে সমস্যাগুলো অতিক্রম করছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, গভর্নেন্স, দুর্নীতি এবং অদক্ষতা" (*দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬-০৯-০৬)। অথচ আমাদের সংবিধানের ২১(১)নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" কিন্তু উল্লেখিত বাস্তব চিত্র সংবিধানে বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকৃত 'জনগণের' [অনুচ্ছেদ ৭(১)] দুর্বিসহ ভোগান্তি ছাড়াও, প্রতি বৎসর দুর্নীতির কারণে সরকারের অপচয় হয় ১১,২৫৬ (এগার হাজার দুই শত ছাপ্পান্ন) কোটি টাকা (দেখুন, *ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দৈনিক যুগান্তর*, ২৩-০৯-০২খ্রিঃ)।

সম্প্রতি প্রকাশিত *ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের* বিশ্ব প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্যবসারত অধিকাংশ কোম্পানী মনে করে যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সক্ষমতার পরিবেশ উন্নয়নে দুর্নীতি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে (*দৈনিক ইত্তেফাক*, "বাংলাদেশে ঘুষ-দুর্নীতি বেড়েছে বিনিয়োগ সক্ষমতা কমেছে" ৩১-১০-০৩)। *টি.আই.*-এর অপর এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পেশকৃত ৭৭০ টি অডিট

www.amarboi.org

রিপোর্টের মধ্যে ৬২৯টি আলোচিত না হওয়ায় প্রায় ২২ (বাইশ) হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি ঝুলে আছে (*দৈনিক প্রথম আলো*, ২২-০৯-০২)। এছাড়াও দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দুর্বিত্যায়নের কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ৬০,০০০ (ষাট হাজার) কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়ে থাকে (Money Laundering) বলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আবুল বারাকাত এক গবেষণা সমীক্ষায় উল্লেখ করেছেন (*বিবিসি*, ২৬-০৯-০৩)। দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হলে, তা দিয়ে শিশু ও প্রসূতির চিকিৎসা, আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও জনকল্যাণে ব্যয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে দেশটা যেমন অনেকদূর এগিয়ে যেত, তেমনি দাতাদের উপর আমাদের নির্ভরশীলতাও অনেকটা কমে আসত।

বাংলাদেশে দুর্নীতি সংক্রান্ত *টি.আই. রিপোর্টটি* প্রকাশিত হবার পর বেশ কিছু সমালোচনামূলক নিবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও উদ্বেগ প্রকাশ ও এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় লিখা হয়েছে প্রায় সবকটি জাতীয় দৈনিকে। কিন্তু সকল আলোচনায় অন্যের উপর দোষ চাপানোর প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। কোন আলোচনায় জাতীয় জীবনের গভীরে প্রোথিত এহেন জাতীয় সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই! উল্লেখ্য যে, আমরা যখন দেশে দুর্নীতির ব্যাপারে পরস্পরের উপর দোষ চাপানোর বিতর্কে লিপ্ত, পাশ্চাত্য দুনিয়ায় তখন দুর্নীতি একটি পৃথক জ্ঞান প্রকল্প (Academic discourse) হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তবে দেশের জনগণ বিশেষতঃ সুশীল সমাজের সবাই একথা স্বীকার করছেন যে, জাতির জীবনীশক্তি বিনাশকারী এই ভয়াবহ মহামারী হতে জাতিকে রক্ষা পেতে হলে একটি সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যাপারে উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭৭৫ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস মীরজাফরের পত্নী মণি বেগমের কাছ হতে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণের বিনিময়ে তাঁকে মুর্শিদাবাদের নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্তি প্রদান করেছিলেন বলে, তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট হেস্টিংসকে গভর্নরের পদ হতে *ইম্পিচ* করেছিলেন। এরপরও কিন্তু ভারতবর্ষে কোম্পানীর সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মাঝে ঘুষ গ্রহণের প্রবণতা থেমে থাকেনি। এই ভয়াবহ ক্যান্সার থেকে সরকারী প্রশাসনকে রক্ষা করার জন্য পরবর্তীতে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা যাচাই করার জন্য তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তন করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 'বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন' বা *(এসিআর)* প্রণয়নের বিধান আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে।

www.amarboi.org

বৃটিশ হতে স্বাধীনতা লাভের পর, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রণীত এক আইনের বলে 'দুর্নীতি দমন ব্যুরো' নামক এদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ন্যস্ত থাকার কারণে রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অবস্থায় 'দুর্নীতি দমন ব্যুরো' এর কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তাই দাবি উঠেছিল কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে 'দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে' স্বাধীন বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার। *বিএনপি* নেতৃত্বাধীন জোট সরকার অবশ্য দুর্নীতি সংক্রান্ত *টি.আই. রিপোর্টটি* প্রকাশিত হবার পূর্বেই নির্বাচনী অঙ্গীকারকে সামনে রেখে দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ শিরোনামে একটি বিল অষ্টম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে উপস্থাপন করে, যা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষার পর সংসদের ১১তম অধিবেশনে পাস হয়। একই বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। নয় মাস পর, ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর ড. এম. মনিরুজ্জামান মিঞা ও জনাব মনির উদ্দিন আহমেদকে সদস্য করে তিন সদস্যবিশিষ্ট *'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন'* গঠন করা হয়। এই কমিশনকে ঘিরে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ এবং দেশের অভ্যন্তরে সুশীল সমাজের মাঝে প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু বিগত ২১শে নভেম্বর, ২০০৫ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম বর্ষ পূর্তিতে দেখা যায়, কমিশন তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল সৃষ্টি, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করে কাজই শুরু করতে পারেনি! এই কমিশন গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করেছে ঠিকই, কিন্তু কমিশনকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য আরও যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়েছে বলা যায় না। এ জাতীয় হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে আগামীতেও যে দুর্নীতির অপ্রতিরোধ্য প্রসার ঘটবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অতএব, এ জাতীয় উদ্যোগ ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অবস্থা পরিবর্তনের কোন লক্ষণ আপাতত, পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

অতএব, ঘুরে ফিরে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটি হচ্ছে, সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মনের গভীরে প্রোথিত দুর্নীতির মত জাতির জীবনীশক্তি ধংসকারী একটি অভিনাসী ব্যাধি, আমাদের জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে একটি সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। একা সরকারের পক্ষে এর সমাধান সম্ভব নয় কেননা, জনগণের পক্ষ হতে সহযোগিতা না পেলে সরকারী কর্মকর্তারা দুর্নীতি করতে পারে না। অতএব, এই আন্দোলনে সরকার ও সুশীল সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। সমাজতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ একত্রিত হয়ে এব্যাপারে পথনির্দেশনা দিতে পারেন।

www.amarboi.org

দুর্নীতির অর্থনীতি

Oxford Advanced Learner's অভিধানমতে, দুর্নীতির অর্থ হচ্ছে অসততা বা অবৈধ আচরণ, বিশেষতঃ ক্ষমতা ও কতৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ। *টি.আই.*-এর *সিপিআই* (Corruption Perception Index) প্রতিবেদনও দুর্নীতিকে সরকারী ক্ষমতা ও সুবিধাকে বেসরকারী বা ব্যক্তিস্বার্থে অপব্যবহার অর্থে সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ্দের দুর্নীতিকে বোঝানো হয়েছে। দুর্নীতি প্রচলিত আইন ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হলেও মানুষের মধ্যকার এই অশুভ প্রবণতা মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন হতে অব্যাহত। প্রাচীন ঐশীগ্রন্থ *তওরাতে* (Old Testament) উল্লেখিত হয়েছে যে, 'যদি তুমি অর্থ ছাড়, তাহলে দেখবে তা ম্যাজিকের মত ফল দেবে!' অবশ্য পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই এ জাতীয় কর্মকে উৎসাহিত করা অনুচিত হবে'। প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য চানক্যের *অর্থশাস্ত্রে* রাজ অমাত্যদের (মন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ সরকারী আমলা) মাঝে দুর্নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুর্নীতি মানুষের *ফিত্‌রাত* বা স্বভাবের মধ্যে প্রথিত। ঐশী গ্রন্থ *আল-কুরআনে* মানুষের সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ বলেনঃ *"ওয়া উখ্‌দিরাতিল আনফুছুশশুহহা"* অর্থাৎ স্বার্থপরতা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট (*সূরা নিসা*, ৪: ১২৮)। মানুষের মাঝে এ জাতীয় প্রবণতাকে ঈমাম গাজ্জালী Satanic propensity বলে অভিহিত করেছেন। যতদিন মানুষের মাঝে এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকবে, ততদিন সমাজে দুর্নীতিও অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ বা সমাজ নেই, যা সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। এজন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) মানুষকে *এল্‌ম* বা জ্ঞানের চর্চা এবং *তাক্‌ওয়া* বা *আল্লাহ্* সচেতন ও *আমালুস্ সালেহ্* বা পুণ্য কর্মের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হবার তাগিদ দিয়েছেন।

দুর্নীতি আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার একটি অবিনাশযোগ্য প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির ব্যয় বিশ্ব অর্থনিতির পাঁচ শতাংশ এবং ঘুষ দুর্নীতির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ গড়ে শতকরা দশ ভাগ বেড়ে যায় বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা। এব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের মন্তব্য হচ্ছে, "Bribery has became a $1.5 trillion industry" অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে ঘুষ দেড় হাজার কোটি ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। ফলে Revisionist School বলে একদল অর্থনীতিবিদ্ দুর্নীতির ইতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণপূর্বক একে উন্নয়নের সহায়ক বলে এক ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। তাদের মতে, দুর্নীতি শুধু প্রশাসনের চাকাকেই গতিশীল করে না, দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজের কিছু লোকের হাতে পুঁজি সঞ্চিত (Capital accumulation) হয়। পুঁজি সঞ্চালন হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এই সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ ও চাকুরী সৃষ্টি হয় এবং এ থেকে পুনঃসঞ্চয় ও বিনিয়োগ– এই চক্রাকারে অর্থনীতিতে দুর্নীতি গতি সঞ্চালিত করে (দেখুন, N.H. Left,"Economic Development Through Bureaucratic Corruption" and J.S. Nye,"Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis", in Arnold J.

www.amarboi.org

Heidenheimer (ed.) *Political Corruption* (New York : Holt Reinhart and Wilson, 1970)। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তাদের-এ তত্ত্বকেও ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে যাদের হাতে অর্থ পুঞ্জিভূত হয়েছে, তা অর্থনীতিতে বিনিয়োগ নয় বরং মাত্রাতিরিক্ত ভোগ, অপচয় ও বিদেশে পাচার এবং অবৈধ ও সমাজ বিরোধী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের মত দুর্নীতিপরায়ণ ও সীমিত সম্পদের জনবহুল দেশে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন– আর এসবের জন্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে একটি প্রেরণাদায়ী আদর্শের।

আদর্শ ও উন্নয়ন

ঘুরে ফিরে যে কথাটা উঠে আসছে সেটি হচ্ছে, রাজনীতি ও প্রশাসনের গভীরে প্রোথিত দুর্নীতির মত জাতির জীবনীশক্তি ধংসকারী একটি ব্যাধি আমাদের জাতীয় সমস্যা। এর সমাধানে একটি জোরদার সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। যে কোন গোষ্ঠীবদ্ধ বা সামাজিক আন্দোলন সফল হতে হলে প্রয়োজন একটি উজ্জীবনী চেতনা বা আদর্শিক প্রেরণা। কি হবে আমাদের সেই প্রেরণা? এটি সমাজতত্ত্ববিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। প্রখ্যাত আচরণবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানী Sigmund Freud-এর মতে, মানুষ তার আচার আচরণে অনেক সময় অবচেতন মনে অনুভূতি ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের আদর্শিক প্রেরণা ও উন্নয়ন উদ্যোগের মধ্যকার কারণগত সম্পর্কের ব্যাপারে দু'একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

নমুনা এক ঃ বিগত শতাব্দীর প্রথমদিকে মার্কসীয় দর্শনের জোরালো প্রচারে ধর্মকে দরিদ্র শ্রেণীর আফিমের সাথে তুলনা করা হয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল যে, ধর্ম হচ্ছে ধনীদের শোষণের হাতিয়ার! এমনতর এক বৈরী পরিবেশে প্রখ্যাত জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ Max Weber ধর্ম ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে। সারা বিশ্বে আলোড়নসৃষ্টিকারী এই গ্রন্থে ওয়েবার দেখিয়েছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের পরবর্তী সময় হতে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন অর্জনকারী দেশগুলি হচ্ছে *প্রোটেস্ট্যান্ট* ধর্মাবলম্বী দেশ যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকা। অপরদিকে, রোমান *ক্যাথলিক* ধর্মাবলম্বী দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক হতে অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। এর কারণ হিসাবে ওয়েবার বলেন, *প্রটেস্ট্যান্টদের* উন্নতি লাভের কারণ হচ্ছে, এই ধর্মে কঠোর পরিশ্রম, মিতব্যয়, সঞ্চয় এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন ইত্যাদিকে ধর্মীয় কর্তব্য (Religious calling) হিসাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। অপরদিকে, *ক্যাথলিক* ধর্মে পার্থিব জীবনের উপর কম গুরুত্ব দিয়ে শুধু পারলৌকিক কল্যাণে ব্রতী হবার আহ্বান রয়েছে। Max Weber ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক প্রমাণে *The Sociology of Religion* (১৯৬৩) নামক অপর এক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বৃটিশ ভারতে মুসলিম সম্প্রদায় গরীব কেননা, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনে *রিবা* বা

www.amarboi.org

সুদ-কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে সুদের ব্যবসার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের হাতে পুঁজি সঞ্চিত হতে পারেনি। অপরদিকে, ভারতীয় শেঠরা সুদের ব্যবসার মাধ্যমে প্রভূত পুঁজির অধিকারী হয়েছিল যাদের কাছ হতে বৃটিশ সরকারকেও ঋণ গ্রহণ করতে হত।

নমুনা দুই ঃ আধুনিক খ্রিস্টান বিশ্বের প্রায় চারশত কোটি মানুষের মধ্যে একজনও পড়া-লেখা জানে না এমন অশিক্ষিত নেই। কারণ খ্রিস্টান পরিবারের একজন বালক বা বালিকা যখন বার বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাকে *চার্চে* নিয়ে যাওয়া হয় *ব্যাপটাইজ* করার জন্য। বালক বা বালিকাটির মাথায় হাত রেখে চার্চের পাদ্রী যীশুর বাণী শুনিয়ে বলেন, 'অশিক্ষিত থাকা পাপ'। এই পাপ মুক্তির জন্য ধর্মীয় চেতনা নিয়ে লেখা-পড়া করে বলে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ অশিক্ষিত থাকে না। আজকের বিশ্বে শিক্ষা-দীক্ষায় খ্রিস্টানদের উন্নয়নের পেছনে এই ধর্মীয় প্রেরণাই হয়েছে বড় নিয়ামক শক্তি।

নমুনা তিন ঃ Farrel Heady নামক এক গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারী শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে *Public Administration : A Comparative Perspective* (১৯৮৪) শীর্ষক একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। Heady তার তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষায় *সিভিল সার্ভিস* প্রশিক্ষণে ধর্মীয় শিক্ষার কতিপয় ইতিবাচক ফলাফল তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের আমলারা খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা (বিশেষতঃ *প্রটেস্ট্যান্ট* দর্শন) দ্বারা প্রভাবিত বলে, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অধিকতর সচেতন। অপরদিকে, চাইনিজ সরকারী কর্মকর্তারা কনফুসিয়াস দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে, জনগণের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সদাচরণের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী। পাশাপাশি, প্রতিবৎসর প্রকাশিত 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের' *বার্ষিক রিপোর্টে* ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৮০ (আশি) জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সম্পর্কিত এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠে! কেন এরূপ হয়? বিভিন্ন জরিপ প্রতিবেদনেও নৈতিকতার নীচু মানকে বাংলাদেশে সরকারী প্রশাসনের অব্যবস্থা ও অদক্ষতার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ, ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ্ ও সরকারী কর্মকর্তারা তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কোন আদর্শ বা ধর্মদর্শন দ্বারা উজ্জীবিত হয়না। তাদের পেশাগত বিশ্বদর্শনও (Professional Worldview) অস্পষ্ট। ফলে তারা সহজেই স্বার্থের তাড়নায় দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

নমুনা চার ঃ ইসলামের আবির্ভাবকালে, আরবের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল মূলতঃ সূদ ভিত্তিক। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান এতই প্রকট ছিল যে, ধনীরা যখন তাদের খাবারের উচ্ছিষ্ট দূরে ছুঁড়ে মারত, তখন তা গ্রহণের জন্য বুভুক্ষ মানুষ ও কুকুরের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি শুরু হত। রোমান *গ্ল্যাডিয়েটরসদের* মল্লযুদ্ধের ন্যায় সেই বীভৎস দৃশ্য ধনীরা উপভোগ করত। এহেন পরিস্থিতিতে *আদল* (ন্যায়বিচার) ও *এহসান*

www.amarboi.org

(কল্যাণ) ভিত্তিক সমাজ গঠনে *কুরআনের* আয়াত নাজিল হল : "*...তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়*" (*সূরা হাশ্‌র*, ৫৯ঃ৭)। এর বাস্তবায়নে 'সূদ'-কে হারাম করা হল এবং পরকল্যাণ বা *জাকাত* প্রদানকে ঈমানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হল। এই আদর্শিক ব্যবস্থাপনায় সমাজ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, মাত্র চার দশক সময়ের মধ্যে আরবের বাইরেও ইসলামী সমাজে সূদখোর কেউ রইল না। আবার *জাকাত* গ্রহনের মত কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না (খলিফা ওমর ইব্‌নে আবদুল আজীজের শাসন আমলে)।

নমুনা পাঁচ ঃ সপ্তম শতাব্দীতে মদিনা রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হিসাবে মহানবী (সাঃ) বনু জারয়ান গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন লাইতাইকে একবার জনগণের কাছ হতে *জাকাতের* অর্থ আদায়ের জন্য *আমীল* (রাজস্ব সংগ্রহকারী) নিয়োগ করেছিলেন। আদায়কৃত *জাকাত* সামগ্রী রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে জমা দেয়ার সময় আব্দুল্লাহ সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)'! এর এক ভাগ হল জনগণের কাছ হতে আদায়কৃত অর্থ, আর বাকী একভাগ লোকেরা আমাকে উপহার হিসাবে দিয়েছে"। একথা শুনে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, "তুমি সরকারী কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়ে যদি বাড়ীতে বসে থাকতে, তাহলে কি লোকেরা তোমাকে এসব উপহার দিত"? একথা বলে নবী করিম (সাঃ) সমস্ত উপহার সামগ্রী *জাকাতের* সাথে *বায়তুলমালে* (সরকারি কোষাগারে) জমা করার নির্দেশ দেন এবং পরদিন সমাবেশ ডেকে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য জনগণের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন *(সহীহ মুসলিম)*। এরই সাথে সংযুক্ত হয়েছে রাসূল (সাঃ) এর একটি সতর্ককারী *হাদীস*, "কাউকে কোন দায়িত্বে নিয়োগ করা হলে তাকে আমরা বেতন-ভাতা দেব। এর পর তিনি যদি কিছু উপরি গ্রহণ করেন, তাহলে সেটা বিশ্বাস ভঙ্গের (Breach of trust) কাজ" (*আবু দাউদ*)। উল্লেখ্য যে, অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিচারক ও প্রশাসকদেরকে ঘুষ প্রদানের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে *কুরআনে (সূরা বাকারা, ২: ১৮৮; এবং সূরা মায়িদা, ৫: ৬৩)*। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপর *হাদীসটি* হচ্ছে, "ঘুষখোর, ঘুষদাতা আর দু'জনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সবাই সমপর্যায়ের গুনাহ্‌গার" (*আহলে সুনান*)। অপর এক ঘটনায় মহানবী (সাঃ) একদা বাজার পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করেন যে, জনৈক ব্যবসায়ী জনগণকে প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় শুকনা গমের ভেতর ভেজা শস্য লুকিয়ে বিক্রির চেষ্টা করছে। এ জাতীয় অনৈতিক আচরণের জন্য তিনি ব্যবসায়ীকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করেছিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনা ও মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা, দুর্নীতির প্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের মনে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (Internal check) হিসাবে কাজ করেছে।

পরবর্তীকালে মদিনার বাইরেও ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতিলাভের কারণে, সরকারী প্রশাসনে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও নাগরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ (External control) প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। এর একটি হচ্ছে, সরকারী

www.amarboi.org

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কিত অভিযোগ শ্রবণ, তদন্ত ও দ্রুত প্রতিকার বিধানের জন্য *দিওয়ান-ই-মাজালিম* (সরকারী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান); এবং অপরটি হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অসাধুতা রোধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা প্রতিরোধক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান প্রতিপালন তদারকি প্রতিষ্ঠান *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) [বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন এই গ্রন্থে সংকলিত লেখকের "লোক-প্রশাসনে লোক জবাবদিহিতা ঃ আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি" শীর্ষক নিবন্ধটি]।

কথিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে, রাশিয়ার সাথে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে, সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস (King Charles-XII) তুরস্কে নির্বাসন যাপন করেন। দীর্ঘ বার বৎসরকাল তুরস্কে অবস্থানকালে অটোমান সম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে সেসময়ে সক্রিয় *দিওয়ান-ই-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) এবং *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) প্রতিষ্ঠান দু'টি রাজা চার্লসের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে রাজা দ্বাদশ চার্লস রাজ কর্মচারীদের আইন বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসাবে ইসলামের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাব্যবস্থার আদলে, Justitie Ombudsman (JO) এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য Consumer Ombudsman (CO) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন। এই সুইডিস *অম্‌বুড্‌জম্যান-ই* পরবর্তীকালে প্রশাসনিক স্বেচ্ছারিতার বিরুদ্ধে নাগরিকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও আইনসভা কর্তৃক *অম্‌বুডজ্জাঅম্যান* প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে (৭৭ নং অনুচ্ছেদ)। কিন্তু আজ অবধি নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক সংবিধানে উল্লেখিত ধারাটি কার্যকর করা হয় নাই [বাংলাদেশে *অম্‌বুড্‌জম্যান* বা ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা ও এর ভূমিকার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ *প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে অম্‌বুড্‌জম্যান* (প্রতিবিধায়ক), ২০০১]। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী খাবার ও ঔষধে ভেজাল বিরোধী অভিযান অনেকটা ইসলামী প্রশাসনের আইনগত প্রতিষ্ঠান *আল-হিসবারই* প্রতিফলন বলা যায়।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আমাদের করণীয়

নিবন্ধের ১ম ও ২য় অংশের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সামাজিক আন্দোলনের জন্য দরকার একটি প্রেরণাদায়ী আদর্শ। প্রশ্ন হতে পারে, এমন কি কোন দর্শন বা আদর্শ আমাদের সামনে আছে যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা জাতিকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম? আমাদের মাঝে সেই উজ্জীবনী শক্তি হচ্ছে ধর্মীয় দর্শন কেননা, *বিবিসি ওয়ার্ল্ড ট্রাস্ট* পরিচালিত এক সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত ধর্মপ্রাণ। সারা দেশ হতে জরিপে অংশ গ্রহণকারী পাঁচ হাজার একশত বার জনের মধ্যে ৯৭ শতাংশই স্বীকার করেছেন যে, তাদের জীবনে

www.amarboi.org

ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ (বিস্তারিত দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ নভেম্বর, ২০০৫)। দুর্নীতির উৎস হচ্ছে মানুষের মন-মজ্জাপ্রসূত প্রবণতা যা আপেক্ষিক। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে শাশ্বত ও চিরস্থায়ী! এর শিকড় মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত। মানবজাতির জীবন দর্শন ও পথ নির্দেশিকা এবং দুনিয়ার কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি সোপান পবিত্র *কুরআনে* মোমিন বা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত! মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহ্ তে বিশ্বাস কর (সূরা আল-ই-ইমরান,৩ ঃ ১১০)।

উল্লেখিত আয়াতে অন্তর্নিহিত রয়েছে মানুষের জীবন দর্শন, কল্যাণকামী প্রেরণা ও দায়িত্ববোধের চেতনা। এই আয়াতের বাণী কারো হৃদয়ে ভালভাবে প্রোথিত করা সম্ভব হলে, তিনি শুধু দুর্নীতিমুক্ত হওয়া নন, একইসাথে পরিণত হতে পারেন একজন দুর্নীতি প্রতিরোধকারী হিসাবে। কেননা, *কুরআনের নির্দেশ* মান্য করা প্রত্যেক *মোমিনের জন্য ফরজ* বা অবশ্যই পালনীয়। কোনক্রমে ফরজ তরক করা *কবিরা গুনাহ্* যা ক্ষমাযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বনবী (সা:)-এর একটি বহুল উদ্ধৃত হাদীস হচ্ছে ঃ

"যদি তোমাদের কেউ কোন অন্যায় বা পাপাচার অনুষ্ঠিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগে) অবশ্যই পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে এরূপ করতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন ভাষার মাধ্যমে (আদেশ উপদেশ) তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। তাতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে মন দ্বারা যেন তার পরিবর্তন কামনা করে। আর এটি হল ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় (সহীহ মুসলিম)"

অতএব, প্রতিটি *মোমিন* বা বিশ্বাসীর ধর্মীয় কর্তব্য ও এবাদত হচ্ছে, দুর্নীতির মত ধর্ম ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ শুধু পরিহার নয়, বরং তা প্রতিহত করা। তাই সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও হেদায়তের গ্রন্থ *কুরআন* নাজিলের মাসই হতে পারে আমাদের সেই দায়িত্ব পালনের নতুন অভিযাত্রা। এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা। মালয়েশিয়ার ন্যায় আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ্র মনোনীত *দ্বীন ইসলাম*। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতিমালার প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে "পরম করুণাময় আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস" [অনুচ্ছেদ-৮(১)]। বাংলাদেশে অভ্যন্ত রীণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় *"সৎকার্যের নির্দেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ"* সম্পর্কিত *কুরআনের* বাণী ও সংশ্লিষ্ট *হাদীসের* বহুল প্রচার এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সেমি-নার, *টক্‌শো* ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন ও উজ্জীবিত করার পাশাপাশি, বাহ্যিক চাপ (External check) সৃষ্টিকারী কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন *অম্বুড্‌জম্যান* নিয়োগ ও 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের' শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও কার্যকর করা প্রয়োজন।

এছাড়াও মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত করার লক্ষে কতিপয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

www.amarboi.org

প্রথমত ঃ সমাজতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন যা প্রশাসন ও রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবণতার কারণসমূহ চিহ্নিত করবে এবং এসবের প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করবে;

দ্বিতীয়ত ঃ দুর্নীতির প্রবণতা প্রতিরোধে প্রেরণাদীপ্ত কতিপয় নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন এবং তা সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসূচীতে অন্তর্ভূক্তকরণ। উল্লেখ্য যে, North South University-এর Ethics and Knowledge Club কর্তৃক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা কোর্স অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (দেখুন, Ethics in Core Curricula can Curb Corruption" in *The Daily Star,* Dhaka মার্চ ১৯, ২০০৬); এবং

তৃতীয়ত ঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রণীত নীতিমালাসমূহ সরকারী কর্মচারীদের আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও জাতীয় সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে বাসে, ট্রেনে, শপিং সেন্টার, নাটক-সিনেমা, চিত্রকলা এবং অফিস-আদালতের সর্বত্রই উচ্চারিত হবে আমাদের শ্লোগান ঃ

ঘুষ নেব না

ঘুষ দেব না

কাউকে দুর্নীতি করতে দেব না।

রাষ্ট্রের ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগে আকাশচুম্বি সমস্যারও যে সহজ ও দ্রুত সমাধান সম্ভব, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ হচ্ছে, 'নকলমুক্ত পরীক্ষা,' 'পলিথিনমুক্ত বাংলাদেশ' ও 'দূষিত বায়ুমুক্ত ঢাকা নগরী' ব্যবস্থাপনায়। 'খাবার ও ঔষধে ভেজাল বিরোধী অভিযান'ও আমাদের জাতীয় জীবনে সফলতার নতুন সংযোজন। বিশ্বায়নের এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে, আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশীরা, দুর্নীতির কারণে এভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারি না। আমাদের উজ্জীবনী সঙ্গীত হচ্ছে, "প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ"। আমাদের রয়েছে স্রষ্টা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতিকে উজ্জীবিত করার শক্তিশালী আদর্শ। শুধু প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের। *সিয়াম* সাধনার এবং *রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের* মাস হিসাবে পবিত্র রমযান মাসের *শবে কদরের* পরবর্তী দিনকে (*কুরআন* নাজিল হওয়ার পরবর্তী দিন) *'ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত দিবস'* ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হউক আমাদের হাজার মাইল পদযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ঙ. পুস্তক পর্যালোচনা

ক. বাংলা ভাষায় লোক-প্রশাসন চর্চা ২১৩-২১৬

খ. প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী ও পাশ্চাত্যের সমাধান : এশিয়ায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ব্যর্থতা ২১৭-২২১

www.amarboi.org

www.amarboi.org

পুস্তক পর্যালোচনা

ক. বাংলা ভাষায় লোক-প্রশাসন চর্চা*

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, *লোক-প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন* (ঢাকা ঃ খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৩) শীর্ষক পুস্তক পর্যালোচনা

দ্রুত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মোকাবেলায় বাংলাদেশকে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে "সুশাসন" প্রতিষ্ঠার আহ্বান এবং আগামীতে দেশটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশাবাদ ব্যক্ত করে সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডারিক টি. টেম্পল (*দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৭/০৬/০৩)। অনেকটা কাকতালীয় হলেও প্রায় একই সময়ে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে *লোক-প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন* শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যগ্রন্থ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে উড্রো উইলসনের (পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট) চিন্তাধারার আলোকে, স্বতন্ত্র পাঠ্য শৃঙ্খলা হিসাবে লোক-প্রশাসন শিক্ষার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ হতে শত বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষাটের দশকে আমেরিকার মহাশূন্যচারীরা যখন কল্পনার চাঁদে গিয়ে পৌছল এবং সবাই যখন বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত, তখন আমেরিকার *নাসা* (NASA) কর্তৃপক্ষ সদর্পে বিশ্ববাসীকে একথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ শতাব্দীতে মানুষের সকল সফলতার পেছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি, অন্যতম নিয়ামক উপাদান হচ্ছে 'মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সাংগঠনিক প্রযুক্তি'। সরকারি পর্যায়ে এই সাংগঠনিক প্রযুক্তিই হচ্ছে 'লোক-প্রশাসন' বা সরকারী শাসন ব্যবস্থা।

একটি দেশের সরকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধাভিত্তিক নিয়োগ, পদসোপানভিত্তিক সংগঠিতকরণ, উন্নত প্রশিক্ষণ ও নির্ধারিত নিয়ম-নীতির কাঠামোয় পরিচালনার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের জন্য সম্পদ ও সেবা সৃষ্টি করে থাকে। এ জন্য সকল দেশে প্রশাসনিক 'দক্ষতা' ও 'মিতব্যয়িতার' উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে চিরাচরিতভাবে। আবার সত্তর-এর দশকের শুরুতে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে 'নব লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের' কণ্ঠে উচ্চারিত হল যে, সরকারী প্রশাসকদের শুধু দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে সম্পদ ও সেবা সৃষ্টি করলেই চলবে না, সমতার ভিত্তিতে সমাজে বিতরণও নিশ্চিত করতে হবে! এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন

---

* সৌজন্যে ঃ *Bangladesh Political Studies*, Vol. V, No.XV111, 2005.

www.amarboi.org

প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে উন্নয়ন সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রশাসকদের জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভংঙ্গি গ্রহণ ও নৈতিকতাবোধ ইত্যাদি। পুনরায় আশি ও নব্বইয়ের দশকে প্রবর্তিত 'নব লোক- ব্যবস্থাপনা' মতবাদ বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিমন্ডলে সরকারী প্রশাসনকে 'ফলাফলমুখী' অর্থাৎ অধিকতর বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক ধাঁচের প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে প্রশাসনকে 'উন্নয়নমুখী' করা এবং এর 'জবাবদিহিতা' নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। মোটের উপর, প্রশাসনিক দক্ষতা ও উন্নয়নমুখীতা, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ও জবাবদিহি এবং ফলাফলমুখীতা ও দুর্নীতিমুক্তকরণ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে 'সুশাসন' (Good governance) যার কথা বিশ্বব্যাংকের বিদায়ী কান্ট্রি ডিরেক্টর উল্লেখ করেছেন। এই সুশাসন নিশ্চিতকরণে আরও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে, প্রশাসন সম্পর্কিত জনগণের পরিমিত জ্ঞান ও সচেতনতা। এই প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লোক-প্রশাসন হচ্ছে একটি দ্রুত বিকাশমান পাঠ্য শৃঙ্খলা (Academic discipline)।

স্বাধীনতাউত্তরকালে, বাংলাদেশে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীসমূহের প্রণয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংগঠন ও সেবা বিতরণে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কর্মী বাহিনী সৃষ্টি, এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গণসচেতনতা সৃষ্টি, মূলতঃ এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, পর্যায়ক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, কুষ্টিয়া ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসনকে পৃথক পাঠ্যসূচী হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে মাতৃভাষা বাংলায় এতদ্সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের স্বল্পতা। লোক-প্রশাসন পাশ্চাত্যের ইংরেজিভাষী পন্ডিতদের চিন্তাপ্রসূত বিষয় বলে, *রেফারেন্স* বই-পুস্তকসমূহ মূলতঃ ইংরেজি ভাষাতেই রচিত যা বাংলাদেশের ইদানিংকালের শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য নয়। লোক-প্রশাসন শিক্ষার্থীদের এ জাতীয় সংকট নিরসনকল্পে প্রবর্তক (Pioneer) ভূমিকা পালন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান। তাঁর রচিত, *আধুনিক লোক-প্রশাসন নামে* ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বিশাল গ্রন্থ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯০ সালে। বইটি শিক্ষার্থীদের মাঝে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইতিপূর্বে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রকাশিত, *A Handbook of Public Administration* গ্রন্থটি তাঁর অনুবাদে *লোক-প্রশাসন সার* নামে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। এতদ্সম্পর্কিত লেখকের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ Claude S. Geoge Jr. রচিত সুবিখ্যাত The History of Management

www.amarboi.org

Thought বইটি *ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ইতিহাস* শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। *লোক-প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন* শীর্ষক লেখকের গ্রন্থটি বিগত জুন (২০০৩) মাসে প্রকাশ করেছে ঢাকার খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী।

বিগত একশত বৎসর ধরে লোক-প্রশাসন বিষয়ক চিন্তা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যে বিশাল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানভান্ডার (Body of knowledge) গড়ে উঠেছে, তার বিবরণের পাশাপাশি, বাংলাদেশে লোক-প্রশাসনের উৎপত্তি, বিকাশ, কাঠামো ও কার্যগত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে বইটিতে। ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির প্রথম পর্যায়ে রয়েছে লোক-প্রশাসন পরিচিতি, এর উৎপত্তি ও বিকাশ, সাংগঠনিক তত্ত্ব, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক বিভাগ ও অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসন, প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, প্রশাসনিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, আমলাতন্ত্র ও কর্মচারী প্রশাসন এবং প্রশাসনিক আইন ও জবাবদিহি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশ প্রসংঙ্গে একটি বর্ণনামূলক অধ্যায় যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো, সচিবালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সংগঠন ও কার্যাবলী এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার। এছাড়াও প্রশাসনে সাধারণজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রায়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা এবং প্রশাসনিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের সুপারিশ রয়েছে এই অংশে। প্রতিটি অধ্যায় শেষে সংযোজিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্য জরিপের বিস্তারিত তথ্য-নির্দেশিকা।

বইটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লোক-প্রশাসনের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয় আলোচনাকালে শিক্ষার্থীদের বুঝার সুবিধার্থে দেশজ উদাহরণের ব্যবহার। পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক পরিবেশে রচিত পশ্চিমা এবং এমনকি, ভারতীয় লেখকদের রচিত গ্রন্থের সাথে এখানেই বইটির পার্থক্য। এছাড়াও লেখকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বইটি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যক্রম অবলম্বনে রচিত ও সংগঠিত। পূর্বে প্রকাশিত *আধুনিক লোক-প্রশাসনের* তুলনায় এবারের বইটিতে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে বাংলাদেশের 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা' বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার পরিষদ (উনবিংশ অধ্যায়)। এছাড়াও শিক্ষার্থী ও আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে, বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নাম ও এদের মধ্যকার কার্যবন্টনের তালিকা, স্থানীয় সরকার পরিষদ ও প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশসমূহ সংযোজিত হয়েছে পরিশিষ্টে। তবে বইটির অধ্যায় সংগঠনে কিছুটা অসতর্কতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমলাতন্ত্র সংগঠন তত্ত্বের (চতুর্থ অধ্যায়) আওতাধীন বিষয় হলেও পৃথক অধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়) আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা মূলতঃ একই বিষয় হলেও দু'টি অধ্যায়ে (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়) এর আলোচনা বিস্তৃত করা হয়েছে। লোক-প্রশাসন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি ও বাংলাদেশ লোক-

www.amarboi.org

প্রশাসনের অধ্যায়সমূহ যথাক্রমে প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড আকারে সাজানো যেত। এছাড়াও বাংলাদেশে লোক-প্রশাসনের সাংবিধানিক অবস্থান, লোক-প্রশাসনের উপর 'তথ্য প্রযুক্তি' ও 'বিশ্বায়নের' প্রভাব এবং অধুনা বহুল উচ্চারিত 'সুশাসন' (Good Governance) ও 'ই-গভর্নেন্স' (Electronic governance) সম্পর্কিত কিছু আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হলে বইটির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেত। গ্রন্থশেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর বর্ণনাক্রমিক সূচী (Index)ও পাঠকদের জন্য সহায়ক হত। আশা করি বইটির পরবর্তী সংস্করণে লেখক এ সকল ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও বি.সি.এস. পরীক্ষার্থী ও লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য *রেফারেন্স* বই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থটি উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করছি। বইটিতে মুদ্রণ বিভ্রাট সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে হয়। ভাষাগত সৌকর্য রক্ষা, শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রণীত নীতিমালা ও অভিধান অনুসরণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের গ্রন্থপঞ্জীসহ সমর মজুমদার অংকিত সুন্দর প্রচ্ছদ সম্বলিত ৮৩২ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র ৩৫০/- টাকা। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

www.amarboi.org

খ. প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী ও পাশ্চাত্যের সমাধান : এশিয়ায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ব্যর্থতা*

Dr. Doh Joon-Chien, *Eastern Intellectuals and Western Solutions: Follower Syndrome in Asia* (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.1980) শীর্ষক পুস্তক পর্যালোচনা।

পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহের দ্রুত উন্নয়ন এশিয়ার বহু দেশকে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সাহায্যে আধুনিকীকরণে (Modernization) অগ্রসর হতে উৎসাহিত করেছে। প্রখ্যাত এশীয় বুদ্ধিজীবী Dr. Doh Joon-Chien কিন্তু এ জাতীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এশীয়দের সমস্যা নিরসনে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ব্যর্থতার কতগুলি ঘটনা পর্যালোচনা করে তিনি স্থানীয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হবার জন্য প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী মহলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তাঁর সাড়া জাগানো *Eastern Intellectuals and Western Solutions: Follower Syndrome in Asia* শীর্ষক গ্রন্থটিকে পশ্চিমা প্রভাবের ফলে এশিয়াতে সৃষ্ট সমস্যাবলী পর্যালোচনা করার একটি সাহসী প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বইটিতে লেখক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। বিষয়গুলো হলো ঃ

১. এশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মানসিক হীনমন্যতাবোধ;

২. এশিয়ার দেশসমূহে পাশ্চাত্যমুখী উন্নয়ন পদ্ধতির প্রাসংগিকতা; এবং

৩. এশিয়ার পারিপার্শ্বিকতায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তির মূল্যায়ন।

সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হয়েও নিজের মধ্যকার পাশ্চাত্য-এশিয়া দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসাবে, "পাশ্চাত্যমুখী একজন এশীয় হিসাবে নিজের পরিচিতি আবিস্কারের প্রচেষ্টা" হিসাবে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃতি ও মন-মানসিকতার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। দীর্ঘদিন প্রাচ্যের মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এশীয় অবচেতনভাবে পশ্চিমা ঘেঁষা মানসিকতা গড়ে তুলছেন। এ অবস্থাকে লেখক 'বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশন' (Intellectual colonization) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এ সকল বুদ্ধিজীবীগণের সাথে সমাজের সাধারণ মানুষের সামান্যই আত্মীক

*Courtesy: *Philippine Journal of Public Administration*, Vol.XX V111, No. 1&2, January-April 1984

www.amarboi.org

সংযোগ বা সংহতি থাকে। তারা পাশ্চাত্য সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখেন, কিন্তু প্রাচ্য সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ। এক দশক পূর্বে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সুইডিশ অর্থনীতিবিদ Gunnar Myrdalও তাঁর বিখ্যাত *Asian Drama* গ্রন্থে এশিয়ার দেশসমূহের সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও আন্তর্জাতিক এজেন্সীসমূহের কর্মকর্তা এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পদে সমাসীন পশ্চিমা ঘেঁষা এশিয়দের সম্পর্কে মন্তব্য প্রসংগে বলেছিলেন যে, তাঁরা "স্বদেশীয় সংস্কৃতির নয় বরং *কসমোপলিটান* বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের অংশ।" তাঁদের অনুভূতি এমনই যে, যা কিছু পাশ্চাত্যের সবই এশিয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট। লেখকের দৃষ্টিতে এরাই প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী। পাশ্চাত্য প্রযুক্তিতে আস্থাশীল এবং স্বদেশে এর সুবিধাভোগে আগ্রহী প্রাচ্যের এসকল বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ধার করে নিজেদের দেশে প্রয়োগের জন্য কিংবা তার গুণকীর্তনের জন্য সর্বদা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখেন। ফলে এশিয়ার সমস্যা নিরসনে তারা স্বদেশী জ্ঞানপ্রসূত লাগসই প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবনে অবহেলা করছেন এবং অল্পই মৌলিক চিন্তাভাবনা করছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দরিদ্রদের কল্যাণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নেতিবাচক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন বলতে মূলতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বোঝান হত এবং তা মোট জাতীয় উৎপাদন (G.N.P.) বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দ্বারাই পরিমাপ করা হত। উন্নয়নের এ জাতীয় মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) ব্যাখ্যা সমাজের যেখানে প্রায় সবারই সমভাবে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ আছে, শুধু সেখানেই অর্থপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সেহেতু এসব দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। সবার জন্য উপযোগী হতে হলে, উন্নয়নকে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর নিকট অর্থবহ করা প্রয়োজন।

বিগত কয়েক দশকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে, মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হলেও মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, অর্জিত সম্পদ কিভাবে বন্টিত হচ্ছে? উন্নয়নের প্রধান সুফলভোগী কারা? দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি তাদের সংখ্যার অনুপাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে? উপরিউক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেখক ১৯৬০-১৯৭০ সময় কালের মধ্যে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং ভারতের পারিবারিক আয় জরীপের উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণে লেখক দেখিয়েছেন যে, এসব দেশে উপরের স্তরের শতকরা ২০ভাগ পরিবারের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এই হার পাকিস্তানে শতকরা ৪১.৫ ভাগ থেকে মালয়েশিয়ায় শতকরা ৫৬.৬ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অপরদিকে, নীচের স্তরের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের যে অংশ লাভ করে, তা তাদের শতকরা

www.amarboi.org

সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। উপরন্তু, এসব দেশে আয়ের শতকরা হার পরিবর্তনের গতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, উপরের স্তরের শতকরা ২০ভাগ পরিবারের আয় বৃদ্ধি হয়েছে নীচের স্তরের শতকরা ৪০ভাগ পরিবারকে বঞ্চণার বিনিময়ে! উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর কাছে উন্নয়ন অর্থপূর্ণ হয়নি। অথচ এরাই হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

লেখকের মতে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিমা পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশ উন্নয়নের ব্যাপারে নিজ দেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এবং উন্নয়নকে নিজেদের পরিচালিত ব্যাখ্যায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁদের মতে, যদি বিশ্বের অশিল্পায়িত উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়ন কামনা করে, তবে তাদেরকেও পাশ্চাত্য মডেল ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের চিন্তাধারা কারিগরী সাহায্য কর্মসূচীগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় যা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহকে আধুনিকীকরণে পশ্চিমা দেশের প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উপরন্তু, এসব দেশের পশ্চিমা ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের অবস্থিতির ফলে, পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা ইত্যাদি হস্তান্তরে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এধরনের পাশ্চাত্য প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে সৃষ্ট সমস্যাবলীর বিষয় গ্রন্থের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর, মালয়েশিয়ায় প্রশাসনিক সংস্কার এবং উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, মার্কিন পন্ডিতগণের *(Montgomery-Easman Report)* সুপারিশক্রমে, "উন্নয়ন প্রশাসন ইউনিট" (Development Administration Unit) নামে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মডেল প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা বিদেশী উপদেষ্টাগণকে হতাশ করে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থাপিত "উন্নয়ন প্রশাসন ইউনিট" সংক্ষেপে *ডিএইউ*, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয় এবং সাংগঠনিকভাবে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। লেখক এধরনের ব্যর্থতার জন্য তিনটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

১. একদিকে *ডিএইউ* এবং বিদেশী উপদেষ্টাগণের মধ্যেকার এবং অপরদিকে ডিএইউ-এর সাথে উপ-প্রধানমন্ত্রীর সংঘাত;
২. বিদেশী উপদেষ্টা এবং *ডিএইউ*-এর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই;
৩. *ডিএইউ* -এর প্রশাসনিক সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাংগঠনিক স্বার্থের সংঘাত এবং উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক সাংস্কৃতিক দিকটি উপেক্ষিত হওয়া।

অপর উদাহরণে লেখক দেখিয়েছেন যে, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ায় উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কর্ম বাজেটকে (Performance Budget) উপায় হিসাবে ব্যবহার না করে বরং এটাকেই লক্ষ্য হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করাতে, কিভাবে ব্যবস্থাটির উপযোগিতা সীমিত হয়ে পড়ে। ফিলিপাইনের সিভিল সার্ভিসে অতিরিক্ত কর্মচারী সমস্যা সমাধানের

www.amarboi.org

জন্য পূণর্গঠন কমিশন কর্তৃক কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার কারণে কাংখিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয় নাই। পরবর্তীকালে ফিলিপাইনের বাজেট কমিশন আবিষ্কার করে যে, যেহেতু দু'টো দেশের (ফিলিপাইন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভৌগলিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতাসমূহ উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেহেতু এর (Operational Cost Budget) সফলতার জন্য আমেরিকার কেন্দ্র ভিত্তিক সময়ের অনুমান পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপসর্বস্ব ফিলিপাইনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কাংখিত ফল লাভে সক্ষম হয় নি।

এ সকল উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক উপসংহার টেনে বলেন যে, একমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে বিশেষভাবে সংগঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমেই এশিয়ার প্রশাসনিক সমস্যাসমূহের উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশের সরকারসমূহ তাদের দেশে স্বল্প পরিবর্তন বা কোনরূপ পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী না হয়েও অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবর্তনকে দৃশ্যমান করার জন্য পশ্চিমা প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করে থাকে। ফিলিপাইনে উন্নয়ন বাজেট সমন্বয় কমিটি (D.B.C.C.) ও কর্ম বাজেট (Performance Budgeting) প্রাচ্যের ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চমৎকার উদাহরণ।

সবশেষে, বইটির সপ্তম অধ্যায়ে লেখক এশিয়ার দেশগুলির সমস্যা নিরসনের জন্য দেশোপযোগী বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে "মানব উন্নয়ন" (People Development) এবং "মানব প্রশাসন" (People Administration) নামে দু'টি নতুন ধারণা প্রবর্তন করেছেন। পশ্চিমা ধাঁচের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে, সেহেতু তা দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতির সাথে অসংশ্লিষ্টতার কারণে পরিহার করা উচিত। লেখকের মতে, এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে, "মানব উন্নয়ন"। "মানব উন্নয়নের" প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মানবিক দৃষ্টিভংগী। জনগণই এর জ্যোতিকেন্দ্র। যেহেতু উন্নয়নের লক্ষ্য সরাসরিভাবে জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং তা বিশ্বজনীন ও মূল্যবোধসম্পন্ন। পাশ্চাত্য উন্নয়ন দর্শনের মত "মানব উন্নয়ন" কিন্তু মূল্য নিরপেক্ষ নয়। সমাজের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি রয়েছে এর সুস্পষ্ট অংগীকার। প্রত্যেক পরিবারের জন্য জীবন যাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার লক্ষকে সামনে রেখেই "মানব উন্নয়ন" কর্মসূচীর অগ্রযাত্রা। এর মধ্যে রয়েছে : পুষ্টি, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা, এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ। দেশের জনগণকে উৎপাদনক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য এগুলি অত্যাবশ্যক।

"উন্নয়ন প্রশাসন" যেহেতু মূল্য নিরপেক্ষ এবং দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণের প্রতি উদাসীন, সেহেতু "মানব উন্নয়নের" উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রশাসনিক হাতিয়ার হবে লক্ষের প্রতি অংগীকারবদ্ধ "মানব প্রশাসন"। এর সফলতার জন্য লেখক নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঃ

www.amarboi.org

১. এশিয়ার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়া;
২. এশিয়ার দেশসমূহের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটান;
৩. স্থানীয় সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার;
৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানব উন্নয়নের সফলতার জন্য আবশ্যকীয় চেতনা সৃষ্টি করা; এবং
৫. পন্ডিত, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যকার ভাষাগত ব্যবধান ঘুচিয়ে সকলকে সংহত করা।

লেখক প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবীদেরকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে এশিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহবান জানিয়েছেন, যাতে এশিয়ার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল্যায়ন ও অনুধাবনের মাধ্যমে নতুন প্রেক্ষিত গড়ে তোলা যায়। এশিয়ার সম্ভাবনাসমূহের দ্বার উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক কিন্তু পাশ্চাত্যের সবকিছু প্রত্যাখ্যানের পক্ষপাতি নন, বরং শুধুমাত্র অনুঘটক (Catalyst) হিসাবে পাশ্চাত্য ধারণা, প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্রহণে সম্মত। তবে তা কোন ভাবেই দেশীয় চিন্তার বিকল্প হিসাবে নয়।

এখানে মৌলিক বিষয় হচ্ছে, *"মানব প্রশাসনের"* মাধ্যমে "মানব উন্নয়নের" উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর করতে হলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সমগ্র পর্যায়ে মানব অর্থাৎ জনগণের অংশগ্রহণ একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু এশিয়ার অধিকাংশ দেশে সামরিক ও বেসামরিক আমলা-এলিট শ্রেণীর হাতে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে কিন্তু লেখক বিশেষ কোন পথ নির্দেশ করেন নাই। লেখকের "মানব প্রশাসন" দর্শনের সম্ভবতঃ এটাই প্রধান দুর্বলতা। তদুপরি, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্য কৃৎকৌশলের ব্যর্থতার যে সমস্ত উদাহরণ লেখক বর্ণনা করেছেন, সেগুলির পাশাপাশি, সফল দেশীয় বিকল্প কৃৎকৌশলের কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করতে পারলে তাঁর বক্তব্য আরো মনোগ্রাহী হত। অধ্যাপক দোহ্ -এর "মানব প্রশাসন" *(People Administration)* তত্ত্বটি *Vincent Ostrom* বর্ণিত "গণতান্ত্রিক প্রশাসন" *(Democratic Administration)* এর সাথে অনেকটা তুলনীয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিকল্পনাবিদ ও নীতি প্রণেতা ছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রশাসন বিষয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য বইটি চিন্তা-ভাবনার নতুন পথ নির্দেশ করেছে।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

পরিশিষ্ট

সুষ্ঠু প্রশাসন ও *সুস্থ সমাজ* গঠনের মৌল নীতিমালা

সুষ্ঠু প্রশাসন ১৪টি নীতিমালার উপর নির্ভর করে*	সুস্থ সমাজ গঠনে ইসলামের ১৪টি মৌল নীতিমালা*
১. শ্রম বিভাগ (এতে বিশেষায়ণকে স্বাভাবিক নিয়মের অধীন করা হয়)।	১. *তাওহীদ* বা এক আল-াহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য।
২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (দায়িত্ব কর্তৃত্বের পরিপূরক)।	২. বিবাহ ও পরিবার হবে সমাজ গঠনের ভিত্তি এবং সন্তানের প্রতি যেমন পিতা-মাতার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য।
৩. শৃঙ্খলা (তা একজন নেতা সৃষ্টি করেন)	৩. সমাজের অভাবগ্রস্থ, ইয়াতিম ও আত্মীয় স্বজনদের হক বা প্রাপ্য অংশ যথাযথভাবে পরিশোধ করে তাদেরকে সাহায্য করা।
৪. *আদেশের ঐক্য* (মানুষ দ্বৈত আদেশ পালন করতে পারে না)।	৪. ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সংস্পর্শ পরিহার করা।
৫. *নির্দেশের ঐক্য* (একই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক গুচ্ছ কাজকে একটি খাত এবং একক পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন)।	৫. অপব্যবহার পরিহার করা।
৬. ব্যক্তি স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থের অধীনে স্থাপন।	৬. সমাজের গরীব-দুঃখীদের সাথে বিনয়ের সাথে আচরণ করা।
৭. পারিশ্রমিক (তা হবে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কারস্বরূপ)।	৭. অন্যায়ভাবে প্রাণহানি না ঘটানো।
৮. *কেন্দ্রীকরণ* (কেন্দ্রীকরণ স্বাভাবিক নিয়মের অধীন)।	৮. অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের বা পিতৃহীনের ধন-সম্পত্তি হস্তগত বা আত্মসাৎ না করা।
৯. *পদসোপান* (কর্তৃত্ব পর্যায়, দলভিত্তিক কর্ম সম্পাদন নীতি)।	৯. কৃপণতা বা অমিতব্যয়িতা পরিহার করা।
১০. আদেশ (প্রত্যেকের জন্য স্থান সুনির্দিষ্টকরণ)।	১০. ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করা।
১১. সমদর্শিতা (তা ন্যায়বিচার এবং দয়া দুয়েরই ফলশ্রুতি)।	১১. পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও *সততার নীতি* অনুসরণ করা।
১২. কর্মীদের কাজের মেয়াদের স্থিতিশীলতা।	১২. অভাবের কারণে সন্তান হত্যা না করা।
১৩. উদ্যোগ (তা ব্যবসার জন্য শক্তির উৎস)।	১৩. সামাজিক আচরণে *অহংকার* পরিহার করে বিনয়ী হওয়া।
১৪. *দলচেতনা* (একতাই বল)।	১৪. কোন বিষয়ে পুংখানুপুংখ যাঁচাই না করে আন্দাজের উপর ভিত্তি করে কথা না বলা।
*Henri Fayol, *General and Industrial Management* (London : Issac Pitman & Sons Ltd. 1949), p. 97.	*আল-কুরআন ঃ *সূরা বনী ইসরাইলের* ২২ থেকে ৩৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

নির্ঘণ্ট

॥ অ ॥

অবাধ, ৮৮
অমার্ত্য সেন, ১৫
অরিয়েন্টালিজম, ১৩
অরিয়েন্ট, ১২, ১৩
অম্‌বুড্‌জ্‌ম্যান, ২১০
অরিয়েন্টালিস্ট, ১৭
অষ্ট্রেলিয়া, ৫২, ১৪৯
অডিট আপত্তি, ২০৩
অষ্টম জাতীয় সংসদ, ২০৪
অমুসলিমদের সাথে মৈত্রী চুক্তি, ১১২
অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ, ১৩৩
অষ্টিন, ১০১
অমুসলিমদের সাথে পরামর্শ, ৮৮, ১১০
অমুসলিমদের সাথে মৈত্রী চুক্তির বৈশিষ্ট্য, ১১১
অপশাসন, ১৫৬
অভিযোগ, ৭৪
অষ্ট্রেলিয়ান গবেষক, ৭৪
অসৎকর্মে নিষেধ, ১৯৬
অশোকের ধর্মমঙ্গল, ২০
অনুঘটক, ২১, ২২৩
অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ, ১৩৩
অম্‌বুড্‌সম্যান, ১৮
অশোক, ১৮
অনীহার কারণ, ১৫৭
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, ১৩৩
অসামঞ্জস্যতা, ৯০

॥ আ ॥

আদল বা ন্যায়বিচার, ৮০, ১৩৯,২০৭
আদর্শ, ১২২
আদর্শিক প্রেরণা, ২০৬
আদর্শিক প্রেষণা, ১৮৮
আদর্শিক ভিত্তি, ১৮৮
আবেগের শৃংখলা, ১৮৭
আমেরিকান বিশেষজ্ঞ, ১১৪
আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১২০
আমেরিকার স্বাধীনতার পিতাগণ, ১১৯, ১২০
আমেরিকা, ৫১,২০৬
আলেকজান্ডার, ১২
আলোক বিজ্ঞানী, ১৪
আধুনিক লোক-প্রশাসন, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮৪, ৯৩, ১১৩, ২১৭
আধুনিক ন্যায়পালের উৎস, ১৭৭
আধুনিক প্রশাসনের ধারণা, ১১৩
আধুনিক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ, ৮৪
আধুনিক ও ইসলামী প্রশাসনের
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৭
আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের উদ্দেশ্য, ১৬৭
আধুনিক সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, ১২০
আধুনিক চীন, ৮৯
আধুনিক শিক্ষা, ৬৬
আধুনিকীকরণ, ২২১
আইনের শাসন, ১০৭
আইন সভা, ২৭
আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল, ১৩৩, ১৪৯, ১৫০
আনুগত্য, ৮৫
আউটপুট, ৫০
আব্‌দ আল-মালিক, ১৪০, ১৪৭
আবদুস সালাম, ১৪
আবদেল হাদী, ১১৩
আবু দাউদ, ২০৮
আবুল ফজল, ২০

www.amarboi.org

আবেদনের পচিশ বৎসর পর টেলফোন লাভ, ১৪৫
আমলাদের জবাবদিহি, ৬৪, ৮৯
আমলা-এলিট, ১৫১, ১৬১, ২২৩
আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ৩০
আমলাতন্ত্রে নৈর্বক্তিকতা, ৮৭
আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, ১৫৯, ১৬১
আমলাতন্ত্র, ২৫ ৩০ ৩১, ৫০, ৫৪, ৬১, ৬২, ৬৩, ৭৪, ৮৭, ৮৯, ১১৪, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৫৯, ১৬০, ১৭৫, ২১৭
আমলাতন্ত্রের বিশ্বদর্শন, ৬৪
আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের ধারণাসমূহ, ৩০, ৭৫
আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, ১৭২
আমলাতান্ত্রিক বিশ্বদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, ৬৪
আমানত, ৬৬, ৮৪, ১৪১
আমালুস্ সালেহ্ বা পূণ্যকর্ম, ১০৫
আমীর হাসান সিদ্দিকী, ১১৪
আমীল, ১৭২, ২০৮
আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাগন, ১২০
আরবি গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ, ১৭
আল্-বেরুনী, ১৪, ১৯৪
আল্-ফারাবী, ২০,১৯৪
আল্-মাওয়ার্দী, ২০, ১৩৮
আল্-খাওয়ারিজমি, ১৪
আল-আমিল, ১০২, ১০৪
আল-ফাই, ১০৬
আল-ওয়ালী, ১০২, ১০৪, ১৩৬
আল-রাজী, ১৯৪
আল-কাজী, ১০২
আল-কুরআন, ২০৫
আল-খারায, ১০৬
আল-জাজারি, ১৯৪
আল-হুর প্রতিনিধি, ১৭৫
আল-হুর খলীফা, ১২৩, ১৯৭
আল-হুর খলীফা হিসাবে মানুষের মিশন, ১৯৬
আল-হুর সার্বভৌমত্ব, ১০১
আল-হিস্‌বা, ১১১, ১৩৮, ১৪৮, ২০৯,
আলজিরিয়া, ১৩
আন্তর্জাতিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান, ১৪৯
আন্তর্জাতিক প্রশাসন বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ১৭৩
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন, ১৪
আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস, ২০১
আমলাতন্ত্র বা লোক-প্রশাসন, ১৩৪
আমিল, ১০৪, ১১০
আখিরাত, ১৩৬, ১৪০
আত্মা, ১৯৭

॥ ই ॥

ইতালী, ১৩
ইহুদী, ৯৯
ইংল্যান্ড, ১৩, ২০৬
ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র ১০৮
ইজ্‌তিহাদ ৮৬,৯৩
ইসলামী শিক্ষা দর্শন, ১৯৭
ইসলামী লিগ্যাল সিষ্টেম, ১৪৯
ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, ১১০
ইসলামী প্রশাসনের বিশ্বদর্শন, ৬৭
ইসলামী জীবনাচরণ, ১৩৬
ইসলামী সংস্কৃতি, ৮৭, ১১৪
ইসলামী সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা, ১৩৬
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ১১১
ইসলামী সমাজ, ৭৭, ৮৮, ১১১, ১২৫, ২০৮
ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ১০৯
ইসলামী শরীয়া, ৮৬, ১১১
ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা, ১০১, ১০২, ১০৯

www.amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্র, ১৭, ১৮, ৮৩, ১০০, ১০৬, ১১১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ২০৮
ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রেরণা, ১১১
ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব, ১১১
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে পরামর্শ, ৮৮, ১১০
ইসলামী রাষ্ট্রে মূর্তিপূজা, ১১১
ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ, ৯৯
ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কৌশলসমূহ, ৮৪
ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব, ১০১
ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ৭৬
ইসলামী প্রশাসন তত্ত্ব, ৬৫, ৬৬, ৮৫
ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বের মূল লক্ষ, ৬৫
ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, ৮৯, ১৩৬, ১৪১
ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, ১৩৬
ইসলামী প্রশাসন, ২০, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১১০, ১৩৬, ১৩৫, ১৩৯, ১৪১, ১৪৭
ইসলামী প্রশাসনের লক্ষ, ৮২, ১৩৭
ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও নাগরিক প্রতিরক্ষা, ১৩৭
ইসলামী রাষ্ট্রে আল-হিস্‌বার ভূমিকা, ১৩৮-১৩৯
ইসলামী প্রশাসনে সরকারী আমলাদের মৌলিক পথনির্দেশিকা, ৯৩
ইসলামী প্রশাসকদের চেতনা, ৬৬
ইসলামী প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক দর্শন, ৬১
ইসলামী প্রশাসনে বিশ্বদর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ৬৭
ইসলামী প্রশাসনে কর্তৃত্ব, ৮৬, ১৩৬
ইসলামী প্রশাসনে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট কর্তৃত্ব কাঠামো, ৬৬, ৯২
ইসলামী প্রশাসনে মুহ্‌তাসিব, ১৩৮
ইসলামী প্রশাসনে নেতৃত্ব, ৯৩
ইসলামী আকিদা, ১৪০
ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ পাঠ্য তালিকায়, ১৭৩
ইসলামী লোক-প্রশাসন, ৭৫, ৭৬, ৭৭
ইসলামী লোক-প্রশাসনের ৭১, ৭৫, ৭৬, ৭৭
ইসলামী দর্শন, ৬৫
ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস, ৯৪
ইসলামের শিক্ষা, ৬৬, ৬৭, ১৪০, ১৪১, ১৯৭
ইসলাম পূর্ব আরবের অবস্থা, ৯৮
ইসলাম, ৬৬, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪,১৩৫, ১৪০, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ২০৭, ২১০
ইক্‌রা, ১৮৮
ইসলামের বিশ্বদর্শন, ১৯৭
ইসলামের সুমহান ও সুসংহত প্রশাসনিক নীতিমালা, ২০
ইসলামে পাঁচটি বিষয়ে নিয়মত চর্চা, ১২৩
ইসলামের মূল শিক্ষা, ১৯৩
ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, ৮৭, ১৪১
ইসলামী জীবনাচরণের মৌলিক ভিত্তি, ১৩৬
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, ১২৩
ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা, ১৯৭
ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীসমূহ, ১৮৯
ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ উন্নয়নে ন্যায়বিচারের, ৯২
ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের বৈশিষ্টসমূহ, ১২১
ইসলামে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত, ১২৫
ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার, ১২১, ১২৫
ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার, ৮২, ৯২
ইসলামে জ্ঞান অর্জন, ১৯১

www.amarboi.org

ইসরাইল, ১৪৯, ১৫২
ই-গভর্নেন্স, ২১৮
ইরাক, ১৪
ইবনে তাইমিয়া, ৮৫, ১০৯, ১৪১
ইবনে মাযাহ্, ৮২
ইব্নে হিশাম, ১০৪
ইব্নে হাইতাম, ১৪
ইব্নে খাল্দুন, ২০
ইনসাফ, ১৩৭
ইয়েমেন, ৯৮
ইন্দোনেশিয়া, ১৩

॥ ঈ ॥

ঈমাম গাজ্জালী, ২০, ১৮৯, ২০৫

॥ উ ॥

উজারা, ১১০
উৎপাদনের উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার, ৯২
উগান্ডা, ৫৪,
উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ, ১১৮
উপহার গ্রহণ, ১৭২, ২০৮
উপহার প্রদান, ১৭১
উপ-পদ্ধতি, ৭৬
উন্নয়নশীল বিশ্ব, ৪১, ৪৩, ১৪৬, ১৬০
উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির লোক-প্রশাসন, ৭৫
উন্নয়নশীল, ১৬০
উন্নয়নশীল দেশসমূহ, ৪৬,১৫১
উন্নয়নশীল দেশগুলো, ১৫২
উন্নয়নশীল দেশের সরকারসমূহ, ২২২
উন্নয়ন সাহায্য, ১১৮
উন্নয়ন ও প্রশাসন, ৪২
উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ৪১
উন্নয়ন প্রশাসন ইউনিট, ২২১
উন্নয়ন প্রশাসন ২৮, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ২২১, ২২২
উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা, ৪২
উন্নয়ন, ৪১, ৪২, ৪৩, ২২০, ২২১
উন্নয়নের সুফল, ৪১
উন্নয়নের লক্ষ, ৪২
উইলী ব্রান্ড, ১৮৮
উইলী ব্রান্ড কমিশন রিপোর্ট, ১১৮
উড্রো উইলসন, ২৫, ২৬, ২১৫
উম্মাহ্, ১৭, ৭৬, ৯৭, ৯৯, ১০০
উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান, ১৯২

॥ এ ॥

এসিআর, ২০৩
এশিয়ার প্রশাসনিক সমস্যা, ২২২
এলিট, ৭৬, ১৪৫, ১৫১
এরিস্টোটলের পলিটিক্স, ১৪
এহসান, ২০৭
এমবিও, ৫১
এফ. ডবি-উ টেলর, ৩১
এশিয়ার বুদ্ধিজীবী, ২১৯

॥ ও ॥

ওয়াটারগেট কেলেংকারী, ৭৭
ওয়াক্ফ, জাকাত এবং ছদ্কা, ৮৩
ওয়ালী, আমিল, কাজী, মুহ্তাসিব, ১০৮
ওয়ালী, ১১০
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, ২০২
ওয়ারেন হেস্টিংস, ২০৩
ওরসেলাইন, ২০১
ওমর ফারুক (রাঃ), ৮৪, ৯০, ১৩৬, ১৪১, ১৪৭
ওমর ইব্নে আবদুল আজীজ, ১৪০, ১৪৭
ওয়েসলিয়েন বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫
ওয়েবারীয়ান আমলাতন্ত্র, ৫০,১৭৪
ওয়েবার, ৩১, ২০৬

॥ ঔ ॥

ঔপনিবেশিক শাসন, ১৩, ৬৫

www.amarboi.org

॥ ক ॥

কেন্দ্রীয়করণ, ৬২
কৌটিল্য, ২০
কৌটিলের অর্থশাস্ত্র, ২০
কোতোয়াল, ১৩৮
কোর্ট বিল্ডিংগুলো, ১৫৬
ক্যাথলিক, ২০৬
কনফুসিয়াস, ১৮০
কনফুসিয়াস দর্শন, ৮৯, ১৭৫, ২০৭
কর্ম বাজেট, ৪০, ২২১, ২২২
কর্ম মূল্যায়ন, ১৩২, ১৯৬, ১৯৭
কর্ম বিভাজন নীতি, ১০২
কর্মদক্ষতা, ১৮৭
কর্মপ্রক্রিয়া, ২৩
কর্মকর্তা নিয়োগের ভিত্তি, ১০৮
কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ, ৯২, ১০০
কমনওয়েলথ, ৫২
কালো আমেরিকান, ১২০
কানাডা, ৫১,১৫০
কাজী, ১১০, ১৩৯
কাজী ও মাজালিম, ১৩৮
কাঠামো, ২৩
কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া, ৯২
কাঠামোগত সংস্কার, ৫৪
কম্পিউটার, ১৪
কফি হাউস, ১৬
কবিরা গুনাহ্, ২১০
কমিশন রিপোর্ট, ১১৮
কর্তৃপদীয় সংস্কৃতি, ৪০, ৬৩
কর্তৃত্ব, ৬২, ৮৫
কুরআন, ৬৫, ৭৫, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১২, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৮৮, ১৯০, ১৯৬, ২০৬, ২০৮
কুরআনে জবাবদিহি, ১৪১
কুরআনের বর্ণনা, ১৯৭
ক্লিনটন প্রশাসন, ৫১
কিতাব-উর-রাসূল, ৯৯

॥ খ ॥

খলীফা ওমর (রাঃ), ১৮,১০৮,১৩৭,১৩৯
খাত্তাব, ১১০
খারাজ, ১০৫
খালিদ ইব্নে ওলীদ, ১৪৭
খলিফা, ৬৬, ৬৭, ১৩৬, ১৪০, ১৪৭, ১৭৭
খলীফা (প্রতিনিধি), ৮২, ১৭৪
খলিফা আল্-মনসূর, ১৪
খলিফা আল-মামুন, ১৭, ১৪০, ১৪৮
খলিফা আলী (রা:), ২০, ১০৮
খলিফা ওমর ইব্নে আবদুল আজীজ, ২০৮
খ্রিষ্টান ধর্ম, ৮৯
খ্রিস্টান বিশ্ব, ২০৭
খ্রিস্টানদের উন্নয়নে ধর্মীয় প্রেরণা, ২০৭
খোলাফা'য়ে রা'শেদীন, ২০, ৮৫, ৮৮, ৯৩, ১৩৬, ১৩৮

॥ গ ॥

গবেষণা, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪
গবেষণারত ১৯১,
গুরুত্ব আরোপ, ১৭৬
গ্রেট বৃটেনে, ৫১
গোত্র, ৯৮
গোষ্ঠীগত স্বার্থ, ১৫৯, ১৭৬
গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি, ১৭০
গ্যালিলিও, ১৬, ১৭
গ্রহীতাকেন্দ্রীক প্রশাসন, ৭৪

www.amarboi.org

গ্রহণ প্রান্তে, ১৫১
গ্রামীণ ব্যাংক, ২০১
গ্রীক দর্শন, ১৪, ১২০
গনিমত, ১০৫, ১০৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৮০, ১৫০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮০
গণসচেতনতা, ২১৬
গণতন্ত্র, ১৪, ১৫, ১৬, ১১৪,১৩২
গণতান্ত্রিক, ৮৮
গণতান্ত্রিক প্রশাসন, ২২৩
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, ১৩৪
গণতান্ত্রিক সংবিধান, ১৩৪

॥ ঘ ॥

ঘানা, ১৫২
ঘুষ, ১৭১, ২০৫, ২০৮
ঘুষদাতা, ১৭২, ২০৮
ঘুষখোর, ১৭২,২০৮

॥ চ ॥

চন্দ্রগুপ্ত, ২০
চরম দারিদ্র্যসীমা, ১১৭
চার্চ, ২০৭
চানক্যের অর্থশাস্ত্র, ২০৫
চাইনিজ সরকারি কর্মকর্তারা, ৮৯, ১৭৫
চিলি, ৫৩
চিকিৎসালয়, ১৮

॥ ছ ॥

ছিয়া ছিত্তাহ্ বা ছয়টি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ, ১১৩
ছাদ্‌কা, ৮৩, ১০৪, ১০৫

॥ জ ॥

প্রশাসনে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা, ১৫৬
জন অংশগ্রহণক, ৫৪
জন প্রশাসন দক্ষতা জরিপ ১৭২
জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা, ৫৪, ১৫৬
জন রল্‌স, ৩১, ৩২
জনস্বার্থ, ৩০, ৩১, ৩২, ৬১, ৬৩, ৬৬, ১৩২, ১৩৩, ১৩৮, ১৫৯, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯,
জনস্বার্থ প্রতিরক্ষা, ১৪৮
জনস্বার্থ সংবেদনশীল, ১৬১
জনস্বার্থ সংরক্ষক, ১৬০
জনস্বার্থ সংরক্ষণ, ৩০, ৮৯, ১৩১, ১৩৭, ১৪১, ১৭৫, ২০৮
জনগণের অংশগ্রহণ, ৬৩, ৭৪, ১৬৮, ২১৬
জনগণের প্রতিক্রিয়া, ১৫১
জবাবদিহি, ৬৩, ৬৭, ৯০, ৯৩, ১০৮, ১১০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪৯, ১৬৯, ১৭৫, ১৯৬, ১৯৭, ২১৬, ২১৭
জবাবদিহিতা, ৭৬, ৮৯, ১৩২, ১৪১
জরুরতে ছিত্তা, ৮২
জার্মানী, ১১৭, ২০৬
জাকাত, ৯৭, ১০৪, ১০৫, ১১১, ১৭২, ২০৮
জাবির ইব্‌নে হাইয়ান, ১৯৪
জাতিসংঘ, ২০, ৩৯, ৪৭, ৮৫, ৮৬, ১১৪,১১৮,১৬৯,১৮৭
জাতিসংঘের প্রশাসন বিশেষজ্ঞ, ৮৪
জাতিসংঘের মহাসচিব, ১১৭
জাতিসংঘের সভাপতি, দাস্তে কাপুটু, ১১৭
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, ১১৭
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি
জোসেফ গারবা, ১১৮,
জাতিসংঘের দ্বিতীয় উন্নয়ন দশক, ৪০

www.amarboi.org

জাতিগঠন, ১৭
জাতীয় স্বার্থ, ১৭৬
জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি, ২২০
জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ভূমিক, ১৯৫
জিন, ২০
জিহাদ, ১০৫
জিজিয়া, ১১১, ১০৪, ১০৫, ১০৬

॥ ঞ ॥

জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত রাসূল (সা:) -এর জ্ঞানভাষ্য, ১৩
জ্ঞান প্রকল্প, ২০৩

॥ ট ॥

টান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (টিআই), ১২, ২০১
টি.আই., ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭৩

॥ ড ॥

ডেনমার্ক, ১৪৯, ১৫৪
ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল-াহ, ৯৯
ডুয়াইট ওয়ালডো, ৭৭
ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, ২১৬
ডাইকে, ১৮৮,
ডিএইউ, ২২১
ডিসিসিআই, ২০২,

॥ ঢ ॥

ঢাকা সচিবালয়, ১৪৫,১৫৪,১৬১

॥ ত ॥

ত্রি-মুখী জবাব দিহি, ১৩৬
তিরমিজী, ৮২
তথ্য প্রযুক্তি, ২১৮
তওরাত, ২০৫
তাঞ্জানিয়া, ১৪৯
তাওহীদ, ১৩৬, ১৯৩
তাক্ওয়া, ১৯৮
তুলনামূলক লোক-প্রশাসন, ২৮
তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষা, ৮৯
তুলনামূলক প্রশাসন গ্রুপ, ২৮

॥ দ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৩১, ৩২, ৪৩,
দাঁড়কাক, ১২
দক্ষতা, ২৩, ২৫, ২৪, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৫০, ৬৫, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৯, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৬, ২১৫
দুর্নীতির অর্থনিতি, ২০৫
দুর্নীতির উৎস, ২১০
দুর্নীতি কারণসমূহ, ২১১
দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা, ২০২,
দুর্নীতি, ৫২, ৬৩,৭২, ১৫৮, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১৫, ২১৬
দুর্বিত্যায়ন, ২০৩
দারিদ্র্য বিমোচন, ২০৩
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪, ২০৪
দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ, ২১১
দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই),২০১
দুর্নীতিবাজ জাতি, ২০১
দুর্নীতি বিরোধী সনদ, ২০১
দ্বাদশ চার্লস, ১৪৮, ১৪৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৫০,
দেওয়ানী কার্যবিধি-১৯০৮, ১৫৮
দেওয়ানী আদালত, ১৫৮

www.amarboi.org

দক্ষতা, ২৩, ২৪, ২৫, ৫০, ৬৫, ৭১, ৭২, ৭৩, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৬
দার্শনিক ভিত্তি, ৮০
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, ৪০
দারিদ্র্য বিমোচন, ৮২
দুর্নীতি দমন ব্যুরো ,২০৪
দক্ষিণ আফ্রিকা, ১২০
দিওয়ান-আল-মাজালিম, ১৮, ১১১, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৮, ১৪৯, ১৭৭, ২০৯
দারুন নদওয়া, ৯৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ২১৬
দক্ষতা ও ব্যয় সংকোচন, ৬৫
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা কোর্স, ১৭৩
দিওয়ান, ১০১
দান্তে কাপুট্টু, ১১৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ২৩, ২৬

॥ ধ ॥

ধর্মের গুরুত্ব, ১৭৯
ধর্ম, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ২০৬
ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক, ২০৬
ধর্ম ও উন্নয়ন, ২০৬
ধর্মীয় শিক্ষার ইতিবাচক ফলাফল, ২০৭
ধর্ম রাষ্ট্র, ১০৭
ধর্মমঙ্গল, ১৮
ধর্মবিচার সভা, ১৬
ধর্মীয় দর্শন, ২০৯
ধর্মীয় অনুশাসন, ১৭৫
ধর্মীয় কর্তব্য, ২০৬
ধর্মীয় বিশ্বাস, ২১০
ধর্মীয় পুণ্য, ৮৩
ধারণাসমূহ, ৭৫

॥ ন ॥

নৈর্ব্যক্তিক, ২৫, ৭২
নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, ২৮
নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ, ১৭৪
নৈর্ব্যক্তিকতা, ৭৪, ৮৪, ৮৭
নৈতিক, ১৭১
নৈতিক মূল্যবোধ, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬
নৈতিক চরিত্র, ৬৬
নৈতিক বিধান, ১৭৬
নৈতিকাবোধ, ১৬৯, ১৭২, ১৭৬
নৈতিকতা কোর্স, ২১১,
নৈতিকতা, ৩০, ৭৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ২১৬
নৈতিকতার স্থায়ী মানদন্ড, ১৭৪
নৈতিক মূল্যবোধের আপেক্ষনিরপেক্ষ মানদন্ড, ১৭৩
নৈতিকতার মান, ১৭৫,২০৭
নেপোলিয়ান, ১৩,
নেতৃত্বের ধরন, ৮৮
নেতৃত্ব প্রদান, ৯২
নর্থ কেরোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৫
নূরুন্নবী চৌধুরী,১৫৬
ন্যায় ভিত্তিক ও কল্যাণকর প্রশাসন, ২০
ন্যায়পরায়ণতা, ৮৫, ১৬৯
ন্যায়পাল, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৬, ১৪৮,১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৭৭
ন্যায়বিচারের কর্মসূচিসমূহ, ৯২
ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ ,১৫৮,১৬০
ন্যায়পাল পদে নিয়োগ, ১৫৮
ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যাপারে সরকারগুলোর এত অনীহার কারন, ১৫৭
ন্যায়পাল নির্বাচনী কমিটি, ১৬৫

www.amarboi.org

ন্যায়বান, ১৭১
ন্যায়পাল, ১৬৮
ন্যায়সঙ্গত বন্টন ও পুনর্বন্টন, ৯২
ন্যায়বিচার, ৬৪, ৬৫,৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ১০০, ১০৪, ১০৮, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪,১২৫, ১৩৭, ১৭১, ১৭৪, ১৭৪, ১৯৬, ২০৭, ২১৬
ন্যায়বিচারের দু'টি বিষয়, ১২০
নমোচ, ১৮৮
নফ্‌সে আম্মারা, ১৮৯, ১৯০, ১৯৭
নফ্‌সে মুত্‌মাইন্না, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৭
নফ্‌সে লাউয়ামা, ১৮৯, ১৯৩,১৯৭
নব লোক-প্রশাসন, ৩২, ৪৬, ৪৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২৬
নব লোক-প্রশাসনের লক্ষ, ৭৪,
নব লোক-প্রশাসন আন্দোলন, ৩০, ৭১,৭৪,৭৯, ৯২
নব লোক-প্রশাসনবিদ্‌দের মতে, ৭৩, ৭৪
নব লোক-ব্যবস্থাপনা, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ২১৬
নব লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচী, ৫৩, ৫৪
নব লোক-ব্যবস্থাপনার উপাদান,৪৮, ৪৯, ৫০
নব লোক-ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা, ৫৭
নব লোক-প্রশাসন আন্দোলন, ৯২
নব রাজনীতি বিজ্ঞান, ৭৩
নরওয়ে, ১৪৯, ১৫৪
নয়া অর্থ ব্যবস্থা, ১১৮,১১৯
নয়া অর্থ ব্যবস্থা আন্দোলনে ন্যায়বিচার, ১১৯
নয়া আর্ন্তজাতিক অর্থ ব্যবস্থা, ১১৮
নাইজেরিয়া, ১৫০
নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত, ১১৭
নামাজ, ১২৪
নাসা ,২১৫
নাগরিক প্রতিরক্ষা, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৯, ২০৮
নাগরিকদের অংশগ্রহণ, ১১৪
নাগরিকদের প্রতিরক্ষা, ১৭৭, ১৪৯
নাগরিকদের রক্ষাব্যবস্থা, ১৫২
নীতি প্রণয়ন, ২৬, ২৭, ৩০, ৩২, ১৬৮
নীতি বাস্তবায়ন, ২৭, ৩২
নীতিশাস্ত্র, ১৭১,
নীতিসমূহ, ২৬
নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, ১০৮
নিয়োগের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ, ১০৮
নিয়োগ, ৮৪
নিউজিল্যান্ড, ৫২, ৫৪, ১৪৯, ১৫০
নির্বাহমূলক প্রশাসন, ৩৯
নিযাম-উল্ মুলক, ২০
নিসাব, ১০৫
নিয়ন্ত্রণ, ১৩২
নিয়ন্ত্রণ পরিধি, ২৯
নিশ্চিতকরণ, ১৪১
ন্যায়বিচারক শাসক, ১৪১

॥ প ॥

পে-স্কেল,৭৩, ১৮৭
পে-স্কেলের আদর্শ রাষ্ট্র, ১২০
পেশাগত বিশ্বদর্শন, ২০৭
প্রেরণাদীপ্ত নৈতিক বিধিমালা, ২১১
প্রেষণা ব্যবস্থা, ৮৪
প্রোটেস্ট্যান্ট, ২০৬
প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং, ৭১
পোশাক শিল্প, ২০১,
পথ নির্দেশিকা, ১৭৪

www.amarboi.org

পদসোপান, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০, ৬৭, ৭৪, ৭৫, ৮৫, ১০৯, ১৩৩, ১৩৬, ১৬৯
পদসোপান তত্ত্ব , ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪১,
পদসোপানভিত্তিক, ৫১
পদসোপানিক তত্ত্ব ,৮৯
পদার্থবিদ্‌দের সম্মেলন, ১১৭
পূণ্যের কাজ, ৮৪
প্যারেজ দ্যা কুয়েলার, ১২৫
প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া, ৯৮
প্যারাডাইম, ৪৫
প্রটেস্ট্যান্টদের উন্নতি লাভের কারণ, ২০৬
প্রশাসনের গুণগত মান, ১৬৯
প্রশাসনিক সংস্কার, ২১৭
পঞ্চতন্ত্র, ১৭
পরামর্শ,১০৯, ১১০
পরামর্শ ও মত বিনিময়, ১০৯
পরীক্ষণ বিজ্ঞান, ১৪
প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, ১৮
প্রথম দিওয়ান, ১০৩
প্রফেসর,ফ্রেড্রারিক, ১২০
প্রটেস্ট্যান্ট দর্শন, ১৭৫, ২০৭
প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান, ১৫৪
প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন, ২২২
প্রবাদ, ৩০
প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ১৫৬
প্রশাসনে নিয়োগ, ১২৬
প্রশাসনের সনাতনী মূল্যবোধ, ১৭৬
প্রশাসন ২৫, ২৬, ৪২, ১৬৭
প্রশাসনিক উন্নয়নে ন্যায়পাল, ১৪৮
প্রশাসন সংস্কার কমিশন, ৫৫
প্রশাসন বিজ্ঞান, ২৪
প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী করা, ২১৬
প্রশাসকদের স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, ১৫৩, ১৭১
প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৭১
প্রশাসকদের নৈতিকতাবোধ, ১৬৯
প্রশাসনিক নৈর্ব্যক্তিকতা, ৮৮
প্রশাসনিক নৈতিকতার সার্বজনীন ভিত্তি, ১৬৮
প্রশাসনিক দুর্নীতি, ৫৫, ১৭১
প্রশাসনিক স্ববিবেচনা, ৫৭, ১৬৯, ১৭০
প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা, ১১১, ১৪৬, ১৪৯, ১৫২, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬০, ১৬১, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৭
প্রশাসনিক নীতিমালা, ২৮, ৩০, ৩০, ৩১, ৩২
প্রশাসনিক পদসোপান, ১৫১
প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, ১৬২
প্রশাসনিক কর্মে স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চেতনা, ১৭০
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি, ১৫৬
প্রশাসনিক উন্নয়ন, ১৫৭
প্রশাসনিক এলিট, ১৫১
প্রশাসনিক সংস্কৃতি, ১৩৩
প্রশাসনিক সংস্কার, ২৫, ৪৬, ৪৭, ৫২, ৫৪, ৫৭,২১৬
প্রশাসনিক সংগঠন, ২৮
প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, ১৩২, ১৪৫, ১৬৭, ১৬৮, ২১৬, ২১৭
প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী, ২১৯, ২২০
প্রাচ্যের ঐতিহ্য, ২১
প্রাচ্য, ১২
প্রাচ্যতত্ত্ব, ১২
প্রাচ্যতাত্ত্বিক, ১৩
প্রাচীন গ্রীসর, ১৫
প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ৮৯
প্রাণী বৈচিত্র রক্ষার্থে, ১৮

www.amarboi.org

প্রকিউরেটর, ১৪৯
প্রতিষ্ঠানিক কৌশল, ৮৩
প্রতিদিন গড়ে, ১১৭
প্রতিনিধি (খলিফা), ৮২
প্রতীচ্যের দর্শন, ২০
পাদ্রী, ২০৭
পাশ্চাত্য, ১৩, ১৬, ৪৬
পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব, ২২৩
পাশ্চাত্যের মানুষ, ১৫
পাশ্চাত্য দর্শন, ২০
পাশ্চাত্য প্রযুক্তি, ২২০, ২২১
পশ্চিমা প্রযুক্তি, ২২২
পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ব্যর্থতা, ২১৯
পাশ্চাত্য প্রশাসনিক মডেল, ২০
প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী, ২১৯
পাশ্চাত্য মডেল ও প্রযুক্তি, ২২১
পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ, ১১৪
পাশ্চাত্যমুখী উন্নয়ন, ২১৯
পাশ্চাত্যমুখীতা এবং লোক-প্রশাসন, ৪৩
পাবলিক, ৪২
পাটনা, ১৫
পাকিস্থান, ৫৩, ১৫০, ২০৪
পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর, ১১৮
পশ্চিমা ঘেঁষা বুদ্ধিজীবী ,২২১
পশ্চিমা প্রযুক্তি, ২২২
পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে ,১২
পশ্চিমারা, ১২, ১৩
পরিকল্পনা প্রণয়ন, ১৩১, ৮০, ৯২
পরিস্রবণ পদ্ধতি, ৮৪
পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে, ১৭৩
পুলিশ, ১৭০

॥ ফ ॥

ফলাফলমুখিতা, ২১৬
ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৭০
ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ২৮
ফ্র্যাংক মেরিনী,৭৭
ফকীহ্, ১৪০, ১৪৭
ফা'ই, ১০৫
ফাতিমা বিন্‌তে মোহাম্মদ, ১০৮
ফাতিমা বিন্‌তে আসাদ, ১০৮
ফিনল্যান্ড, ১৪৯
ফিলিপাইন,৫৩,৫৪,২২১, ২২২
ফিলিপাইনে উন্নয়ন বাজেট সমন্বয় কমিটি, ২২২
ফিত্‌রাত, ২০৫

॥ ব ॥

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, ২৪
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা আন্দোলন, ৩১
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস, ১৯৩
বেদুইন, ৯৮
বেনামী, ১৩৪, ১৬৯, ১৭৫
বদরের যুদ্ধ, ১০৭, ১০৯
বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্নীতির শীর্ষে ,২০১
বদরের যুদ্ধবন্দী কাফীরদের মুক্তিপণ,১৯১
ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ইতিহাস, ২১৭
ব্যবস্থাপনাবাদ, ৫১, ৫২
ব্যবসা প্রশাসন, ৫১
ব্যয় সংকোচন, ৩০, ৩২, ৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৬
ব্যাপটাইজ, ২০৭
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ১২১, ১২৪
ব্যবিলন, ১৫
বৃক্ষরোপণ, ১৮
বৃটিশরা, ১৩

www.amarboi.org

ব্রাহ্মণ পন্ডিত কংকা, ১৪
বাস্তবায়নে, ২৬
বার্কার, ১২১
বাগদাদ, ১৪,১৭
বায়তুল হিক্‌মা, ১৭
বায়তুলমাল, ২০৮
বাজারভিত্তিক জন প্রশাসন, ৫৪
বাংলাদেশে দুর্নীতি, ২০৬
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন, ১৭২
বাংলাদেশে ন্যায়পাল, ১৫৮
বাংলাদেশ, ৫৪, ১৫৪, ১৭০, ১৭৩, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৭, ২১৬
বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র, ১১৯
বাংলাদেশের সরকারী আমলাগণ, ৮৯
বাংলাদেশের সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা, ২০২
বাংলাদেশের সংবিধান, ১০৮
বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ, ২০৯
বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ২০
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ৯
বাংলাদেশ প্রশাসন, ২১৫, ২১৭
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ৬৩
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট, ২০৭
বাংলাদেশ গড়তে প্রেরণাদায়ী আদর্শ, ২০৯
বাংলাদেশ গড়তে সামাজিক আন্দোলন, ২০৯
বাংলাদেশী, ২১১
বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন, ২০৩
বলিভিয়া, ৫৩
বর্ণদাংগা,৭৭
বর্ণবৈষম্য আইন, ১২০
বুখারী শরীফ, ১০৮
বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশন, ২১৯
বুদ্ধিজীবী, ২২৩
বর্তমান বিশ্ব, ১১৭
বিদ্‌পাই, ১৭
বিক্ষোভপূর্ণ সময়,৭২
বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি, ২০১
বিকেন্দ্রীকরণ, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৭৪,
বিজ্ঞান ও দর্শন, ১৪,
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, ১৩
বিএনপি, ২০৪
বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা, ১১৮
বিশ্বদর্শন, ৬১, ৬৫, ১৯৬,
বিশ্বস্ত, ৮৫,১২৬
বিশ্ববোধ, ১১১
বিশ্বব্যাংক, ১২, ৫৪, ১৩১, ২০২, ২০৫
বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর, ২১৫, ২১৬
বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ, ৫৩
বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, ১৭৫
বিশ্বাসীর ধর্মীয় কর্তব্য, ২১০,
বিশ্বায়ন, ২১১, ২১৫, ২১৮
বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশিকা, ১৭৪
বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন চর্চা, ১৭৯, ২১৬
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লোক-প্রশাসন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, ১৭৩
বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে, ৩০
বিষয়বস্তু, ১১১,
বিচার-কার্য ,৮৫
বিবিসি ওয়ার্ল্ড ট্রাস্ট পরিচালিত জরিপের ফলাফল, ২০৯
বিটিটিবি, ১৭০
বিতরণমূলক ন্যায়বিচার, ৭৭
বিজ্ঞান ও উন্নয়ন গবেষণা, ১৯১

www.amarboi.org

॥ ভ ॥

ভেজাল বিরোধী অভিযান, ২০৯
ভারসাম্য, ১১০
ভারতীয় শেঠ্‌রা ,২০৭
ভারতীয় উপমহাদেশ, ১৩
ভাল ও মন্দের সর্বজনীন ভিত্তি, ১৭৩
ভারতীয় পার্লামেন্টে ন্যায়পাল বিল,১৫০
ভাগ্য, ১৯১
ভিক্টর সিডেল, ১২৫
ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ৭৭

॥ ম ॥

মেধা, ২৫, ৬৬, ৮৪, ৮৫, ৯২, ১২২
মেধা যাঁচাইয়ের মানদন্ড, ৯২
মেধা ও যোগ্যতা, ১০৮
মেধাভিত্তিক নিয়োগকৃত, ৮৪
মৌর্য সম্রাট অশোক, ১৮
মৌরিতানিয়া, ১৫২
মৌলিক চাহিদা পূরণ, ৮২, ৯২
মৌলিক পথ নির্দেশিকা, ৯৩
মোট জাতীয় উৎপাদান, ২২০
মোবাইল কোর্ট. ১৮
মোহসেনীন, ১৯৮
মোঘল সম্রাট আকবর, ১৫
মোহাম্মদ আল-ব্যূরে, ৭৫, ৭৬
মোয়াজ ইব্‌নে জাবাল, ৮৬
মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র, ৯৮,১৩৬
মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন, ৮৬, ৮৮, ৯৩, ৯৭, ১০২, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১৩৭
মদীনা রাষ্ট্র, ৭৫, ৭৭, ৮৩, ৮৮, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১৭১, ২০৮
মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ, ১১০
মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, ১০১
মদিনা রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে ন্যায়বিচার, ১১২
মদীনা সনদ,১৭, ৬৫, ৯৯, ১০০
মূল্য নিরপক্ষ, ২৩, ২৫, ২৬, ৩১, ৪০, ৬১, ৬৫, ৭১, ৭৩, ১৫২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৬, ২২০, ২২২
মূল্যবোধ, ২৫, ২৬, ৩০, ৬০, ৭৬, ১৭২
মুহ্‌তাসিবের দায়িত্বসমূহ, ১৩৮
মূল্যায়ন, ১৩১
ম্যাজিস্ট্রেট, ১৭০,.১৭৮
মডেল, ৪০, ৫৪, ৭৭
মনুষ্য চিকিৎসালয়ের, ১৮
মরুবাসী বেদুইন, ৯৮
মস্‌জিদ, ১০১
মহানবী (সাঃ), ২০, ১১১
মহানবী (সাঃ) ও খোলাফা'য়ে রা'শেদীন, ৭৭
মহানবী (সাঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা, ৯৭, ১০১
মহানবী (সাঃ)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, ১০৭-১১৩
মহানবী(সা:) প্রবর্তিত মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো, ১০২
মহানবী (সাঃ)-এর সচিবালয়, ১০৩
মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ,৭৫
মজলিশ-ই-শুরা, ১৩৬
মন্ত্রণালয়, ২৭
মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবিধানিক সরকার, ৯৭
মানব প্রশাসন, ২২২, ২২৩
মানব উন্নয়ন, ১৮৭, ২২২, ২২৩
মানব বন্ধন কর্মসূচী ,২০২
মানব সম্পদ, ১৮৭, ১৯১
মানব সম্পদ উন্নয়ন, ১৮৮
মানবজাতির জীবনদর্শন কুরআন, ১৭৪

www.amarboi.org

মানবিক প্রযুক্তি, ৯
মানবিক আচরনের সার্বজনীন ভিত্তি, ১৭৬
মানবিক সম্পর্ক আন্দোলন, ২৮
মানুষের সাম্য, ১২০
মানুষের জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম, ১৯৫, ১৯৭
মালয়েশিয়া, ৫৪, ২১০, ২২১, ২২০
মালয়েশিয়ায় প্রশাসনিক সংস্কার, ২২১
মার্কসীয় দর্শন, ২০৬
মার্গারেট থ্যাচার, ৫২
বায়তুলমাল, ১১১
মাজালিম, ১৪০, ১৪৭, ১৪৮
মাজালিম যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করতেন, ১৪০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৩০, ৫২, ২২২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়মূহে, ২৬
মাসিক ভাতা, ১৮
মরিস বুকাইলী,১৯৪
মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৮
মহিলাদেরকে ভোট প্রদানের অধিকার, ১২০
মুসলমানদের শিক্ষার হার. ১৯২
মুসাফির, ১০৫
মুসলিম উম্মাহ্, ১০৯
মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসন, ১৪০
মুসলিম বিশ্ব, ১৯১
মুহ্তাসিব, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৮, ১৫০
মুহ্তাসিব আগাজী, ১৩৮
মুহ্তাসিব দায়িত্বসমূহ, ১৩৮
মিথষ্ক্রিয়া, ১৫১, ১৫২, ১৬১, ১৭৫, ২০৭
মিনব্রোক, ৭১, ৭৭
মিনব্রোক সম্মেলন, ৭১
মিশর, ১৩
মিশরীয়, ১১৪
মিতব্যয়িতা; ৭৩, ২১৫

॥ য ॥

যৌক্তিক দৃষ্টবাদ, ২৫
যাযাবর আরব, ৯৮
যান্ত্রিক দক্ষতা, ২৮
যুক্তরাজ্য,৫২, ৫৪
যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, ২৬
যুক্তরাষ্ট্র, ৫২
যুক্তিযুক্ত সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, ৮৪
যুক্তিবাদী মতবাদ, ১৪১
যুক্তিবাদী তত্ত্ব, ১৩২,১৩৫
যুক্তিযুক্ত আমলাতন্ত্র, ৮৮
যুক্তিযুক্ত সংগঠন, ৮৬
যুক্তি-যুক্ততার তত্ত্ব ,৮৯

॥ র ॥

রেনেসাঁ, ১৪
রোমান ক্যাথলিক, ১৬
রূহ, ১৮৮
রহ্মাতুলি-ল আ'লামীন, ১০০
রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ১৭
রাসূল, ১৮৮
রাষ্ট্র ধর্ম ,২১০
রাষ্ট্র গঠনের উপাদান, ৯৯
রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ৯৯, ২১৭
রাষ্ট্রধর্ম, ১১৯
রাষ্ট্রপতি, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯
রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, ২০২
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, ১৫৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক-প্রশাসন, ১০১
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ১২০
রাজনৈতিক স্বার্থ, ২২২
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলিটবৃন্দ, ১৫৭

www.amarboi.org

রাজনৈতিক নিরেপেক্ষতা ও বেনামী, ৯৩
রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, ৩৪, ৮৯, ১৩৪, ১৬৮, ১৭৫
রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বোদিন, ১০১
রাজনীতি, ২৫
রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ, ২৭
রাজনীতি-প্রশাসন বিতর্ক, ২৭
রাজা গাসটাভ, ১৪৯
রাজা দ্বাদশ চার্লস,২০৯
রাশিয়া, ২০৯
রীট ব্যবস্থা, ১৩৪
রিবা বা সুদ, ৯৭
রিসালাত, ১৩৬
রাষ্ট্রপতি, ২০৪

॥ ল ॥

লোক, ৩০, ৪২, ১৬৭
লোক প্রশাসনের জবাবদিহি, ১৩২, ১৪১, ১৫১, ১৬০
লোক- প্রশাসন, ৯, ১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫৫, ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮৬, ৮৮, ৯২, ১১৪, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৫, ২০৭, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮
লোকস্বার্থ, ১৩৫
লোক-প্রশাসনে নৈতিকতার সমস্যা, ১৭২
লোক-প্রশাসনে আমলাতন্ত্র, ৫১
লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধ, ৩০
লোক-প্রশাসনের দার্শনিক ভিত্তি, ৮০
লোক-প্রশাসনে 'দক্ষতা', ২৪
লোক-প্রশাসনের উন্নয়ন, ১৮
লোক-প্রশাসনের উপর আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ, ১৩৩
লোক-প্রশাসনের উপর অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ১৩৪
লোক-প্রশাসনের লক্ষ, ৬৫, ১৭৫
লোক-প্রশাসনের সম্প্রসারণ, ১৭২
লোক-প্রশাসনের সনাতনী মূল্যবোধ, ১৬৯
লোক-প্রশাসনের সনাতনী লক্ষ, ৭৩
লোক-প্রশাসনের জনস্বার্থ, ৩২
লোক-প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ৭২
লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া, ৮১
লোক-প্রশাসন অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী
লোক-প্রশাসন অধ্যয়ন, ২১
লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২১৮
লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া, ৭৯, ৮০, ৯০, ১৫১
লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণে ধর্মীয় শিক্ষার ইতিবাচক ফলাফল, ১৭৫
লোক-প্রশাসন কর্মকান্ড, ১৪৬
লোক-প্রশাসন সাহিত্য, ৮৯,
লোক-প্রশাসন চর্চা, ১৭, ২০
লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞ, ৭৪
লোক-প্রশাসন শিক্ষা, ২৬, ৬৮, ১৭৫
লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ৩২, ১৭৫
লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ধর্মীয় শিক্ষার ইতিবাচক ফলাফল, ১৭৫
লোক-প্রশাসকদের আচরণ, ১৭৩
লোক-প্রশাসকদের জন্য সতর্ককারী ঘটনা; ১১১
লোক-প্রশাসন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচীতে, ৩০
লোক-প্রশাসন চিন্তাবিদ্, ৫১
লোক-প্রশাসন তত্ত্ব, ২১৫
লোক-প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন, ২১৭
লোক-প্রশাসন সাহিত্যে নেতৃত্বেও ধরণ, ৮৮
লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি, ১৪১, ১৫২

www.amarboi.org

লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতার ব্যাপারে দু'টি তত্ত্ব, ৮৯, ১৩২
লোক-প্রশাসক, ৩০
লোক-প্রশাসকগণ, ১৪১, ১৬৮, ১৬৯
লোক-প্রশাসকদের, ৬৫, ১৪১, ১৬৯
লোক-প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ, ৭৫
লোক-প্রশাসকদের নৈতিকতা, ১৬০
লোক-প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ, ২৬
লোক-প্রশাসকগণ জনগনের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা, ১৭৫
লোকপাল, ১৫০
লোক-ব্যবস্থাপনা, ৪৮, ৫১
লোকায়ুক্ত, ১৫০
লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধ, ৩০, ১৭৫
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক,২০৩
লিবিয়া, ১৩

॥ শ ॥

শেষ বিচারের দিন, ৯০, ৯৩, ১২৪, ১৭৫, ১৯৬, ১৯৭
শ্রম বিভাজন, ১০৮
শ্রমবিভাজন নীতি, ১০৮
শরীয়া, ৮৬, ১১৩, ১১৪
শরীয়া আইন, ৮৭,১০০
শাসন বিভাগীয় ন্যায়পাল, ১৫০
শাসনতন্ত্র, ২৬, ১৯৬
শাসক গোষ্ঠী, ৩৯, ৪১
শাসক এলিট, ১৫১, ১৫৭
শাসক-প্রশাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য, ১৪১
শিক্ষা, ৬৬, ১২২, ১২৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১
শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি, ১৮৮
শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, ১৯৬, ১৯৭
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ১৭২
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে, ২০৭
শিক্ষা সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, ১৮৯
শিক্ষা সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশাবলীসমূহ, ১৮৯
শিক্ষার উদ্দেশ্য, ১৮৭

॥ স ॥

স্বৈরতান্ত্রিক, ৮৮
সৈয়দ আমীর আলী, ১১৩, ১৪৭
স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, ১৫৭
স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, ১৫৯
স্বল্পতম ব্যয়ে, ২৩, ২৪, ৩১, ৭২,৭৯, ৯২,
স্বজনপ্রীতি বা পারস্পরিক বিদ্বেষ, ১৭৪
স্বার্থপরতা, ২০৫
স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০৪,২১০
স্বাধীন বাংলাদেশ, ২০৪
স্বাধীনতা, ২০৪
স্বাধীনতাউত্তরকালে বাংলাদেশ, ২১৬
স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র, ৮০,১৬৩
স্ববিবেচনা, ৬২, ৮৬,১৩৩, ১৩৪, ১৭০, ১৭২
স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চেতনা, ১৭০, ১৭৬
সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা, ৮৯
সংগঠন, ৯২
স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভিত্তি, ১৭১
স্ববিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত, ২৭, ১৬৭, ১৬৭, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৬
স্ত্রীমহাধ্যক্ষ, ১৮
স্থানীয় সরকার, ৫৪,২১৭
স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ১৫২
স্টাডি সার্কেল, ১৩

www.amarboi.org

সেক্রেটারি, ১৫৯
ন্যায়বিচার, ৭৫
পাকিস্তান, ১৪৫
সূদ, ২০৭
সম্পদ পুন:র্বন্টন, ৮৩
সনাতনী গুরুত্ব, ৩০
সনাতনী চিন্তাধারা, ৩১
সনাতনী লোক-প্রশাসন, ৫২
সনাতনী লোক প্রশাসনের সমস্যাবলী, ৫১
সফবন্দী, ১০৭
সম্রাট আশোক, ১৫
সমকালীন বিশ্ব, ১৯১
সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীসমূহ, ৮২
সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে, ১৭৩
সমষ্টিগত জবাবদিহিতা, ৬৩, ৮৯, ১৩৪, ১৬৮
সমতা, ১০৭
সমতা ও ন্যায়বিচার ,৭৭
সরকারী আমলা, ৩০,৭৪
সরকারী আমলাদের জন্য ইসলাম, ৯৩
সরকারী আমলার মানসিকতা, ৬৩
সরকারী আমলারা, ১৫,২৭,৭৯, ১৩৪, ১৫১, ১৬৯, ১৭২
সরকারী আমলাতন্ত্র, ৫১, ৭৩, ৭৪, ১২২, ১৫২, ১৭৫
সরকারী আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা, ৮৯
সরকারী আমলাতন্ত্র বা লোক-প্রশাসন, ১১৯
সরকারী নীতি, ৩০
সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৭২
সরকারি প্রশাসন, ১৩৩
সরকারি চাকরির মূল লক্ষ, ১৬৭
সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৭২
সরকারি প্রশাসন, ১৩৩
সরকারি চাকরির মূল লক্ষ, ১৬৭
সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৭২
সরকারি প্রশাসন, ১৩৩
সরকারি চাকরির মূল লক্ষ, ১৬৭
সরকারী প্রশাসন, ৮৮
সরকারী প্রশাসকদের উপর আভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ১৩৩
সরকারী কর্ম কমিশন, ৪২, ১৬৭
সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্থবহ জবাবদিহিতা সরকারী কর্মচারীদের উপহার গ্রহণ, ১১১
সরকারি আমলাতন্ত্রে সংস্কার, ১৬০
সরকারি আমলাতন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ,৭৪
সহীহ মুসলিম, ২০৮, ২১০
সহকারি ন্যায়পাল, ১৬০
সৎকার্যের নির্দেশ, ১৯৬
সংস্কৃত, ১৭
সংকোচন, ২৬
সংকোচন নীতি, ৭৪
সংজ্ঞা, ৪২
সংসদীয় পর্যবেক্ষক, ১৫৮
সংসদীয় কমিশনার, ১৪৯
সংগঠনের লক্ষ, ৮০
সংগঠনমুখী প্রশাসন, ৩৯, ৪০
সংগঠিতকরণ, ৮৪, ১০৮, ১৩১,
সংবিধান, ২০২
সংবিধানের ৭৭ (১) অনুচ্ছেদ, ১৫৩
সাদ্‌কাহ্‌, ১০৫
সার্ক, ১৪৫
সাধারণ ব্যতিক্রম, ১৭৮

www.amarboi.org

সার্বভৌম, ১০২
সামাজিক দক্ষতা, ২৮
সামাজিক আন্দোলন, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২১১
সামাজিক ন্যায়বিচার ৩০, ৩১, ৩২, ৬৫, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫,৭৭, ৭৯, ৮০, ৯২, ১১০, ১১৮, ১১৯, ১৫৩, ১৬৮
সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিমালা, ৯৪
সামাজিক প্রক্রিয়া, ২৮
সামাজিক সমতা, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৬, ৭৭, ১১৯
সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার, ৭৬
সামাজিক চুক্তি, ১৭
সালাত, ১২৪
সাংগঠনিক প্রযুক্তি, ২১৫
সাংবিধানিক সরকার, ১৭
সাহিব আল সুউক, ১৩৮
সচিবালয়, ১৫৫
সচিবালয় ও আদালত, ১৫৬
সুদ, ২০৬
সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস, ২০৯
সুইডেন, ১১৮, ১৪৯, ১৫৪, ১৬০, ১৭৭
সুন্নাহ্, ১২৪
সুইজারল্যান্ড, ৮৯
সুইজারল্যান্ডের আমলা, ৮৯, ১৭৫, ২০৭
সুইডিস অম্বুড্জম্যান, ২০৯
সুশাসন, ১৬, ২০, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ২১৫, ২১৬, ২১৬, ২১৮
সুশাসন ও উন্নয়নর পূর্বশর্ত,১৭১
সুশীল সেবক, ৩০, ৬১, ১৬৭
সুশীল সমাজ, ১৬, ৫৭, ১৫৯, ২০২, ২০৩, ২০৪
সুবিচার, ৮২, ১৭৪, ১৮৭
সততা, ১৬৯
সততা ও নৈতিকতা,১৭২
সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনব্রোক, ৭১
সিপিআই, ২০৫
সিভিল সার্ভেন্টস, ৩৯, ৬৩, ১৩৩, ১৬৭, ১৭০, ১৭৩
সিভিল সার্ভেন্টস বা সরকারী আমলা, ৮৫
সিভিল সার্ভিস, ৬২
সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব, ২০৭

॥ হ ॥

হেনরী ফেয়ল, ৩১
হোসাইনী, ১০১
হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়, ১২০
হব্‌স, ১০১
হযরত (সাঃ)-এর নেতৃত্বের গুণাবলী, ১১২
হযরত (সাঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা, ১০১
হযরত আলী (রাঃ), ১৪৭, ১৬২
হযরত আলী (রাঃ) -এর প্রশাসনিক চিঠি, ১৩৯
হযরত মুহাম্মদ (সঃ), ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৬, ১১৯, ১৩৬, ১৭১, ১৮৮
হল্যান্ড, ১৩
হয়রত ওমরের (রাঃ), ৮৩
হাম্মুরাবি, ১৫
হাম্মুরাবির দন্ডবিধি, ১৫
হিজরত, ৯৯
হিস্‌বা, ১৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৮
হাদীসসমূহ, ১৯১

॥ ক্ষ ॥

ক্ষমতা, ৬২

www.amarboi.org

A.

A.W.Goodner, ৩০
Academic discourse, ২০৩
Administrative Discretion, ৬২, ১৩৪, ১৫৩, ১৬৯
Algoritham, ১৪
Almond এবং Verba, ৪০, ৬৩
American Independence, ১১৯
Anisur Rahman, ১২
Anonymity, ৮৯, ১৩৪, ১৬৯
Anthony Downs, ৬১
Aristotle, ১৮৭
Asian Drama, ২২০
Autocratic, ৮৮

B.

Booty, ১০৬,
Breach of Tust, ১৭২
bureaucracy, ১১৪, ১৩৪
Bureaucratic Elite, ১৬১

C.

Capital accumulation, ২০৫
Catalyst, ২১, ২২৩
Carl J. Fredrick, ১২০, ১৬৮, ১৭৫
Center for Policy Studies, ২০১
Chancellor of Justice, ১৪৮
Charles Grant, ১৩
Checks & Balance, ১১০
Christopher Politt, ৪৭, ৪৮
Christoper Hood, ৪৮, ৫০
Citizen's defender, ১৪৬
Civil Servant, ৬১
Claude S. Geoge Jr., ২১৬
Client focussed administration, ৭৪
Code of Hammurabi, ১৫
Collective Accountability, ৬৩,১ ৬৮
Collective responsibility ৮৯, ১৩৪
Confucious, ২০
Consumer Ombudsman , ২০৯
Corporate interest, ১৫৯
Corruption Perception Index, ২০৫
Corson and Harris, ২৩
Criminal Procedure Code, ১৭০

D.

Dante Cuputo, ১১৭
David Osborne, ৪৮
Democracy, ১১৪
Democratic, ৮৮
Democratic Administration, ২২৩
Development Administration, ২৮
Development Administration Unit, ২২১
Dikeia, ১৭১
Discourse, ১৩,
Discretion, ১৭০,
Division of Work, ১০৮
Doh Joon-Chien, ১২,২১৯
Donald C. Stones, ৩৮
Dudly Seers ৮৩
Dwight Waldo, ২৮, ৬১, ৭১, ৭৯, ১৬৫, ১৭৫

E.

E. W. Weidner, ৩৮
Individualism, ১২১
Earnest Barker, ১২০
Economy, ৪৬,৬৫,৭৩,৭৯

www.amarboi.org

Edward W. Said, ১২
Efficiency, ৪৬, ৬৫, ৭৩, ৭৯
Ethics and Knowledge Club, ২১১
Electronic governance, ২১৮
Elton Mayo ২৮,
Emajuddin Ahmed, ৬৩
Emotional discipline, ১৮৭
Enterpreneurial Government, ৪৬
Equality of Man, ১২০
Ethics, ১৭১
Ethos, ১৭১
Executive Ombudsman, ১৫০
Experimental Science, ১৪

F.

F.W.Riggs, ৯, ২৮, ৩৮
F.W.Taylor, ২৪
Farrel Heady, ৯, ৮৯, ১৭৫, ২০৭
Fayol, ২৪
Feedback, ১৫১
Filter mechanism, ৮২
Founding Fathers of America, ১১৯
Frederickson, ৭৩, ৭৭, ৭৯, ৮০

G.

Galilleo Galilei, ১৬
Garry Dessler, ১৩১
General exceptions, ১৭৮
George Gant, ৩৮
G.N.P., ১১৮, ২২০
Golembiewski, ৭২
Good governance, ২০, ২১৬, ২১৮
Grunebaum, ১৪০, ১৪৮
Guidelines for Public Service Ethics, ১৮০
Gulick, ৭৯
Gunner Myrdal, ১৭১, ২২০
Guy Peters, ৪৮

H.

Harbert A. Simon, ২৫, ৩০, ১৬৯
Hawthorne experiment, ২৮
Henri Fayol, ৭৯
Henry Goodnow, ২৫
Hermon Finer, ১৬৮
Herbert A. Simon ৩০, ১৬৯
Hierarchical theory, ১৩২
Hing Young Cheng, ১৫২
Horizontal, ১০৯
Human Relations Movement, ২৮

I.

I. Christopher Pollitt, ৪৭, ৪৮
I. Swerdlow, ৩৮
Ibn Haytham, ১৪
Ideological motivation, ১৮৮
Individualism, ১২১
Immunity, ১০৭
Impersonal, ৭২
Impersonality, ৭৪
Inside Bureaucracy, ৬১
Input, ১৫১
Intellectual colonization, ২১৯
Interaction, ১৫১
International Ombudsman Institute (IOI), ১৫০
Islamic culture, ৮৭, ১১৪

www.amarboi.org

J.

James Pollock, ২০, ৮৫
Jean Jacque Rousseau, ১৭
Jefferson, ১২০
John D. Montgomery, ৩৮
John Locke, ১৭
John Rawls, ৩১, ৭৩, ৯৪
Joseph Garba, ১১৭
Judicial Officials Protection Act, ১৭৮
Justice, ১৭১
Justiti Ombudsman, ১৪৯,২০৯

K.

King Charles XII, ১৪৮, ২০৯
King Gustava, ১৪৯
Kernaghan, ১৭২
Kronemberg, ৭৩

L.

L.D. White ২৫, ২৬, ১৩২
La Porte, ৭৩,
Laissez-faire, ৮৮
Law of Apartheid, ১২০
Legislative Advocacy and Participation of the Civil Society (LAPCS), ১৫৬
Legislative Ombudsman, ১৫০
Leonardo Bruno, ১৭
Lichtenstadtler, ১৪
Logical Positivism, ২৫
Luther Gulick, ২০, ৮৬
Luther Gulick এবং James Pollock, ২০, ৮৬, ১১৪,

M.

Maladministration, ১৫৬, ১৫৮
Managerialism, ৪৬, ৪৭, ৫২
Martin London, ৩৮
Max Weber, ২৫, ৩০, ১৩৪, ২০৬
Merit, ১২২
Michael H. Hart, ১১৩
Michael J. Hill, ১৭০
Milton J. Esman, ৩৮
Moderanization, ২১৯
Mohammad Al-Buraey, ১২, ২০, ১১২
Money Laundering, ২০৩
Montgomery Watt, ১৪, ৮৫
Montgomery-Easman Report, ২২১
Mooney and Reily, ২৪
Mosher I.Humnel, ৬৩
Motivation system, ৮৪
Myung See Park, ৭৩

N.

New Economic Order, ১১৮
New International Economic Order, ১১৮
New Political Scienc, ৭৩
New Public Administration, ৪৬, ৭১, ১১৮
New Public Management, ৪৬
Nicholas Henry, ৩০
Nigro and Nigro, ২৮, ৭৪
North-South Dialogue, ১১৮
Normative, ৬৫
North Carolina, ২০
NPM, ৪৬

www.amarboi.org

O.

O. Dunnel, ৭৯
O.P. Dwivedi, ১৭২
OECD, ৪৫, ৫১
Official Development Assistance, ১১৮
Old Testament, ২০৫
Ombud, ১৪৬
Ombudsman, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৪
Orientalism, ১২
Operational Cash Budget, ২২২
Osmamu Koike, ৫০
Osborne and Gacbler, ৪৬

P.

PARC, ১৫৫
Parez de Cueler, ১১৭
Parliamentary Commissioner, ১৪৯
Parez de Cueler, ১১৭
People Administration, ২২২, ২২৩
People Development, ২২২,
Performance Budget, ২২১, ২২২
Permanent Commission of Enquiry, ১৪৯
Peter Self, ৮৯,
Paul H.Appleby, ২৭
Plato, ১১৯, ১৮৭
Political neutrality, ৮৯, ১৩৪
POSDCORB, ৭৯
Procurator, ১৪৯
Professionalism, ৭৬
Professional Worldview, ২০৭
Proverbs, ৩০
Public Service Commission ৪২, ১৬৭

R.

Rationality, ৭৬
Rational bureaucracy, ৮৮,
Rationalist theory, ১৩২
Receiving end, ১৫১
Religious calling, ২০৬
Rena Meheu, ২১
Rensis Likert, ৮৮
Re-structuring the economy, ৮৪
Result- Oriented Management Initiative, ৫৩
Reuben Levy, ৯৯, ১৪০, ১৪৭
Revisionist School, ২০৫
Robbins, ৭৯
Robert A. Dahl, ২৮
Robert D.Miewald, ৬১
Robert T.Golembiewski, ৭২
Rosenweig, ৭৯
Ruling Elite, ৩৯, ৪১, ১৫১
Ryokichi Hirono, ১৮৭

S.

SAARC, ১৪৫
Shari'ah, ১১৪,
Sigmund Freud, ২০৬
Silvestre de Sacy, ১৩
Simon, ১৬৯
SOAS, ১৩
Social Contract, ১৭
Social equity, ৭৩, ১১৯
Social Justice, ১১৮

www.amarboi.org

Social Status Quo, ৭২
Span of Control, ২৯
Stephen P.Robbins, ৭৮
Subjective culture, ৪০, ৬৩
Sub-system, ৭৬
Suo moto, ১৪০,১৫৮

T.

Tamawi, ৮৬
Ted Gaebler, ৪৭
The Administrative Tribunal Act, 1981, ১৫৪
The Ombudsman Act, 1980, ১৫৪, ১৫৭
The Public Administration Reform Commission (PARC), ১৫৫,
The Shari'ah, ৮৭
Thomas Hobbes, ১৭
Time of turbulence, ৭২
Total Quality Management, ৫৩
Transparency InternationalI, ১৬১
Trustee, ৬৬, ৮৪, ১৪১

U.

UNESCO, ২১

V.

Value neutral ২৫, ৪০, ৬১, ৬৫, ১৫২, ১৬৭, ২২০
Victor Sidel, ১১৭
Victor Ostrom, ২২৩
Virtuous deed, ৮৪

W.

W.F.Willoughby, ২৬,
Wafaqi Mohtasib, ১৫০
Waldo, ২৬
Weidner, ৩৮
Wholesale Restructuring, ৫৩
Wickens, ১৬
William Hocking, ১১২
William Siffin, ৩৮
Willy Brandt, ১১৮, ১৮৮
Woodroow Wilson, ২৫

www.amarboi.org

পুস্তক পরিচিতি

লোক-প্রশাসন কি? এর দার্শনিক ভিত্তি কি? লোক-প্রশাসন চর্চায় বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রবাহ কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে? বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে লোক-প্রশাসন জাতির প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফলকাম হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লোক-প্রশাসন চর্চা কি শুধু পশ্চিমা পন্ডিতদের চিন্তা নির্ভর হয়ে থাকবে? লোক-প্রশাসনের বিকাশে প্রাচ্য তথা এশিয়ার কি কোন অবদান নেই? পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য কি আমাদেরকে দেশোপযোগী লোক-প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ দেয় না?

মূলত: উপরিউক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন নিবন্ধে। লেখক প্রফেসর আবদুন নূর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন বিষয়ের বরিষ্ঠ শিক্ষক। পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিন দশকেরও অধিককাল ধরে লোক-প্রশাসন চর্চার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি সংকলিত। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসন বিষয়ের উপর রচিত লেখকের বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধাবলীকে : **ক. প্রশাসনিক চিন্তাধারা; খ. লোক-প্রশাসনে মূল্যবোধ; গ. লোক-প্রশাসনে জবাবদিহিতা; ঘ. শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন; এবং ঙ. পুস্তক পর্যালোচনা**-এই পাঁচটি শিরোনামে সংগঠিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনীতি, অর্থনীতি, লোক-প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষার্থী, গবেষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে সমাদৃত হবে বলে বিশ্বাস। এছাড়াও স্বদেশ এবং উম্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ভাবেন, জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ ও আগ্রহী পাঠক বইটি পাঠ করে প্রশাসনিক জ্ঞান ও তার ইসলামী রূপায়ন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর আবদুন নূর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক। তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্টাডি ফোরাম IASC (Islamic Administration Study Center)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তাঁর সম্পাদনায় *Journal of Islamic Administration* নামে একটি বার্ষিক জার্ণালও প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রফেসর নূর ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সনে কর্ণফুলী (প্রজেক্ট) হাই স্কুল হতে এস.এস.সি., ১৯৬৮ সনে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে এইচ.এস.সি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৭৪ সনে লোক-প্রশাসনে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৫ হতে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত লেখক বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে সহযোগী অনুদেষ্ঠা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ১৯৯২ সালে লোক-প্রশাসনের প্রফেসর ও ২০০০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেকশন গ্রেড প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ইতোমধ্যে লেখক *A/D/C (New York)* ফেলো হিসাবে *University of Malaya* হতে *MPA* ডিগ্রি অর্জন (১৯৮৪) করেন। তাঁর MPA থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল: *"Rural Local Government Finance in Bangladesh"*। এছাড়াও তিনি *British Council Fellow* হিসাবে ১৯৮৭ সালে *London School of Economics (LSE)* -তে গমন করেন এবং *"Local Government in Britain"* বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন।

শিক্ষকতা ও গবেষণা ছাড়াও প্রফেসর নূর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান, শাসসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট, *World University Servie (WUS)*-এর সেক্রেটারী, সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের *বোর্ড অব গভর্ণরস* -এর *সদস্য* এবং বিশ্ববিদ্যালয় *সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির* সদস্য হিসাবে বহুমুখী প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর বহু গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ (*IULA*), আন্তর্জাতিক ইসলামী দর্শন সমিতি, বাংলাদেশ সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতিসহ দেশের ও বিদেশের বহু পেশাজীবী সংগঠনের একাডেমিক ও প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষকের দায়িত্বও তিনি পালন করে আসছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : *স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ* (১৯৯২); *Social Justice in Bangladesh* (১৯৯১); *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা* (১৯৯৩); *প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে অম্বুডস্‌ম্যান (২০০১);* ঘুম অপেক্ষা প্রার্থনা শ্রেয় (১৯৯৪); এবং *Social Justice and Human Development* (২০০৭)।